রাজমালা

বা

ত্রিপুরার ইতিহাস।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

প্রণীত।

The countries of Oedoepar and Tipara are sometimes independent, sometimes under the great Mogul and sometimes even under the King of Arakan.

Van den Broucke.

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৩ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

মূল্য ৩৲ টাকা।

ভূমিকা।

ত্রিপুরা ভারতবর্ষ মধ্যে একটী অতি প্রাচীন রাজ্য। সুবিখ্যাত গুপ্ত সম্রাটদিগের শিলালিপি পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, মিবারও ইহার ন্যায় প্রাচীন নহে। ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা, ইহার অধিকাংশ তাম্রশাসন বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস "রাজমালা" প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাভাষা গৌরবান্বিত।

ত্রিপুরারাজ্য ও রাজপরিবারের সহিত পুরুষানুক্রমে আমাদের সংশ্রব রহিয়াছে, সুতরাং ইহা ত্রিপুরার ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মদীয় খুল্লপিতামহ ৺রায় রামপ্রসাদ সিংহ মহাশয় প্রথমত ত্রিপুরার রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন। তিনি আজীবন মহারাজ রাজধর মাণিক্যের প্রতিনিধি (আম-মোক্তার) স্বরূপ জাহাঁগীর নগরে (ঢাকায়) অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে মদীয় জনক ৺রায় গোলোকচন্দ্র সিংহ মহাশয় ১২৪০ বঙ্গাব্দে ত্রিপুরার রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি যদিচ অধিকাংশ সময় রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী (সেরাস্তা-

দার) ছিলেন, কিন্তু তৎকালে, কি সামরিক কি রাজনৈতিক বিভাগ, যখন যে কোন বিভাগে যে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই কার্য্যভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছে। ১৮৫৭—৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহের সময় মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তৎসংক্রান্ত অতি গুরুতর কার্য্যভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।* কিঞ্চিদধিক ৩২ বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতা ও গৌরবের সহিত ত্রিপুরায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করত পিতৃদেব ১২৭৩ বঙ্গাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। পিতৃবিয়োগের অল্পকাল পরেই আমি (২৫ বৎসর বয়ক্রমে) ত্রিপুরার রাজকার্য্যে প্রবেশ করি। প্রায় ৪ বৎসর কাল সেই কার্য্য সম্পাদন করত কোন কারণ বশতঃ স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

এই সময়ে ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারিত্ব লইয়া মৃত-মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের এক মাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুরের সহিত বর্ত্তমান মহারাজের কলহ উপস্থিত হয়। আমি কুমার বাহাদুরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যসম্পাদন ভার আমার হস্তে বিন্যস্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরেশ্বরদিগের বিস্তৃত জমিদারি, চাকলে রোসনাবাদে স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপন জন্য কুমার বাহাদুর ব্রিটীস বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই মোকদ্দমা আমার দ্বারা

*১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের ২৫ অগ্রহায়ণের ৩০২ নং চিঠি।

পরিচালিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রিপুরার ইতিহাসের যে সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা ১২৮৩ বঙ্গাব্দে রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করি। ইহাই আমার সাহিত্যজীবনের অপ্রস্ফুটিত প্রথম কুসুম। এই পুস্তকখানা যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, বঙ্গীয় সমালোচকগণ ইহার অনুকূল সমালোচনা দ্বারা আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর ২০ বৎসর গত হইয়াছে, ইহার অধিকাংশ সময় আমি ভারত পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছি। এই সময়ে ত্রিপুরার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কোন কোন অংশ মল্লিখিত বিবিধ প্রবন্ধে, সাময়িক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন গত হইল ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। বিস্তৃতভাবে ত্রিপুরার ইতিহাস প্রচার করিব বলিয়া সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিরত ছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পুস্তক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অংশবিশেষের কঙ্কাল স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের বিধান অনুসারে "চাকলে রোসনাবাদের" সারবে সেটেলমেণ্ট কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দ্বারা লাখেরাজদার ও তালুকদারগণের হৃদয়ে বিভীষিকা উৎপাদিত হইয়াছে। সারবে সেটেলমেণ্টের পরিণাম যাহাই

হউক না কেন, ইহার দ্বারা ইতিহাসের একটি প্রধান উপকরণ,—প্রাচীন সনন্দ সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। উক্ত সারবে সেটেলমেণ্ট দ্বারা নুরনগরের তালুকদারবর্গ ও মহারাজের মধ্যে অনন্ত কলহের বীজ উপ্ত হইয়াছে, অঙ্কুরে সেই বীজকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভূতপূর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম, এ; সি, এস মহাশয় মহারাজ বাহাদুরের প্রধান কর্ম্মচারী এবং তালুকদারবর্গকে লইয়া ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৮ই চৈত্র কসবা (কৈলারগড়) নগরে একটি সভা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন মেজেষ্ট্রেট-কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেঃ আর, ডব্লিউ কার্লাইল সাহেব সি, এস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেই সভায় আমি নুরনগরের ইতিবৃত্তমূলক একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তৎকালে মিত্র মহাশয় আমার সেই বক্তৃতা লিখিত আকারে প্রাপ্ত হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। সেই বক্তৃতা নিবন্ধাকারে প্রস্তুত হইলে নুরনগরের তালুকদারগণ তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই অকিঞ্চিৎকর নিবন্ধ সাধারণ পাঠকবৃন্দের প্রীতিপ্রদ হইবে না বিবেচনায় আমার পূর্ব্ব সংকলিত ইতিহাসের সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এই গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে তাহা পরিবর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

ত্রিপুরার ইতিহাস রচনা কালে আমি যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে

সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একটি সুদীর্ঘ তালিকা প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে টীকায় মূল গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা জন্য আমি তিন খণ্ড রাজমালা পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম ;— ১ প্রাচীন রাজমালা, ২—সংস্কৃত রাজমালা, ৩—সংক্ষিপ্ত রাজমালা। * রাজমালা সংগ্রহে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারাই আমার প্রথম ধন্যবাদের পাত্র।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমসেরগাজি নামক একব্যক্তি ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন মুসলমানী বাঙ্গালায় তাহার একখণ্ড জীবনচরিত (হস্ত লিখিত) পুথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান খৃষ্ট শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ত্রিপুরারাজত্বের উত্তরাধিকারীত্বের মীমাংসা বারংবার ব্রিটীস বিচারআদালত কর্ত্তৃক হইয়াছে। এই সকল মোকদ্দমার নথীস্থ কাগজ পত্রগুলি ইতিহাস সংগ্রহ পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

---

* রেবারেণ্ড জেমস লং সাহেব যে রাজমালার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন (*J. A. S. B. Vol. XIX. p. 533 to 557,*) তাহার অন্য নাম কৃষ্ণমালা। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন কালে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা কৃষ্ণমালা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত কৃষ্ণমালা পুথি আমরা পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

ব্রিটীস শাসনারম্ভ হইতে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের লিখিত চিঠি পত্র, রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ধারাবাহিকরূপে তাহার তালিকা প্রদান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জী মহোদয়ের প্রণীত History of Relations of the Government with the Hill-Tribes of the North-East Frontier of Bengal নামক উপাদেয় গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদ্বয়ের (নাজির দীনবন্ধু ও ঠাকুর ধনঞ্জয় দেবের) পরিদর্শন রিপোর্ট আলোচনা করিয়াছি। ৺পিতৃদেব মহাশয় রাজকার্য্য উপলক্ষে ত্রিপুরারাজ্যের অধিকাংশ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। বাল্যকালে তাঁহার নিকট যাহা শ্রুত হইয়াছি, তাহার অধিকাংশ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রাপ্ত হইয়াছি। কেবল বিখ্যাত কুকি সরদার লালছোকলাকে ধৃত করা সম্বন্ধে তাঁহার বাক্য কাপ্তান ব্লাকউডের বর্ণনার সহিত অনৈক্য হইয়াছে। (৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আদি রত্নমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপুরার ইতিহাস নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। তদনন্তর মুসলমানদিগের সংস্রবে ত্রিপুরার ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মহারাজ (প্রথম) ধর্ম্মমাণিক্য স্বীয় সভাসদ পণ্ডিত দ্বারা রাজমালা প্রণয়ন করত

একটি উজ্জ্বল অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই মহাপুরুষের প্রদত্ত নামটি বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করি। স্পেন দেশীয় প্রাচীন ইতিহাস গুলির ন্যায় রাজমালা অসম্পূর্ণ কিম্বা অতিবর্ণে রঞ্জিত হইলেও ইহাই প্রাচীন ত্রিপুরেতিহাসের মূল ভিত্তি। যদিচ ত্রিপুরার চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্য সমূহের ইতিহাস, ভ্রমণকারিদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অন্যান্য হস্ত লিখিত পুথি, শাসনপত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তত্রাচ সেই প্রাচীন গ্রন্থের গৌরব রক্ষার জন্য আমরা ত্রিপুরার ইতিহাসকে রাজমালা আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছি।

গ্রাম্য গীতিকবিতা ও প্রাচীন প্রবাদ বাক্যগুলি ইতিহাস সংগ্রহে বিশেষ সাহায্যকারী। কোন কোন গীতি কবিতার সত্যতা কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম বর্ত্তমান মহারাজ "রাজরত্নাকর" নামক রাজবংশের একখানি সংস্কৃত ইতিহাস প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার পিতৃপুরুষের সেই অমর কীর্ত্তির (রাজমালার) বিকৃতি সাধিত হইলে সর্ব্বসাধারণের মর্ম্ম-পীড়ার কারণ হইবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে যে অব্দ প্রচলিত আছে, তাহার চতুর্দ্দশ শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীন শাসন পত্র কিম্বা কোষ্ঠি

লিপিতে ইহার উল্লেখ নাই। মূলগ্রন্থের নবম পৃষ্ঠায় তৎসম্বন্ধে যে প্রবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় মুসলমান সংশ্রবের পর হিজরী সন গ্রহণ করা হয়, পশ্চাৎ সৌর বৎসর গণনা দ্বারা ইহা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অধুনা ত্রিপুরাব্দ আখ্যা ধারণ করিয়াছে। দুই তিন শতাব্দীর প্রাচীন সনন্দ সমূহে শকাব্দের সহিত "সন" আখ্যা দ্বারা ইহার উল্লেখ হইয়াছে।

নরপতিগণের সময়াবধারণে আমরা বিশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিপুরেশ্বর দিগের অভিষেক ও মৃত্যুকাল যাহা লেখা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তাহার দুই এক বৎসর অগ্র পশ্চাৎ হওয়া বিচিত্র নহে। সনন্দ সংগ্রহে চাকলেরোসনাবাদের লাখেরাজদার ও নুরনগরের তালুকদারগণ আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। কতকগুলি ভদ্রলোকের বংশাবলী হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে ঘোষ বিশ্বাস ও ধর চৌধুরীদিগের বংশাবলী বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

মুদ্রাসমূহের যে সকল ক্ষোদিত চিত্র প্রদান করা হইয়াছে, মূলের সহিত তুলনা করিলে তাহাতে সামান্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে, এইরূপ প্রভেদ ক্ষোদাই কার্য্যে অপরিহার্য্য।

এই গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচীপত্র।

প্রথমভাগ। উপক্রমণিকা, ১—৬১ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়— সূচনা। তুইপ্রা হইতে তিপ্রা, তিপ্রা হইতে ক্রমে তৃপুরা, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা নামোৎপত্তি। প্রাচীন ত্রিপুরার পরিমাণ ও বিস্তৃতি। ১—৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ—সীমা ও পরিমাণ, প্রাকৃত বিবরণ, পর্ব্বত, নদী, মৎস্য, অরণ্যজাত দ্রব্য, বন্যপশু, হস্তী, হস্তী শিকার প্রণালী, বন্যবিহঙ্গ, সর্প। ৬—১৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ— অধিবাসী, বাঙ্গালী, নৈহিত্যবংশ, তিপ্রা, স্বভাব, বাসস্থান, জুমক্ষেত্র, রাজকর, বিবাহ, দেবতা, ভাষা, হালাম, কুকি, মণিপুরী, আসামী, চাকমা। ১৫—৩০ পৃঃ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ—রাজবংশ, বিবাহ, ধর্ম্ম, উত্তরাধিকারীদ্বের নিয়ম, রাজচিহ্ন, মুদ্রা (তঙ্কা ও মোহর), উপাধি ও রাজ-কর্ম্মচারী, রাজ্যের আয়, বাঙ্গালা সাহিত্য, রাজমালা, গদ্যের উন্নতি, সঙ্গীতের আলোচনা, বংশাবলী। ৩১—৬১ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় ভাগ—রাজমালা, ১—২৫০ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়ঃ- সুহ্মদেশ, ক্ষুদ্ররাজ্যসমূহ, কমলাঙ্ক, পাটিকাড়া, রণবঙ্কমল্ল, রাঙ্গামাটীয়া, ভবচন্দ্রের রাজ্য, ভুলুয়া, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, লাউর, পোয়াংরাজ্য, শ্যানবংশের শাখা, ফা বংশ, প্রাচীন তৃপুরা, শ্যামসুং, ত্রিপুরবংশের দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তার। ১—১০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ— চন্দ্র সূর্য্যবংশ সৃষ্টি, রাজমালার মতে রাজবংশের উৎপত্তি, ত্রিপুর, হীরাবতী, চতুর্দ্দশ দেবতা, ত্রিলোচন, তাঁহার দ্বাদশ পুত্র, দৃকপতি কাছাড়ের অধিপতি,

দক্ষিণের মধ্যকাছাড়ে আগমন, মিসলিরাজ, কৈলারগড়, জাজীনগর, রাঙ্গামাটীয়া অধিকার, মেহেরকুল অধিকার, গৌড় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ, চট্টগ্রাম অধিকার, ডুঙ্গুরফার অষ্টাদশ পুত্র, রাজা ফা। ১১—২৮ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ— রত্নফা, মাণিক্য উপাধি, খাণ্ডব ঘোষ, পণ্ডিত রাজ ও জয়নারায়ণ সেনের আগমন, বিশ্বাস উপাধি, ব্রাহ্মণদিগের আগমন, প্রতাপ মাণিক্য, ইলিয়াসাহার ত্রিপুরা আক্রমণ, মুকুটমাণিক্য, আরাকানের রাজাকে উপঢৌকন প্রদান, ধর্ম্মমাণিক্য, রাজমালা রচনা, বঙ্গদেশ আক্রমণ, প্রতাপ মাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, কুকিদিগের পরাজয়, চট্টগ্রামের যুদ্ধ, হুসন সাহের দ্বিতীয় আক্রমণ, ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ, হুসন সাহের তৃতীয় আক্রমণ, ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য, নছরথ সাহার চট্টগ্রাম অধিকার, চন্তাই কর্ত্তৃক দেব মাণিক্য বধ, চন্তাই ও ইন্দ্র মাণিক্যের হত্যা। ২৮—৫৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ—বিজয় মাণিক্য, দৈত্য নারায়ণ বধ, চট্টগ্রামের পুনরুদ্ধার, পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন, শ্রীহট্ট বিজয়, ফিছের ত্রিপুরা দর্শন, অনন্ত মাণিক্য। ৫৫-৬৪ পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ—উদয় মাণিক্য, মেংফালোং কর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয়, জয়মাণিক্য। ৬৪—৬৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ—অমর মাণিক্য, অমরপুর নির্ম্মাণ, শ্রীহট্ট ও ভুলুয়া বিজয়, চন্দ্রদ্বীপ লুণ্ঠন, ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধ, মগদিগের চট্টল অধিকার, ত্রিপুরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন, অমরমাণিক্যের আত্মহত্যা, রাজধর মাণিক্য, যশোধর মাণিক্য, সরকার উদয়পুর। ৬৮—৭৭।

সপ্তম অধ্যায় ঃ—কল্যাণ মাণিক্য, ঠাকুর উপাধি,

যুবরাজের পদ সৃষ্টি, কৈলারগড়ের কালী স্থাপন, গোবিন্দ-মাণিক্য, ছত্র মাণিক্য, চন্দ্রনাথের মন্দির নির্ম্মাণ, রাম মাণিক্য রত্ন মাণিক্য, মহেন্দ্র মাণিক্য। ৭৭—১০০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায় ঃ—ধর্ম্ম মাণিক্য, মির হবিবের ত্রিপুরা বিজয়, জগৎ মাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক্য। ১০০—১১১ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায় ঃ—জয় মাণিক্য, ইন্দ্র মাণিক্য, বিজয় মাণিক্য ১১১—১১৯ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায় ঃ—সমসের গাজী, লক্ষ্মণ মাণিক্য। ১১৯—১২৭ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায় ঃ—কৃষ্ণ মাণিক্য, ব্রিটিসাধিকার, লিক-সাহেব রেসিডেণ্ট, বলরাম মাণিক্য। ১২৭—১৩৫ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ—মহারাণী জাহ্নবী, রাজধর মাণিক্য॥ ১৩৫— ১৪১ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ—রামগঙ্গা মাণিক্য, দুর্গা মাণিক্য। ১৪১—১৫২ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ঃ—রামগঙ্গা মাণিক্য, কাশীচন্দ্র মাণিক্য। ১৫২ — ১৬১ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ—কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, ঈশানচন্দ্র মাণিক্য। ১৬১—১৭৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায় ঃ—বীরচন্দ্র মাণিক্য। ১৭৭—২০৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ—বীরচন্দ্র মাণিক্য ২০৯—২৫০ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় ভাগ ২৫১—৩৮৭ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায় ঃ—কাছাড়ের বিলুপ্ত রাজবংশ ও বংশাবলী। ২৫৩—২৬৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—মণিপুরের রাজবংশাবলী ও ইতিহাস। ২৬৬—২৮৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ—শ্রীহট্টের প্রাচীন ও আধুনীক বিবরণ। ২৮৫—৩০৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ—চট্টগ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ। ৩০৭—৩৩৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ—পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিবরণ। ৩৩৩-৩৩৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ—কুকিজাতির বিবরণ। ৩৩৮—৩৮৭ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ ভাগ ৩৮৯—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায় ঃ—প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য বা জেলা নওয়াখালীর বিবরণ। ৩৯১—৪১৬ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ—ক্রমে ক্রমে মুসলমান দিগের জেলা ত্রিপুরা অধিকার, পুরচণ্ডী, সিংহের গাঁও, করদী. মেহার, নাবানপুর, হোমনা- বাদ, উত্তর সাহাপুর, গঙ্গামণ্ডল লৌহগড়, গুণানন্দী, কাশীমপুর, মাছুয়াখাল, একতাদপুর, কাদবা, আমিরাবাদ, বেদরাবাদ, মহৎপুর, মহিচাল. নয়াবাদ, পাইটকাড়া, বলদাখাল ও সরাইল প্রভৃতির প্রাচীন জমিদার দিগের ইতিহাস ৪১৬—৪৫৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ—জেলা ত্রিপুরা ঃ—অধিবাসী, অনার্য্য নিবাস. আর্য্যদিগের আগমন. ইছলাম ধর্ম্মের উন্নতি। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও ভাট, শূদ্র নবশাক ও জল অনাচরণীয় জাতি। মুসলমান, অবস্থানুসারে শ্রেণী বিভাগ, মুসলমান জমিদারদিগের হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ। ৪৬০—৪৯৫ পৃ .।

চতুর্থ অধ্যায় :-জেলা ত্রিপুরা :—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, আচার ব্যবহার। ৪৯৫—৫০৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায় :—জেলা ত্রিপুরা :—উপবিভাগ, থানা, পরগণা ও মহালের পরিমাণ ও রাজস্ব, খেরাজ ও লাখেরাজ সর্ব্বপ্রকার ভূমির বিবরণ জমিদারদিগের ব্যবহার, সরাইলের ও হোমনাবাদের জমিদার বংশাবলী। ৫০৯—৫৩৯ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায় :—চাকলে রোসনাবাদ ৫৩৯—৫৫৩ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায় :—পরগণে নুরনগর। ৫৫৩—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট, ৫৯১—৫৯৬ পৃষ্ঠা,

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের প্রস্তর লিপি, কৈলারগাড় দুর্গস্থিত কালীর মন্দিরের প্রস্তর লিপি, কল্যাণ মাণিক্যের তাম্রশাসন, গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন, নুরনগরে পরিশিষ্ট। ৫৯১—৫৯৬ পৃষ্ঠা।

রাজমালা।

প্রথম ভাগ।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা।

কামরূপ ও রাক্ষিয়াং * দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে প্রাচীন আর্য্যগণ সুহ্ম আখ্যা দান করেন। ইহার অন্য নাম কিরাত দেশ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভারতের "পূর্ব্বদিকে কিরাতের বাস।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লৌহিত্যবংশীয় মানবদিগকে আর্য্য ঋষিগণ কিরাত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তদনন্তর কিরাত ভুমি "তৃপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই "তৃপুরা" শব্দ হইতে ক্রমে ত্রীপুরা এবং "ত্রীপুরা" হইতে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।

তৃপুরা শব্দের মূল নির্ণয় করা সুকঠিন। তন্ত্র ও পুরাণ

* রাক্ষিয়াং অর্থ রাক্ষসের নিবাসভূমি। প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ ইহাকে রসাঙ্গ বলিতেন। পশ্চাত্য বণিকগণ ইহাকে আরাকান করিয়াছেন।

আলোচনা দ্বারা বিবিধ প্রকার সিদ্ধান্ত অনুমান করা যাইতে পারে, "ত্রিপুরাসুর হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কিম্বা ত্রিপুরাসুর নির্ম্মিত তিনটি পুরী হইতে ত্রিপুরা নামের উদ্ভব ; অথবা ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কিম্বা রাজবংশের স্থাপন কর্ত্তার নামানুসারে এই দেশ ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।*" এই সকল সিদ্ধান্ত আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অযৌক্তিক। যে অনার্য্য কিরাতদিগকে আমরা "তিপ্রা" (ত্রিপুরা) আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকি, তাহাদের জাতীয় ভাষায় জলকে "তুই" বলে।† এই তুই শব্দের সহিত "প্রা" সংযুক্ত করিয়া "তুইপ্রা" শব্দ নিষ্পন্ন হই-

* ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর সাউদারলেণ্ড্ সাহেব ত্রিপুরা নামোৎপত্তির এক আশ্চর্য্য ও কল্পিত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। (*Calcutta Review. Vol. XXXV. p. 325.*) তদনন্তর স্মার্ট সাহেব স্বীয় রিপোর্টে তাহাই ঘোষণা করিয়াছেন। (*Smart's Report on the District of Tipperah. p. I.*) কাপ্তান লেউইন তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। (*Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 79.*) তৎপর খ্যাতনামা হণ্টার সাহেব সেই অমূলক বর্ণনা স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। (*Statistical Account of Bengal. Vol. VI. p. 357.*)

† এই তুই শব্দ সংস্কৃত "তোয়" শব্দের অপভ্রংশ কি না তাহা বিশেষ বিবেচ্য, কারণ ত্রিপুরা জাতির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিগ্‌বাসী কুকি, কুইমি, মুরু, খেয়াং, বঞ্জুগী ও পংখু জাতি জলকে

যাছে। সেই তুইপ্রা হইতে তিপ্রা, এবং তিপ্রা হইতে ক্রমে ত্রিপুর, ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি।

কবিচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশে সুহ্মদেশকে মহাসাগরের "তালিবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত "সি-উ-কি" গ্রন্থে কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) সাগর তীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।* আমাদের বিবেচনায় অনার্য্য কিরাতগণ এই জন্ম অর্থাৎ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশকে "তুইপ্রা" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। সেই তুইপ্রা কিরূপে তিপ্রা (ত্রিপুরা) শব্দে পরিণত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অধুনা ২৪৯১ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি জেলা এবং ৪০৮৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি পার্ব্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা নামে পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন সুহ্ম বা ত্রিপুরার পরিমাণ ৭৫০০০ বর্গ মাইল

তুই বা তোই বলে। কেবল সিন্ধুগণ "তি" বলিয়া থাকে। সিন্ধুগণ দ্বারা "তিপ্রা" নামকরণও নিতান্ত বিচিত্র নহে।

* *Cunningham's Ancient Geography of India. page 503.* প্রফেসার বিল, সি-উ-কির অনুবাদ (*Buddhist Records of the Western World.*) গ্রন্থে বাঙ্গালার অন্তর্গত স্থান সমূহের স্থিতি নির্ণয় করিতে যাইয়া সর্ব্বত্রই ভ্রমমার্গে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি ডাক্তার ফারগুসনের প্রদর্শিত ভ্রমাত্মক বর্ত্মে বিচরণ করিয়াছেন। (*J. R. A. S.* (*N. S.*) *Vol. VI. p. 213 ff.*)

অপেক্ষা ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তৎকালে সমগ্র কুকি প্রদেশ, মিতাই (মণিপুর) রাজ্য, কাছাড়, শিলহট্ট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও নওয়াখালী এই সুহ্ম বা ত্রিপুরার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

কিঞ্চিদূন পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে, যৎকালে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ কুলজাত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর "রাজমালা" রচনা করেন, তৎকালে তাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

কিরাত নগরে রাজা বিধির গঠন।
রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন॥
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচবঙ্গ॥
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল এক পুরী।
নানামত নির্ম্মাইল পুরীর চওারি॥

প্রাচীন রাজমালা।

উত্তরে তৈরঙ্গ নদী, দক্ষিণে রসাঙ্গ (আরাকান), পূর্ব্ব সীমা মেখলী (মণিপুরী) দিগের নিবাস দুন * পশ্চিমে এই রাজ্যের সীমা বঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

রাজমালার উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সমগ্র কুকি (লুছাই) প্রদেশ, মণিপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ কাছাড়, শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, ময়মনসিংহের দক্ষিণ-

* দুন—Valley.

পূর্ব্বাংশ, ঢাকার পূর্ব্বাংশ, সমগ্র নওয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত হইতেছে। আধুনিক ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা জেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় হইলেও প্রাচীন ত্রিপুরার সীমান্তর্গত স্থান সমূহ উপেক্ষিত হইবে না।

ব্রহ্মার প্রাচীন ইতিহাস মহারাজোয়াং গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্য পাটিকাড়া আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মরাজ তরকুমা ত্রিপুরাপতিকে অমরপুরের * অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরাকে "থুরতন" লেখা হইয়াছে। মিতাই (মণিপুরী) গণ ইহাকে "তকলেঙ" রাজ্য বলিত। মিনহাজ, জইয়েবারণি প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ত্রিপুরাকে "জাজনগর" বা "জাজিনগর" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ইতিহাসে ত্রিপুরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে।

* অমরপুর অমরমাণিক্যের রাজধানী, নিবিড় অরণ্য মধ্যে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিপুরার অন্যান্য রাজধানী অপেক্ষা অমরপুর ব্রহ্মার নিকটবর্ত্তী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবরণ।

সীমা ও পরিমাণ :—অধুনা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা এইরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দিকে কুকি প্রদেশ, উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জেলা, দক্ষিণে চট্টগ্রাম। ইহার পরিমাণ ৪০৮৬ বর্গ মাইল। এই রাজ্য উত্তর অক্ষাংশ ২২°৫৯′ হইতে ২৪°৩১′ কলা এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯১°১২′ হইতে ৯২°২৪′ কলা মধ্যে অবস্থিত।

প্রাকৃত বিবরণ :—ত্রিপুরা রাজ্য একটি পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রদেশ। ইহার মধ্য দিয়া ৬।৭ টি পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে ধাবিত হইয়াছে। একটি হইতে অন্য পর্ব্বতশ্রেণী গড়ে ১০।১২ মাইল দূরে অবস্থিত। পর্ব্বতশ্রেণী সমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সমতল-ক্ষেত্র ও জলা ভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কণ্টক ও বনাকীর্ণ উপত্যকা অধিত্যকা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবতামুড়ার পশ্চিম দিকস্থ অনতি-উচ্চ পর্ব্বতসমূহ কোনরূপ শ্রেণীবদ্ধ নহে। কুমিল্লা হইতে দেবতামুড়া পর্ব্বত সমসূত্র রেখায় ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেবতামুড়া হইতে প্রকৃত পর্ব্বতশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে। দেবতামুড়া-পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে দেবতামুড়া শৃঙ্গ ৮১২ ফিট ও শৈশনমুড়া

৮১৩ ফিট উচ্চ। ইহার পূর্ব্বদিকে আঠারমুড়া পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত; ইহার মধ্যে আঠারমুড়া ১৪৩১ ফিট ও জারিমুড়া ১৫০০ ফিট উচ্চ। তাহার পূর্ব্বদিকে বচিয়া পর্ব্বতশ্রেণী; তন্মধ্যে মাচিয়া শৃঙ্গ ১৩৭৪ ফিট উচ্চ। তাহার পূর্ব্বদিকে সারছুইং পর্ব্বতশ্রেণী, ইহার মধ্যে সারছুইং শৃঙ্গ ১৫০৯ ফিট উচ্চ। তৎপূর্ব্ব দিকে লংতারাই পর্ব্বতশ্রেণী, ইহার মধ্যে সমবসিয়া ১৫৪৪ ফিট ও পেংকুই ১৫৮৯ ফিট উচ্চ। তাহার পূর্ব্বদিকে সংখলং পর্ব্বতশ্রেণী, তন্মধ্যে সকল শৃঙ্গ ২৫৭৮ ফিট উচ্চ। তৎ পূর্ব্বদিকে জামপুই পর্ব্বতশ্রেণী, ইহার মধ্যে জামপুই শৃঙ্গ ১৮০০ ফিট এবং বেতলংশিব ৩২০০ ফিট উচ্চ। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণী নানাপ্রকার মৃত্তিকা ও বেলে প্রস্তরে গঠিত।

নদী :— এই রাজ্য মধ্যে অসংখ্য-ক্ষুদ্র-স্রোতস্বতী দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাত ও উৎস পরিলক্ষিত হয়। এই পর্ব্বতজাত নদীসমূহের মধ্যে গোমতী ও মনু সর্ব্বপ্রধান।

গোমতী :— আঠারমুড়া পর্ব্বতজাত ছাইমা এবং লংতরাই পর্ব্বতজাত রাইমা নদীর সংযোগে গোমতী নদীর উদ্ভব হইয়াছে। এই নদী প্রায় ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন রাজধানী অমরপুর, রাঙ্গামাটি ও উদয়পুর এই নদীর তীরে অবস্থিত। গোমতীর উৎপত্তি স্থানের নিকট কতকগুলি জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়। এই সকল জলপ্রপাতের

স্থানীয় নাম ডুম্বুর। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জলপ্রপাত সমূহের আকৃতি মহাদেবের হস্তস্থিত ডুম্বুরের ন্যায় বলিয়া শিবোপাসকগণ ইহাদিগকে ডুম্বুর আখ্যা দান করিয়াছেন। সর্ব্ব নিম্নস্থিত জলপ্রপাত দ্বারা একটি বৃহৎ কুণ্ড গঠিত হইয়াছে, সেই কুণ্ড মণ্ডলাকার, তাহার ব্যাস প্রায় ১০০ হস্ত; যেস্থানে জলরাশী প্রবল বেগে পতিত হইতেছে, সেই স্থানের গভীরতা ২০ হস্ত। জলপ্রপাতজাত কুণ্ডগুলি, রাণী কুণ্ড, কাছুয়া কুণ্ড, কমলা কুণ্ড ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত।

মনু নদীঃ— সংখলং পর্ব্বতস্থিত খোয়াইগিব শৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এই নদী উদ্ভূত হইয়াছে। দেও, ডুলাই প্রভৃতি অনেকগুলি গিরিনন্দিনী মনুকে কর দান করিতেছে। শ্রীহট্ট জেলার মধ্যে মনু বড়বক্র নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

হাওড়াঃ— একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী; ইহার তীরে ত্রিপুরার আধুনিক রাজধানী আগরতলা ও নূতনহাবিলি অবস্থিত।

খনিজ পদার্থঃ— ফরাসী ভ্রমণকারী টেবার্নিয়ার লিখিয়াছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এক প্রকার স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। * অধুনা সেই স্বর্ণের কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। এই রাজ্যের পূর্ব্বপার্শ্বে পাথুরিয়া কয়লা আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। স্থানে স্থানে লবণ উৎস

* *Tavernier's Travels in India. p. 156.*

ও লবণাক্ত স্রোতস্বতী দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল স্রোতস্বতীকে "নুনাছড়া" বলে। জামপুই পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি লবণ উৎস বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তাহার উত্তাপের পরিমাণ ৭২° ডিগ্রি দেখা গিয়াছে।

মৎস্য :— ত্রিপুরা পর্ব্বতজাত স্রোতস্বতী ও জলাসমূহ নানা প্রকার মৎস্যে পরিপূর্ণ। বোধ হয় সমতল ক্ষেত্রবাসী বাঙ্গালি দিগের ভয়ে মৎস্যকুল নির্ভয়ে নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছে। গোমতীর উজান ভাগে "মহাশৌল" নামক অত্যুৎকৃষ্ট মৎস্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেও, ডুলাই, খাল, জুরী প্রভৃতি নদীসমূহের উজান ভাগ রুহিত, কাতল প্রভৃতি নানা প্রকার মৎস্যে পরিপূর্ণ।

অরণ্যজাত দ্রব্য :— এই রাজ্য তরু গুল্মে আবৃত। অরণ্যময় প্রদেশে নানাপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। তদ্দ্বারা মানবের ব্যবহার উপযোগী বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। জারুল, নাগেশ্বর, চাম্পলই প্রভৃতি দ্বারা নৌকা প্রস্তুত হয়। শাল, কালীবক্কল, কাঁচড়া, গর্জ্জণ * প্রভৃতি গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে উৎকৃষ্ট। পোমা, পিতরাজ, চামল, গাম্ভারী প্রভৃতি দ্বারা বাক্স, আলমারা প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বত মধ্যে নানাপ্রকার বাঁশ জন্মে, তন্মধ্যে "মুলী" গৃহ নির্ম্মাণ জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্থন্দি, গর্লাক, রাইচাং

* এই গর্জ্জণ বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে গর্জ্জণ তৈল জন্মে।

ও জালি প্রভৃতি নানাপ্রকার বেত এই রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাঁচা গৃহের প্রধান আবরণ "ছন" নামক খড় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই সকল অরণ্যজাত দ্রব্য দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গ-বাসীর মহোপকার সাধিত হয়, এবং ত্রিপুরেশ্বরও ইহার শুল্ক দ্বারা প্রচুর অর্থলাভ করিয়া থাকেন।

বন্যপশু :— এই রাজ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাজাতীয় জন্তুতে পরিপূর্ণ। হস্তী, গণ্ডার, গবয়, চামরী, নানাপ্রকার মৃগ, নানাপ্রকার ব্যাঘ্র, মহিষ, বরাহ, কৃষ্ণ ভল্লুক, হুল্লুক (হুক্কু) নানাপ্রকার বানর, লজ্জাবতী-বিড়াল, বন্য-বিড়াল, বন্য-কুকুর, বন্য-ছাগল প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

হস্তী :— ত্রিপুরাপর্ব্বত হস্তীর জন্য বিখ্যাত। এরূপ সুন্দর হস্তী ভারতের অন্য কোন অরণ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুং হস্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, বৃহৎদন্তবিশিষ্ট হস্তী গুণ্ডা এবং দন্তবিহীন হস্তী মক্না আখ্যায় আখ্যাত হয়। হস্তিনীগুলি কুন্‌কী বলিয়া পরিচিত। কুন্‌কীর বৃহৎ দন্ত হয়না। হস্তিকুল দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে বাস করে। প্রত্যেক দলে একটি গুণ্ডা বা মক্না নায়ক থাকে। যখন অন্য কোন একটি গুণ্ডা বা মক্না তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠে, তখনই উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। পরাজিত হস্তী নিহত কিম্বা দল হইতে তাড়িত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরা পর্ব্বত মধ্যে দলে দলে হস্তী বিচরণ করে। কিন্তু

বর্ষাকালে অল্প হস্তী দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই, ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বাংশে এক সহস্র বর্গমাইল বিস্তৃত, নানা প্রকার কণ্টকাকীর্ণ তরু ও গুল্মে আচ্ছাদিত, একটি ক্ষেত্র আছে। ইহা বন্যহস্তীর প্রধান নিবাসভূমি। শিশির সমাগমে বহুসংখ্যক হস্তী এই কণ্টকাকীর্ণ প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া দলে২ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। বসন্ত ঋতুতে তাহারা পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করে। এই স্থান মনুষ্যের অগম্য, হস্তিকুল তাহাদের "দোয়াল" (বিস্তীর্ণ বর্ত্ম) দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

শীত ঋতুতে হস্তিকুল যখন চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহারা মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হয়। খেদা, পরতালা ও ফাঁসী এই ত্রিবিধ প্রকারে হস্তী ধৃত হইয়া থাকে।

খেদা :— ইহার অর্থ খেদান বা তাড়ান। অর্থাৎ খেদাইয়া নিয়া একটি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ করা। এই উপায়ে কখন কখন শতাধিক হস্তী একবারে ধৃত করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে খেদার জন্য ৭টি প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে, ইহাদিগকে দোয়াল বলে যথা, (১) অমরসাগর দোয়াল, (২) মনু দোয়াল, (৩) ছাইমা দোয়াল, (৪) দেওগাং দোয়াল, (৫) ধলাই দোয়াল, (৬) কল্যাণপুর দোয়াল, (৭) কমলখাঁ দোয়াল। প্রথমোক্ত দোয়াল অমরসাগর নামক দীর্ঘিকার নিকটবর্ত্তী এজন্য ইহাকে অমরসাগর দোয়াল বলে, ইহাই প্রধান; অধিকাংশ হস্তী এই দোয়ালে ধৃত হইয়া থাকে।

শীতের আরম্ভে হস্তিদলের অনুসন্ধান জন্য পর্ব্বত মধ্যে লোক প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে "পাঁজালী" বলে। পাঁজালী কোন একটি দলের সন্ধান পাইলে, খেদা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেয়। সেই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র তাঁহারা বহুসংখ্যক কুলি লইয়া তথায় গমন করেন। এই সকল কুলি দ্বারা হস্তীর দলটি ঘেরিয়া ফেলা হয়। ইহাকে "পাতাবেড়" বলে। পাতাবেড়ের কার্য্য আরম্ভ হইলেই নিকটবর্ত্তী সমতলক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ড খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়। খোঁয়াড় প্রস্তুত হইলে তাহার বিপরীত দিক হইতে বন্দুক ছাড়িয়া ও নানা-প্রকার গণ্ডগোল ও চীৎকার করিয়া কুলিগণ হস্তিদলের অভি-মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ভীষণ শত্রু আসিতেছে বিবেচনায় ভীরু হস্তিগণ নীরব নিস্তব্ধ খোঁয়াড়ের দিকে গমন করত তন্মধ্যে প্রবেশ করে। হস্তীর দল প্রবেশ করিলে খোঁয়াড়ের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। খোঁয়াড় রক্ষা করিবার জন্য কুলি ও হস্তীর মাহুতগণ বর্ষা হস্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। ২।৩ দিন অনাহারে থাকিয়া হস্তিকুল দুর্ব্বল হইলে, মাহুতগণ পোষা কুন্‌কী আরোহণে খোঁয়াড়ের মধ্যে প্রবেশ করে, ও মেষপালের ন্যায় হস্তিগুলিকে বন্ধন করিয়া ক্রমে ক্রমে বাহিরে লইয়া আসে এবং বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখে।

পরতালা :— প্রতিদ্বন্দী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া যখন প্রকাণ্ড-কায় গুণ্ডা কিম্বা মক্‌না যূথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে,

কিম্বা মস্তী (মদমত্ত) হইলে যখন তাহারা দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে মনোমত কুন্‌কী অনুসন্ধান করিতে থাকে, তখনই পরতালা দ্বারা সেই গুণ্ডা কিম্বামক্‌নাকে ধৃত করা হয়। তদবস্থাপন্ন একটী পুং হস্তী দৃষ্ট হইলে মাহুতগণ বলবতী ও সুশিক্ষিতা ৫।৭ টি কুন্‌কী লইয়া তাহার নিকট গমন করে। যে হস্তিনীর প্রতি তাহার আসক্তি দৃষ্ট হয়, সেই কুন্‌কীটি তাহার এক পার্শ্বে রাখিয়া অপর পার্শ্বে অন্য একটি কুন্‌কী রাখিতে হয়। উভয় কুন্‌কীর মুখ বন্যহস্তীর লাঙ্গুলের দিকে রাখিয়া তাহারা তাহাকে সুদৃঢ়রূপে চাপিয়া রাখে। তখন বন্ধনকারী মাহুত অন্য কুনকী লইয়া তাহার পশ্চাদ্দিকে গমন করে। কামোন্মত্ত গুণ্ডা বা মক্‌না যখন মনোমত কুন্‌কীর অঙ্গসংযোগে আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখন সেই মাহুত কুন্‌কী হইতে অবরোহণ করত সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা তাহার পশ্চাদ্দিগের দুই পা বাঁধিয়া ফেলে। এইরূপ দুই তিনটি রজ্জুদ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষের সহিত সেই রজ্জু বন্ধন করিতে পারিলেই গুণ্ডা বা মক্‌না চিরজীবনের জন্য মনুষ্য হস্তে বন্দ হইল। ইহাই পরতালা শিকার।

ফাঁসি শিকার ঃ—ইহাদ্বারা প্রধানত বন্য কুন্‌কী ধৃত করা হয়। গুণ্ডা ও মক্‌না কদাচিত ফাঁসিতে আবদ্ধ হয়। গুণ্ডা কিম্বা মক্‌নাকে ফাঁসি দ্বারা ধৃত করিতে গেলে প্রায়ই পোষা হস্তীর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

একটি বন্য কুন্‌কী যূথভ্রষ্ট হইয়া যখন ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন মাহুতগণ অন্তত ২।৩টি পোষা কুন্‌কী লইয়া তাহার নিকট গমন করে। প্রত্যেক পোষা হস্তীর পৃষ্ঠে দুইজন লোক থাকে। একজন চালক আর একজন বন্ধনকারী। বন্ধনকারী একটি সুদৃঢ় রজ্জু নির্ম্মিত ফাঁদ লইয়া বসিয়া থাকে। এই রজ্জুর অপরদিক পোষা হস্তীর শরীরে বাঁধিয়া রাখে। পোষা হস্তী বন্য হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইলেই মাহুত হস্তস্থিত বৃহৎ ফাঁদ বন্য হস্তীর মস্তকে ফেলিয়া দেয়। মস্তকোপরে ফাঁদটি পতিত হইলে বন্যহস্তী স্বীয় প্রকৃতি বশত শুণ্ডটি জড়াইয়া আনে, তখন সহজেই সেই ফাঁদ গলদেশে আসিয়া পতিত হয়। বন্য কুন্‌কীটি বিশেষ বলবতী হইলে পরে আরও দুই একটি ফাঁদ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করা হয়। ইহাকে ফাঁসি শিকার বলে। ফাঁসিদ্বারা বন্য হস্তী কাবু হইয়া আসিলে তাহার পশ্চাদ্দিকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া ফেলে।

এই ত্রিবিধ উপায়ে ত্রিপুরার রাজসরকার হইতে হস্তী ধৃত করা হয়। হস্তিব্যবসায়িগণ মহারাজ হইতে পাট্টা লইয়া প্রতি বৎসরই হস্তী ধৃত করিয়া থাকে। ব্যবসায়িগণকে ধৃত হস্তীর প্রায় চতুর্থাংশ রাজকর প্রদান করিতে হয়। হস্তীর শুল্ক হইতে মহারাজ কোন কোন বৎসর ২৩।২৪ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। *

* অল্প কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২৪ হাজার

বন্য বিহঙ্গ :— ত্রিপুরা পর্ব্বত বন্য বিহঙ্গে পরিপূর্ণ। বিবিধ প্রকার সুবর্ণ রঞ্জিত কিম্বা কলকণ্ঠ, কোন জাতীয় পক্ষীর অভাব নাই। টিয়া, মদনা, চন্দনা প্রভৃতি কেবল তোতা জাতীয় পাখী প্রতি বৎসর ১০।১৫ হাজার ধৃত হইয়া ত্রিপুরা নওয়াখালী ও শ্রীহট্টের বাজার সমূহে বিক্রীত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাংশে ধনেশ পাখী দৃষ্ট হয়। ইহাদের দেহে বসা এত অধিক যে, সূর্য্যের আলোকে তাহাদের চলচ্ছক্তি থাকে না, তৎকালে মনুষ্যগণ অতি সহজে তাহদিগকে ধৃত করে কিম্বা মারিয়া ফেলে। ধনেশের বসা সূতিকা রোগের একটি মহোষধি।

সর্প :—ত্রিপুরা রাজ্যে নানা প্রকার প্রকাণ্ডকায় অজগর সর্প দৃষ্ট হয়। গোক্ষুর কেউটা প্রভৃতি বিষধরেরও অভাব নাই কোন কোন জাতীয় সর্প কুকিদিগের উপাদেয় খাদ্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

অধিবাসী :— ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩৭৪৪২ জন লোকের বাস। কিন্তু গণনা সম্পূর্ণ টাকা জমায় ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত দোয়ালগুলি ইজারা লওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সূত্রে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ সহিত কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় মহারাজ তাঁহাতে অসম্মত হন।

বিশুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমাংশ—যাহা ব্রিটীস সাম্রাজ্যের নিকটবর্ত্তী, তাহাতেই অধিক লোকের বাস। ক্রমে পূর্ব্বদিকে মনুষ্য বসতি বিরল।

ত্রিপুরারাজ্যবাসীদিগকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমত বাঙ্গালী, দ্বিতীয়ত লৌহিত্য বংশজ।

বাঙ্গালী ঃ— ইহাদিগকে তিন শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। মুসলমান প্রায় ৪০ হাজার এবং হিন্দু ১০ সহস্রের ন্যূন হইবে। খৃষ্টান দুই শতের ন্যূন। ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান নিতান্ত বিরল, নাই বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টানগণ চট্টগ্রামের ফেরিঙ্গী বংশজ। ইহারা পূর্ব্বে মহারাজের সামরিক বিভাগে কার্য্য করিত।

লৌহিত্যবংশ ঃ— নরজাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যাহাদিগকে "তিব্বতী-ব্রহ্ম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে লৌহিত্য বংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (বারকিও-সাংপো) নদের তীর ভূমি ইহাদের প্রাচীন নিবাসস্থল। এই প্রবাদ হইতে ইহারা লৌহিত্যবংশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। লৌহিত্য বংশ তিন শ্রেণীতে

বিভক্ত যথা ঃ—হিমালয়, পূর্ব্বপ্রান্ত ও মগী।* ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব্বপ্রান্ত ও মগী শ্রেণীর সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইতেছে।

তুইপ্রা বা তিপ্রা (ত্রিপুরা) গণ প্রধানত চারি শাখায় বিভক্ত যথা, (১) তিপ্রা, (২) জমাতিয়া (৩) নওয়াতিয়া, (৪) রিয়াং। এই সকল প্রধান শাখা বহুবিধ প্রশাখায় বিভক্ত।

তিপ্রা ঃ— এই শাখা হইতে বর্ত্তমান রাজবংশের উদ্ভব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা ঘোষণা করিতেছেন।† রেইনলড সাহেব লিখিয়াছেন, "আকৃতি দ্বারা তিপ্রাগণ খসিয়াদিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়।"‡ ইতিহাস লেখক

* হিমালয় শ্রেণী	পূর্ব্বপ্রান্ত শ্রেণী।	মগী শ্রেণী।
১। মেচ।	১। গারো।	১। আরাকানী।
২। কোচ।	২। ত্রিপুরা।	২। ব্রহ্মা।
৩। লেপচা।	৩। কাছাড়ি।	৩। শ্যান।
৪। ভুটীয়া।	৪। মণিপুরী।	৪। খশ।
৫। তিব্বতী।	৫। নাগা।	ইত্যাদি।
	৬। কুকি।	
	৭। খেয়ান।	

† *Statistical Account of Bengal. Vol VI. p. 483.*
Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 79.
Dalton's Ethnology of Bengal. p. 109.

‡ *Reynold's Tribes of the Eastern Frontier. (J. A. S. B. XXXII. 407.)*

বিবেচনা করেন ইহারা শ্যানবংশরূপ বিশাল দ্রুমের একটি শাখা। তিপ্রা ও কাছাড়িগণ সেই শাখার দুইটি প্রশাখা মাত্র। আমাদের প্রভু শব্দটি শ্যান ব্রহ্মা প্রভৃতি জাতি দ্বারা "ফ্রা" রূপে অপভ্রংশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সেই জাতীয় নরপতিগণ এই "ফ্রা" উপাধি ধারণ করিতেন। এই ফ্রা হইতে "ফা" শব্দের উদ্ভব। মাণিক্য উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিপুরা-পতিগণ সকলেই "ফা" উপাধি ধারণ করিতেন। কল্যাণ মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরপতি ব্যতীত রাজ বংশজ অন্যান্য ব্যক্তিগণ সেই ফা আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। ২৭০ বৎসর গত হইল মহারাজ কল্যাণমাণিক্য স্বীয় বংশধরদিগকে "ফা"র পরিবর্ত্তে "ঠাকুর" আখ্যা প্রদান করেন।

ত্রিপুরাগণ নিম্নলিখিত প্রশাখা বা "দকায়" বিভক্ত যথা ঃ— (১) তিপ্রা (ত্রিপুরা)। (২) বাছাল, (৩) দৈত্যসিং, (৪) কুওয়াতিয়া, (৫) সিউক, (৬) ছএতিয়া, (৭) গালিম, (৮) আপাইয়াছা, (১০) ছিলটিয়া, (১১) সেনা। সর্ব্বপ্রকার ত্রিপুরার সংখ্যা বোধ হয় ৪০ সহস্রের ন্যূন হইবে না।

জমাতীয়া ঃ— ইহারা তিপ্রাবংশের একটি বিশুদ্ধ শাখা। প্রাচীন কালে ইহারা ত্রিপুরার প্রধান সৈন্য ছিল। ইহাদের সংখ্যা ৪।৫ সহস্রের ন্যূন হইবে না। ১২৭৩ ত্রিপুরাব্দে ইহারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও

দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। * তদনন্তর জমাতীয়াগণ পার্ব্বতীয় উগ্রভাব পরিহার পূর্ব্বক ক্রমে নিরীহ বাঙ্গালী ভাব ধারণ করিতেছে। ইহারা জুম কৃষি পরিত্যাগ করত বাঙ্গালীর ন্যায় ক্রমে গরুর দ্বারা হল কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নওয়াতীয়া ঃ— বোধ হয় মগবংশের কতকগুলি লোক ত্রিপ্রাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া নওয়াতীয়া বা নূতন-ত্রিপ্রা বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৩।৪ সহস্র হইবে। নওয়াতীয়াগণ নিরীহ প্রকৃতি সম্পন্ন।

রিয়াং ঃ— ইহাদিগকে কুকিদিগের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়। ত্রিপ্রাদিগের মধ্যে ইহাদিগের প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা উগ্র। রিয়াং দফার সংখ্যা বোধ হয় ৪ সহস্রের ন্যূন নহে।

শারীরিক গঠন ঃ— ত্রিপ্রাগণ মধ্যমাকার, সবল শরীর, ঈষৎ গৌরবর্ণ, নাসিকা চাপা, চিবুক শ্মশ্রু হীন, বাহু-যুগল মাংসল, পদ গুচ্ছ মোটা ও সুদৃঢ়। ইহাদিগকে দর্শন করিলেই লৌহিত্য বংশজ বলিয়া বোধ হয়।

স্বভাব ঃ— ত্রিপ্রা জাতির স্বভাব মধুর, সুন্দর ও সারল্যপূর্ণ। ইহারা দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের ন্যায় শ্বাপদ প্রকৃতি সম্পন্ন না হইলেও ভীরু নহে। পর দুঃখে ইহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। কাপট্য ইহাদের নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। ইহাদের

* দুই শতাধিক জমাতিয়া মুণ্ড দ্বারা সেই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। (*O'Donel's Report. 1863-64.*)

হৃদয়ের প্রফুল্ল ভাব সর্ব্বদা বদন মণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যে সকল কুপ্রবৃত্তি দ্বারা মনুষ্য ক্রূর ও পশুভাবাপন্ন হইয়া থাকে, ইহাদিগের মধ্যে সেই সকল কুপ্রবৃত্তি প্রায় দৃষ্ট হয়না। কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলে, ইহারা তাহা প্রাণান্তেও লঙ্ঘন করে না। ইহারা স্বাবলম্বী, পরের গলগ্রহ হওয়া ইহাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক। ইহাদের একতা বিশেষ প্রসংশনীয়। ইহারা আশুতুষ্ট ও আশুরুষ্ট জাতি, তদ্ব্যতীত ইহাদের প্রতি অন্য কোনরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ব্যবসায়ী ও রাজকর্ম্মচারিগণের সংসর্গে ত্রিপুরাজাতির দেবতুল্য চরিত্র ক্রমে স্খলিত হইতেছে।

বাসস্থান ঃ— পর্ব্বতের সানুদেশে দ্বিতল কাচাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিপুরা জাতি বাস করে। নিম্নে তাহাদের পালিত পশু পক্ষী থাকে। মাচার উপরে বা দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ইহারা সপরিবারে বাস করে। ইহাদের এক একটি বাড়ী, এক একখানি ক্ষুদ্র পল্লী সদৃশ, তাহাকে পাড়া বলে। অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হইয়া তাহাতে বাস করে। প্রত্যেক বাটীর এক একজন সরদার আছেন, তাঁহারা রাজসরকার হইতে চৌধুরী, হুকরা, পোয়াং,* সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সরদারগণ সামন্ত নরপতি বিশেষ। সামান্য অপরাধ

* এই পোয়াং শব্দটি আমাদিগকে শ্যান ইতিহাস স্মরণ করিয়া দিতেছে।

ও সামাজিক বিরোধের বিচার কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা স্ব স্ব বাটীর নিকট, পর্ব্বতের নিম্নস্থিত নির্ঝর কিম্বা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পার্শ্বে ক্ষুদ্র কুপ খনন করে। সেই সকল কুপ সর্ব্বদা নির্ম্মল ও সুশীতল জল পরিপূর্ণ থাকে। তাহারা সেই জল পান করে।

জুমক্ষেত্র ঃ— একবাটী বা পাড়ার স্ত্রী পুরুষগণ, একত্রিত হইয়া জুমক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্ধ আতুর ব্যতীত অন্য সকলেই তাহাতে কার্য্য করে। পৌষ মাঘ মাস মধ্যে ক্ষেত্রের জন্য একটি বৃহদায়তন স্থান নির্ণয় করিয়া তাহার বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলে। প্রায় একমাস কাল সূর্য্যের উত্তাপে সেই সকল শুষ্ক হইয়া যায়। চৈত্র মাসে তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে। বৈশাখ মাসে টাকুয়াল নামক "দা"দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ধান্য, কার্পাস, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, মরিচ, ভুট্টা, ও নানা প্রকার তরকারীর বীজ একত্র করিয়া বপন করে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে জুম ক্ষেত্র বাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। এই সময় ভুট্টা, ফুটি, কাঁকুড় প্রভৃতি সুপক্ক হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে ধান্য বাহির হইতে থাকে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে তাহা কাটা শেষ হয়। কার্ত্তিক মাসে কার্পাস ও তিল সংগ্রহ করা হয়। জুমক্ষেত্রে তিপ্রাগণ নানা প্রকার কচু উৎপন্ন করিয়া থাকে, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। দীর্ঘকাল কোন একস্থানে জুমকৃষি করিলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় না। এজন্য তাহারা

২।৩ বৎসর অন্তে বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন স্থানে যাইয়া বাটী নির্ম্মাণ করে ও তাহার পার্শ্বে জুমক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ব্যবসায় ঃ— ত্রিপুরাগণ তাহাদের জুমক্ষেত্রের কার্পাস ও তিল এবং অরণ্যজাত কাষ্ঠ, বেত, ছন (খড়) ও জালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে।

রাজকর ঃ— ইহাদিগকে ভূমির কর দিতে হয় না। অন্ধ, আতুর, অবিবাহিত ও বিপত্নীক ব্যতীত অন্যেরা কর প্রদান করে। প্রতি দম্পতি বার্ষিক ৩৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত রাজকর প্রদান করিয়া থাকে।

বিবাহ ঃ— ইহাদের মধ্যে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে, (১) হিক্‌নানানী, (২) কাইজগ্‌নানী।

হিকনানানী ঃ— স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মনোমিলন দ্বারা এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহাই আদিম ও বিশুদ্ধ প্রথা। ইহাতে কোনরূপ ক্রিয়া কার্য্য কিম্বা কৃত্রিম উৎসবের প্রয়োজন নাই। পরস্পর "ত্বং মেপতি ত্বংমেভার্য্যা" ইত্যাকার জ্ঞান বা স্বামী স্ত্রী এইরূপ স্বীকারই এ বিবাহের একমাত্র কার্য্য। এইরূপ বিবাহে সামাজিকদিগকে একটি ভোজ দিতে হয়। কিন্তু দরিদ্র কিম্বা অক্ষম ব্যক্তি এরূপ ভোজ প্রদান করিতে বাধ্য নহে।

কাইজগ্‌নানী ঃ— অভিভাবকদিগের প্রস্তাব অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহাতে বরকে বিবাহের পূর্ব্বে ন্যূনাধিক

এক বৎসর কাল শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া তাহার সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সময় বর কন্যা স্বামী স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহা তাহারা নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে না। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে শূকর ও কুক্কুট প্রভৃতি বলিদান পূর্ব্বক লাম্‌প্রা নামক দেবতার পূজা প্রদান করত কন্যার মাতার প্রদত্ত একপাত্র মদিরা কন্যা অর্দ্ধাংশ পান করিয়া অপরার্দ্ধ বরকে পান করিতে দেয়, বর তাহা পান করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল। আত্মীয় বর্গের পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্য প্রচুররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে বর স্থানান্তর চলিয়া যায়। দুই দিবা এক রাত্রি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক বর পুনর্ব্বার স্ত্রীর নিকট আগমন করে।

আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ নিবিড় অরণ্যবাসী প্রকৃতির পুত্র কন্যাগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই "কাইগ্‌জনানী" বিবাহটিকে বাঙ্গালীদিগের বিবাহের ন্যায় করিবার জন্য উপায় করিয়া ফেলিয়াছেন। কন্যার পণ, যৌতুকের ব্যবস্থা, * পুরোহিতের মন্ত্র পাঠ, কন্যা সম্প্রদান, পুরোহিতের প্রাপ্য নাপিতের প্রাপ্য, ধোপার প্রাপ্য সকলই ঠিক হইয়া গিয়াছে।

* যৌতুকের ব্যবস্থা অতি চমৎকার হইয়াছে যথা, পিতলের কলসী এক জোরা, থালা এক জোরা, বাটী এক জোরা, খাট ১ জোরা, শৌল মৎস্য এক জোরা, পায়রা এক জোরা,

ত্রিপ্রাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। পরিত্যাগ প্রথা ইহাদের মধ্যে অপ্রচলিত নহে। পরিত্যাগের জন্য বিরোধ উপস্থিত হইলে গ্রাম্য পঞ্চাইতগণ তাহার বিচার করিয়া থাকেন। কোন পক্ষ ইহাতে অসম্মত হইলে সে ব্যক্তি রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে পারে। পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

দেবতাঃ— ত্রিপ্রাগণ নানা প্রকার দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে। চতুর্দ্দশটী দেবতা তাহাদের প্রধান উপাস্য। আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ হিন্দু আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। এই চতুর্দ্দশ দেবতা ব্যতীত আরও কয়েকটী দেবতা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রিপ্রাগণ ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, সুতরাং হিন্দুর ৩৩কোটি দেবতা তাহাদের পূজ্য ও উপাস্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমরা কেবল তাহাদের জাতীয় দেবতারই উল্লেখ করিব। ত্রিপ্রা ভাষায় দেবতাকে মতই বলে।

মতইকতর ঃ— মতই—দেব ; কতর—মহা, শ্রেষ্ঠ, বৃহৎ। যৌগিক অর্থ মহাদেব। ইনি ত্রিপ্রাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। মহাদেব যে কিরাত জাতির প্রধান উপাস্য দেবতা

পাঠা এক জোরা এবং মসলা ১২ প্রকার। ইহাই কন্যার পিতাকে দিতে হয়।

তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন। লৌহিত্য বংশীয় অনার্য্যদিগকে হস্তগত করিবার জন্য বৌদ্ধ-দ্রোহী ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের প্রধান দেবতাটি আপনাদের দেবতা শ্রেণীতে সংস্থাপন করিয়াছেন কিনা তাহা বিশেষ বিবেচ্য। * তিব্বতদেশ হইতে মহাদেব ও মহাদেবীর যে বর্ণনা ও চিত্রপট সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। † মহাদেবের নিবাস ভূমি (কৈলাস) কিরাত জাতির সূতিকা গৃহ তিব্বতদেশ মধ্যে অবস্থিত। হস্তী

* His *(Mahadeb)* residence in the far Kylasa, his braided hair, his oblique eyes, his great proclivity for smoking, his reputed authership of the Tantrika, nasal, monosyllabic Mantras, go far to prove him to be a Mongolian rather than of Aryan type. *Rangalal Banerji's Identification of Aboriginal Tribes. (P. A. S. B. 1874. p. 10.)*

† শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত দেশ হইতে এই তত্ত্ব ও চিত্রপট সংগ্রহ করিয়াছেন। *See Journal and Text of the Buddhist Text Society of India. Vol. I. part. III.* আমাদের মহাদেবের বাহন বৃষ, কিন্তু তিব্বতিদিগের মতে তিনি মহিষবাহন। আমাদের মহাদেব সংহারকারী, তিব্বতিগণও তাঁহাকে মৃত্যুপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে নরমুণ্ড মালা বিলম্বিত; মস্তকে নরকপাল শোভিত মুকুট। তাঁহার পত্নী শ্রীমতীচামুণ্ডা দেবী "মহাপাত্র" দ্বারা তাঁহাকে মদিরা পান করাইতেছেন। চামুণ্ডাদেবী উলঙ্গিনী, পৃষ্ঠে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিলম্বিত।

কিম্বা ব্যাঘ্র চর্ম্ম তাঁহার বসন। তাঁহার পত্নী দুর্গা ও গঙ্গা উভয়ই কিরাত কন্যা। * মহাবীর অর্জ্জুন কিরাত বেশ ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করত কিরাতরূপী ভগবান "বিরূপাক্ষের" দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে হরগৌরীর উল্লেখ নাই। প্রথম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১০ম ঋকে অগ্নিকেই রুদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।† সামবেদীয়া কেনোপনিষদে আমরা প্রথমতঃ হৈমবতী উমাদেবীর দর্শন পাইতেছি। কিন্তু তাহাতে তিনি শিবের পত্নী নহেন। ইন্দ্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান জন্য কেনোপনিষদে "অতি সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমার" প্রথম আবির্ভাব। এবম্প্রকার বহুবিধ কারণে অনুমিত হইতেছে যে, কিরাত জাতির প্রধান উপাস্য দেব মতইকতর আমাদের পুরাণাদিতে "মহাদেব" রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লাম্‌প্রা :— খাব্বি (আকাশ ও সমদ্র) দুইটি দেবতা।‡ সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যে "লাম্‌প্রা" পূজা হইয়া থাকে।

* প্রাচীন কোষকারগণ "কিরাতি" শব্দের অর্থস্থলে দুর্গা ও গঙ্গার নাম লিখিয়াছেন। এজন্য বোধ হয় ইঁহারা কিরাত রাজ কন্যা।

† ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১ মণ্ডল ৪৩ সূত্র ১ ঋকের টীকায় বৈদিক রুদ্র সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। তদ্দ্বারা আমাদের মত পোষণ করিতেছে।

‡ এস্থলে "প্রা" অর্থ সমুদ্র। পাঠকগণ আমাদের পূর্ব্ব বর্ণনা স্মরণ করুন।

সাংগ্রীমা ঃ— হিমাদ্রি। চতুর্দ্দশটি দেবতার মধ্যে সর্ব্বদা লাম্প্রা ও সাংগ্রমার পূজা হইয়া থাকে। অন্যান্য দেবতাগণ প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন।

তুইমা ঃ— গঙ্গা। অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষরূপে তুইমা পূজা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত সচরাচর সামান্য ভাবে তুইমা পূজা হয়। কাহারও কোন রোগ হইলে নিকটবর্ত্তী নদীতে তুইমার পূজা প্রদান পূর্ব্বক ওঝাই (পুরোহিত) বলে, "এই রোগীকে অমুক দেবতা আক্রমণ করিয়াছেন। অতএব সেই দেবতার পূজা দিতে হইবে। তদনুসারে ঐ দেবতার পূজা প্রদান করা হয়।

মাইনুমা ঃ— ধান্যের দেবতা। তাঁহার কৃপাতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি বিমুখ হইলে ধান্য জন্মে না।

খুনুমা ঃ— কার্পাসের দেবতা। তাঁহার কৃপাতে কার্পাস জন্মে।

বুড়াছা ঃ— রোগশান্তির জন্য প্রায়ই এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

বনিরাও এবং থনিরাও। ইহারা দুই ভ্রাতা বুড়াছার পুত্র।

বুড়িরক ঃ— ৭টি ভগিনী। ৬ জনা বিবাহিতা তাঁহাদের স্বামী আছেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠা অবিবাহিতা তিনি"মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া করেন। কেহ ইহাদিগকে ডাকিনী, যোগিনী,কেহবা "৭ বইন পরী" বলিয়া থাকেন।

গরাইয়া ও কালাইয়া ঃ— ইঁহারা দুই ভাই। চৈত্র সংক্রান্তিতে আমাদের বারওয়ারি পূজার ন্যায়, বিশেষ ধুমধামের সহিত ইহাদের পূজা হইয়া থাকে। গ্রামের সকল লোক এই পূজায় যোগদান করে। তৎকালে ২।৩ দিন তিপ্রাগণ মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে অতিবাহিত করে। তাহারা মূলীবাঁশ পুঁতিয়া দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ত্রিপুরাগণ সকল দেবতা পূজাতেই দুইটী বাঁশের চুঙ্গি গ্রহণ করে। তাহার একটিতে জল অন্যটিতে মদ্য থাকে। তাহাদের জাতীয় ভাষায় মন্ত্র পাঠ করত সেই চুঙ্গি হস্তে লইয়া জল ও মদ্য দেবতাকে প্রদান করে। ইহারা মুরগের ও হাসের ছানা, শূকর, পাঠা প্রভৃতি বলিদান করত দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

রাজকীয় পূজাঃ—

খার্চি পূজা ঃ—আষাঢ় মাসে চতুর্দ্দশ দেবতার বাটীতে এই পূজা হইয়া থাকে। তৎকালে জীব রুধিরে স্রোত প্রবাহিত হয়। এই পূজায় অন্যূন ২।৩ শত ছাগ বলিদান করা হয়। পূর্ব্বে এই খার্চি পূজায় নরবলি দেওয়া হইত।

কের পূজা ঃ—খার্চি পূজার ১৪ দিন পরে চতুর্দ্দশ দেবতার বাটীতে এই পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার সময় এক দিবা দুই রাত্রি ত্রিপুরাবাসিগণকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। এমন কি নৃপতিও গৃহের বাহির হইলে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই তাঁহার অর্থ দণ্ড করিয়া থাকেন।

পুরোহিত ঃ— ত্রিপুরাদিগের জাতীয় পুরোহিতগণ "ওঝাই" বলিয়া পরিচিত। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইনি ত্রিপুরারাজ্যের "লর্ড বিশপ"। তাঁহার অধীন পূজকগণ গালিম নামে অভিহিত। পুরোহিতের পুত্র পুরোহিত হইবে, এইরূপ নিয়ম ত্রিপুরাদিগের মধ্যে নাই। মন্ত্রাদি শিক্ষা করিলে যে কোন ত্রিপুরা ওঝাই ও গালিম হইতে পারে। প্রধান গালিম চন্তাই হইয়া থাকেন।

ত্রিপুরাজাতি সকল বিষয়েই বাঙ্গালিদিগের অনুকরণ করিতেছে। ইহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বসন, ভূষণ সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

ত্রিপুরাদিগের স্বতন্ত্র একটি ভাষা আছে। ইহা লিখিত ভাষা নহে। তাহাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির ভাষার সহিত ইহার বিশেষ সংশ্রব রহিয়াছে। কিন্তু অবিকৃত ও বিকৃত বাঙ্গালা শব্দ ক্রমে এই ভাষায় প্রবেশ করিতেছে।

হালাম ঃ—ইহারা কুকি ও ত্রিপুরার মধ্যবর্ত্তী জাতি। আমাদের বিবেচনায় ইহারা মিশ্রজাতি। হালামগণ প্রধানত ত্রয়োদশ "দফা" (শাখায়) বিভক্ত, যথা—(১) রাংখল, (২) কাইপেং (৩) মরছম, (৪) রুপনী, (৫) খুলং, (৬) দাপ, (৭) কলই, (৮) চড়াই, (৯) মছবাং, (১০) লঙ্গাই, (১১) বংশের (১২) কৰ্ব্বং (১৩) মুতিসাংলা। এই সকল শাখা অনেক গুলি প্রশাখায় বিভক্ত। ইহাদের ভাষা মূলত এক হইলেও

ভিন্ন ভিন্ন ".দফা " দ্বারা এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয় যে, প্রত্যেক দফার একএকটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া বোধ হয়। হালামগণ কুকি বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত। হালামদিগের বৃত্তান্ত অনবগত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে কুকি বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাদের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র হইবে।

কুকি :— ইহাদিগের বিবরণ পশ্চাৎ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইবে।*

ত্রিপুরেশ্বরের অধীন কুকিগণ পূর্ব্বে কোনরূপ কর প্রদান করিত না। বিশেষ বিশেষ কার্য্য কিম্বা পর্ব্বোপলক্ষে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া গজদন্ত উপঢৌকন প্রদান করিত। অধুনা পার্ব্বত্য জাতির নিয়মানুসারে কিঞ্চিৎ কর প্রদান করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা বিশুদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ করা দুরূহ।

মণিপুরী বা মেথ্‌লী :—প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের সময় হইতে মণিপুরীগণ ত্রিপুরা রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ত্রিপুররাজবংশে কন্যা সম্প্রদান করত ইহারা ধনবান ও সম্মানিত হইতেছে। ত্রিপুর রাজ্যে ইহাদের সংখ্যা ১০।১২ সহস্রের ন্যূন হইবেনা।

আসামী :--মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর আসামের "আহুম বংশীয় " রাজ কন্যা বিবাহ করেন। সেই সূত্রে

* তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

কতকগুলি আসামদেশীয় মানব ত্রিপুর রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

চাক্‌মা :— অল্পকাল মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী কতকগুলি চাক্‌মা মগ ত্রিপুরায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। "চীন লুসাই" অভিযান সময় "কুলিধরার" ভয়ে প্রায় দশ সহস্র চাকমা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুরায় উপনীত হইয়াছিল। ইহারা পুনর্ব্বার চট্টগ্রামে গমন করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজবংশ :— প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজ বংশের উৎপত্তি বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

শুন শুন মহারাজ হইয়া সাবধান।
তোমার বংশের কথা করিছি বাখান ;
চন্দ্রবংশে মহারাজ যযাতি নৃপতি।
নিজ বাহুবলে শাসে সপ্তদ্বীপ ক্ষিতি॥
তান পঞ্চপুত্র হৈল যেন কল্পতরু।
যদু তুর্ব্বসু আর দ্রুহ্যু অনু পুরু॥
শুক্র কন্যা দেবযানীর দুই হইল পুত।
রাজ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার হৈল তিন সুত॥

* * * *

বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তনয়।
দ্রুহ্যু নামে রাজা হৈল ইন্দ্রের আলয়।

ঋগ্বেদ রচনা কালে আর্য্যগণ পঞ্চনদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা তৎপক্ষে বিষম সন্দেহ রহিয়াছে। ঋগ্বেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ প্রণীত হয়। তদনন্তর শুক্ল যজুঃ রচিত হইয়াছে। উক্ত শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, "সদানীরা (গণ্ডকি) নদীর পূর্ব্বদিকে জলপ্লাবিত স্থান।"* বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনা কালে বঙ্গ ভূমি সমুদ্র গর্ভে শায়িত কিম্বা শ্বাপদ জন্তুর বাসস্থল ছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশ "পাণ্ডব-বর্জ্জিত" অর্থাৎ পাণ্ডবদিগের সময়ে আর্য্য বর্জ্জিত। তদানীন্তন ত্রিপুরার অবস্থা চিন্তা করিলে ইতিহাস স্তম্ভিত হয়।

ঋগ্বেদ সংহিতার চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম মণ্ডলে বারংবার যযাতির পঞ্চ পুত্রের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা তদপেক্ষা প্রাচীন হইতেছেন। সপ্তম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের দ্বাদশ ঋকে লিখিত আছে, "দ্রুহ্যুকে ইন্দ্র জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছিলেন।" চতুর্দ্দশ ঋকে লিখিত আছে, "অনু ও দ্রুহ্যুর পুত্রগণকে ইন্দ্র বধ করেন।" জগতের আদি গ্রন্থ

* *Muir's Sanskrit Text. Part II. p. 420.*

ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন দ্রুহ্যু ও তাঁহার পুত্র কিরূপে ত্রিপুরার উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা অবধারণ করা মানব বুদ্ধির অগম্য।

সেই দিবস লর্ড ডেলহাউসী কর্ত্তৃক ব্রহ্মার যে রাজবংশ হৃতরাজ্য হইয়াছেন। আলংক্রা এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা। তিনি খৃষ্টাব্দের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। সেই আলংক্রার বংশধরগণও সূর্য্যবংশজ বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এবম্প্রকার অবস্থায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজবংশজাত ত্রিপুরেশ্বরগণ চন্দ্রবংশজ বলিয়া পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে। রাজমালা অনুযায়ী ত্রিপুরেশ্বরদিগের বংশাবলী প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা বারংবার বলিয়াছি, ত্রিপুর রাজবংশ অতি প্রাচীন এরূপ প্রাচীন বংশ ভারতে দ্বিতীয় নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা হিন্দু সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশ ক্রিয়া কলাপ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতেছে; কিন্তু ত্রিপুরাদিগের জাতীয় ব্যবহার তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করেন নাই।

বিবাহ ঃ— রাজবংশে তিন প্রকার বিবাহ প্রথা দৃষ্ট হয়। যথা, ব্রাহ্ম, শান্তিগৃহীতা ও কাছুয়া। ব্রাহ্ম বিবাহ বাঙ্গালীদিগের অনুরূপ। ইহাতে অভিভাবকের কন্যা সম্প্রদান ও

যথারীতি পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি সকল কার্য্যই হইয়া থাকে। শান্তিগৃহীতা বিবাহে সম্প্রদানের প্রয়োজন নাই; বর কন্যা একত্র বসিয়া পুষ্পমালা পরিবর্ত্তন করে ও পুরোহিত তৎকালে মন্ত্রপূত শান্তিজলে উভয়কে অভিষেক করিয়া থাকেন। * কাছুয়া বিবাহ ত্রিপুরাদিগের হিকনানানী বা প্রাচীন গন্ধর্ব্ব মতানুযায়ী। "ত্বংমেপতি ত্বংমে ভার্য্যা" ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম ও শান্তিগৃহীতা রাজপত্নীগণ বিবাহ কাল হইতেই "মহারাণী" "মহাদেবী" বা "ঈশ্বরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু কাছুয়া পত্নীগণ নরপতি কর্ত্তৃক এই সকল উপাধি প্রাপ্ত না হইলে তাহা ধারণ করিতে

* সাধারণ ত্রিপুরাদিগের ন্যায় রাজবংশেও পূর্ব্বে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল; ত্রিপুরেশ্বরগণ যৎকালে বাঙ্গালী কন্যা বিবাহের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন, তৎকালে, তাঁহারা কাইজগ্‌নানী বিবাহকে হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়া তুলেন। প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ অনেকে বাঙ্গালী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ রামমাণিক্যের পট্টমহিষী মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের জননী এবং মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের পট্টমহিষী মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের জননী বাঙ্গালী ভদ্র লোকের কন্যা ছিলেন। এইরূপে কাইজগ্‌নানী বিবাহটি ব্রাহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। হিক্‌নানানী বিবাহটি ঠিক রহিয়াছে। অল্পকাল মধ্যে মণিপুরীদিগের সংসর্গে এই শান্তিগৃহীতা বিবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু, মণিপুরী ও ত্রিপুরা ব্যবহারের সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইতেছে।

পারেন না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও বিচার পতিগণ রাজ পরিবারের আঁচার ব্যবহারের গূঢ়তত্ত্ব অবগত না হইয়া স্থানে স্থানে নানারূপ অপ্রকৃত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কাছুয়া রাণীর গর্ভজাত মহারাজ রাজধর মাণিক্যকে রেসিডেণ্ট বুলার সাহেব "জারজ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* এই কাছুয়ার গর্ভজাত মহারাজ রামগঙ্গাকে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি নরমেন ও কেম্প" সাহেব দাসী পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† মহারাজ ঈশানচন্দ্র ও বীরচন্দ্র মাণিক্যের জননী কাছুয়া ছিলেন। ঈশানচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে পর, তাঁহার জননী মহারাণী উপাধি প্রাপ্ত হন। এই গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ, (চক্রধ্বজের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "রাজা ইচ্ছা করিলে সন্তানের জন্মের পর তাহাকে বিধিসিদ্ধ করিতে পারেন।" ‡ যে কাছুয়াগণ অন্যান্য পত্নীর ন্যায় স্বীয় পতির সহিত অনুমৃতা

---

* Rajdhar Manick the present Zemindar is the illigitimate son of Harry Money the brother of the late Raja Kishen Manick. *Letter from the Resident of Tipperah, to the Collector of Chittagong 12th August, 1788.*

† *Weekly Reporter. Vol. I. page 179.*

‡ *Weekly Reporter. Vol. I. page. 194.*

হইয়াছেন ;— যাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ ব্রাহ্ম ও শাস্তিগৃহীতা মহিষিগণের গর্ভজাত পুত্রগণকে অতিক্রম করত পৈত্রিক সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।* সেই কাছুয়াগণকে পত্নীপদ হইতে বিচ্যুত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। ঠিক হিন্দুভাবে ইহাদের বিচার করিলে চলিবে না। ত্রিপুরাজাতির বিবাহ প্রথা এরূপ সরল যে তাঁহাদের মধ্যে জারজপুত্র উৎপন্ন হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। + ত্রিপুরা রাজপরিবারের অধিকাংশ বিবাহ প্রাপ্তবয়স্ক বর কন্যার মধ্যে সম্পাদিত হয়। বিধবা বিবাহ কদাচিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম :—প্রাচীন ত্রিপুরা পতিগণ শৈব ও শাক্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত শিব ও কালী মন্দিরসমূহ তাঁহাদের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। দেবতামুড়ার পর্ব্বত গাত্রে শিব, দুর্গা ও কালী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তিসমূহ

* কল্যাণ মাণিক্যের পর হইতে কাছুয়া গর্ভজাত যে সকল নরপতি ত্রিপুরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য, রাম মাণিক্য, মহেন্দ্র মাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক্য, রাজধর মাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য, কাশীচন্দ্র মাণিক্য, ঈশানচন্দ্র মাণিক্য, এবং বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

+ কাপ্তান লেউইনও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। *Lewin's Hill Tracts of Chittagong. page 80.*

স্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহাদের স্থাপিত চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ ও উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী উল্লেখ যোগ্য। উভয়ই তন্ত্রোক্ত পীঠ স্থান ও শৈব, শাক্তের প্রসিদ্ধ তীর্থ। রাজধর মাণিক্যের সময়ে নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামিগণ রাজপরিবারে কৃষ্ণভক্তির বীজ বপন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের শাক্ত ভাব বিদূরিত হয় নাই। ত্রিপুরাজাতির আদিম দেবতাগণ ও রাজপরিবারে আধিপত্য পরিত্যাগ করেন নাই।*

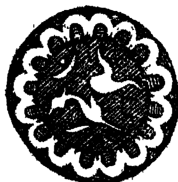
উত্তরাধিকারীত্বের নিয়ম ঃ—মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে জগতের সাধারণ নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র পৈত্রিক রাজদণ্ড ধারণ করিতেন। কল্যাণ মাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি ত্রিপুররাজবংশে যুবরাজ নিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নরপতি দ্বারা আরও দুইটি পদ সৃষ্ট হইয়াছে, যথা "বড় ঠাকুর" ও "কর্ত্তা"। এই দুইটি পদ সৃষ্টি দ্বারা রাজ পরিবারে অনন্ত কলহের বীজ সংরোপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ যে রূপ "কর্ত্তা" পদটিকে ফুৎকার দ্বারা উড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন, বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তদ্রূপ বড়ঠাকুরের পদটিকে সুদৃঢ় করিতে যত্নবান হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিবেচনায় উভয় পদের গুরুত্ব সমতুল্য বটে।

* *O'Donel's Report. 1863-64.*

ফলত যুবরাজ ব্যতীত অন্য দুইটি পদ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ঐ দুইটি পদের উন্নতি সম্পূর্ণ কুলাচারানুমোদিত বলিয়া বোধ হয়না।

রাজচিহ্ন ঃ— ত্রিপুরার রাজসিংহাসনটি অতি প্রাচীন। যদিচ বারংবার ইহার সংস্কার হইয়াছে, তত্রাচ তাহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই সিংহাসন অষ্টকোণ এবং ষোড়শ সিংহ ধৃত। ৮টি সিংহ উপলক্ষ মাত্র, অপর ৮টি সিংহের মস্তকোপরে সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। (১) হনুমান ধ্বজ (২) দণ্ড, (৩) ধবলছত্র, (৪) আরঙ্গি, (৫) চন্দ্রবাণ, (৬) সূর্য্যবাণ, (৭) মীন-মনুষ্য, (৮) মানবহস্ত (পাঁজা), (৯) তাম্বুলপত্র, এই ৯টি রাজকীয় প্রধান চিহ্ন। তদ্ব্যতীত কতকগুলি উপচিহ্ন আছে।

মুদ্রা (তঙ্কা) ঃ— দুইটি অতি প্রাচীন মুদ্রা আমরা দর্শন করিয়াছি, তাহা অপাঠ্য। তদ্ব্যতীত যেসকল মুদ্রার অক্ষর পাঠ করা যায়, তন্মধ্যে কল্যাণমাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র ছত্রমাণিক্যের মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তদপেক্ষা প্রাচীন কোন সুপাঠ্য মুদ্রা আমাদের হস্তগত হয় নাই। পার্শ্বে মহারাজ ছত্র-মাণিক্যের





মুদ্রার প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইল। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে "শ্রীহর-গৌরীপাদপদ্মমধুপ শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্য দেবস্য" এবং দ্বিতীয় পৃষ্টে একটি সিংহ ও তাহার পদ চতুষ্টয়ের নিম্ন ভাগে "শকাব্দা ১৫৮২" ক্ষোদিত রহিয়াছে।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের মুদ্রা আমরা দর্শন করি নাই; কিন্তু রাজমালায় লিখিত আছে যে, গোবিন্দ মাণিক্যের মুদ্রায় শিব নামের সহিত নরপতি ও তাঁহার পত্নীর নাম ক্ষোদিত হইয়াছিল। অদ্যাপি প্রত্যেক নরপতির অভিষেক কালে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা গোবিন্দমাণিক্যের মুদ্রার অনুকরণ মাত্র। রাজপরিবারের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সহিত "হর গৌরী" শব্দের পরিবর্ত্তে "রাধাকৃষ্ণ" শব্দ সংযোজিত হইয়াছে।



উপরে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের একটি মুদ্রার প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইল। ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় "রাধা কৃষ্ণ পদে শ্রীশ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য দেব শ্রীশ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

মহাদেব্যা" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে একটি সিংহ ও তাহার পদতলে "শকাব্দা ১৭৭১" লিখিত আছে।

ঈশ্বরী বা মহারাণী উপাধিধারিণী সমস্ত রাজপত্নীগণের নামে পৃথক পৃথক মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নৃপতির নাম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠা সকল মুদ্রাতেই একরূপ উৎকীর্ণ হয়।

মুদ্রা (মোহর বা সিল) :—ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীন কাল হইতে তিন প্রকার মুদ্রা (মোহর) ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। (১) পদ্ম-মোহর, (২) দেবাজ্ঞা-মোহর, (৩) খাস-মোহর।

(১) পদ্ম-মোহর। এই মোহর সনন্দাদিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই মোহরের মধ্যস্থলে নরপতির নাম ক্ষোদিত হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের নাম উৎকীর্ণ হইয়া থাকে। পার্শ্বে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের



পদ্ম-মোহরের প্রতিকৃতি উদ্ধৃত হইল। এই মোহরের মধ্য স্থলে "শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্য দেব" এবং চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে "কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ

মাণিক্য, রামমাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক্য, কৃষ্ণ মাণিক." ক্ষোদিত রহিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণ এরূপ সনন্দসমূহে পিতৃপুরুষগণের নাম সংযুক্ত মোহর ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির নামের সহিত মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী প্রভৃতির নাম সংযুক্ত করিতেন। তাঁহাদের মোহরগুলি প্রায়ই ডিম্বাকৃতি (বাদামী)। ইহার উপরার্দ্ধে রাজবংশের ধর্ম্মের পরিচায়ক কোনরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইত। গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের মুদ্রার শিরোভাগে ভগবান বিষ্ণুর বাহন "গরুড়" মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে।* বর্দ্ধন বংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের মুদ্রার শিরোভাগে ভগবান শশাঙ্কশেখরের বাহন "বৃষভ" মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। † মৌখরী বংশীয় মহারাজাধিরাজ সর্ব্ব বর্ম্মণের মুদ্রায় বৃষভারূঢ় ভগবান পিনাকপাণির মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। ‡ কোন কোন মুসলমান সম্রাট এক প্রকার মুদ্রা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষের নাম সংযুক্ত দৃষ্ট হয়। মোগল সম্রাট সাহজাহানের একটি মুদ্রার

* *J. A. S. B. Vol. LVIII. part I. p. 89.*

† *Corpus. Inscriptionum Indicarum. Vol. III. page 231.*

‡ *Ibid Vol. III. page 219.*

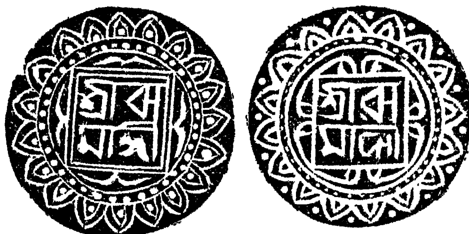
আশ্চর্য্য প্রতিলিপি আমরা দর্শন করিয়াছি। এই মুদ্রার মধ্য স্থলে "সাহাবুদ্দিন মাহাম্মদ সাহজাহান পাদশা" এবং তাহার চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে (১) তিমুর সাহেব, (২) মির্জ্জাসা, (৩) মির্জা সুলতান মাহাম্মদ, (৪) সুলতান আবু সৈয়দ, (৫) মির্জা অমর সেখ, (৬) বাবর পাদসা, (৭) হুমাউন পাদসা, (৮) আকবর পাদসা, (৯) জাহাঁগীর পাদসা, ক্ষোদিত রহিয়াছে।* ত্রিপুরেশ্বরদিগের পদ্ম মোহরগুলি মোগল সম্রাটদিগের এবম্প্রকার মুদ্রার পূর্ণ অনুকরণ বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

(২) দেবাজ্ঞা মোহর ঃ—কোন দেব নামের সহিত "আজ্ঞা" শব্দ সংযুক্ত বলিয়া ইহাকে "দেবাজ্ঞা" মোহর বলা হয়। রোবকারী, কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গের নামীয় চিঠিতে প্রধানত এই মোহর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন সনন্দেও এই মোহরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নরপতির দেবাজ্ঞা মোহরাঙ্কিত চিঠি আমরা দর্শন করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। কৃষ্ণমাণিক্য, রাজধর মাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য এবং কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য প্রভৃতি ৪ জন নরপতির মোহরে "শ্রীরামাজ্ঞা" ক্ষোদিত রহিয়াছে। কৃষ্ণমাণিক্য ও রাজধর মাণিক্যের মোহরের অক্ষরগুলি কিঞ্চিৎ প্রাচীন আকৃতি বিশিষ্ট। রামগঙ্গা মাণিক্যের মোহরাঙ্কিত শ্রীরামাজ্ঞা, "শ্রীরামাঙ্গা"বৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ অক্ষরের

* *Tavernier's Travales in India. p. 107.*

ভগ্নাংশ জ অক্ষরের মস্তকে আরোহণ পূর্ব্বক এরূপ বিকৃতি আকার ধারণ করিয়াছে। নিম্নে তিনটি দেবাজ্ঞা মোহরের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ১নং রাজধর মাণিক্য, ২নং রামগঙ্গা মাণিক্য, ৩নং কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মোহর।

২নং ১নং



৩নং

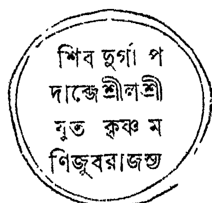


মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মোহরে "কালীভজ" কিম্বা "কালীংভজ" ক্ষোদিত হইয়াছিল। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্যের মোহরে "শিবাজ্ঞা"; মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণি-

ক্যের মোহরে "শ্রীগুরুআজ্ঞা" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজের মোহরে "শ্রীগোবিন্দআজ্ঞা" লিখিত আছে।

৩। খাস-মোহর ঃ—এই মোহরে পারসি অক্ষরে মহারাজের সম্পূর্ণ নাম লিখিত আছে। জমিদারী সংক্রান্ত কবুলিয়ত, দরখাস্ত, নোটীশ প্রভৃতিতে এই মোহর ব্যবহৃত হয়।

যুবরাজের মোহর ঃ—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হইতে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরপতিগণ এই মোহর ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেও রীতিমত অভিষেক না হইলে, মোহর পরিবর্ত্তিত হয় না। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি যে মোহর ব্যবহার করিতেন, তাহার আদর্শ মাত্র পার্শ্বে প্রদত্ত হইল। ইহাতে যুবরাজ শব্দের "য" এর পরিবর্ত্তে বর্গীয় "জ" ব্যবহৃত হইয়াছে। রাজধর মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্বে, তিনি যে মোহর ব্যবহার করিতেন, তাহাতে লিখিত আছে ঃ— "শ্রীলশ্রীযুত রাজধর ঠাকুর"। কাশীচন্দ্র মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মোহরে লিখিত আছে "দুর্গাপদে শ্রীলশ্রীযুত কাশীচন্দ্র যুবরাজ" বর্ত্তমান মহারাজের অভিষেকের পূর্ব্বে তিনি যে মোহর ব্যবহার করিতেন তাহাতে কেবল "শ্রীল-শ্রীযুত বীরচন্দ্র যুবরাজ" লিখিত আছে। বর্ত্তমান যুবরাজের



যে তাঁরে "রাধাকৃষ্ণ পদে শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর যুবরাজ" লিখিত আছে।

উপাধি ও রাজকর্ম্মচারী ঃ—ত্রিপুরারাজ্যবাসিদিগের ও রাজ-কর্ম্মচারিদিগের চারি প্রকার উপাধি দৃষ্ট হয়। ১—অনার্য্য উপাধি, ২—হিন্দু উপাধি, ৩—মুসলমানী উপাধি, ৪—ইংরেজি উপাধি।

চন্তাই, গালিম, পোয়াং, কপরা (কবর), বরুয়া, চাপিয়া, গাবুর, দইরা, মইরা ও সেলামবারী* প্রভৃতি উপাধিগুলি খাটি অনার্য্য জাতীয়।

বাঙ্গালি হিন্দুগণের সংসর্গে "নারায়ণ" উপাধি প্রচলিত হয়। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি রাজকর্ম্মচারী এবং মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ প্রাচীন কালে এই উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। আবুল ফজেল স্বীয় আইন আকবরী গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের সহিত সংশ্রবের পূর্ব্বে ত্রিপুরার শাসন কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, তাহা লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। মহারাজ (আদি) রত্নমাণিক্য মুসলমানদিগের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে সুবা, উজির, নাজির ও দেওয়ান এই চারিটি প্রধান পদ সৃষ্ট হয়।

সুবা ঃ—প্রধান সেনাপতি। রাজপরিবারস্থ ও রাজসম্পর্কিত

* দইরা, মইরা ও সেলামবারী, ইহারা ত্রিপুরাদিগের জাতীয় যন্ত্রবাদক।

ব্যক্তিগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হইত। প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিক রূপে সুবাদিগের নাম কিম্বা বংশাবলী সংগ্রহ করা দুরূহ। এক্ষণ যে সুবা বংশ বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল। * অধুনা ইঁহাদের সহিত সৈন্যবিভাগের কোন সম্পর্ক নাই।

উজির ঃ—সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ বা প্রধানমন্ত্রী। কৃষ্ণমাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই পদটি বাঙ্গালিদিগের একচাটিয়া ছিল। রত্নমাণিক্যের সময় যে তিন জন বাঙ্গালিকে তিনি গৌড় হইতে আনিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশ করা যাইবে। ইঁহাদের উত্তরপুরুষগণ ও তাঁহাদের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণই প্রায় উজিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বড় খাণ্ডব ঘোষ ও তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ ক্রমে ৫ পুরুষ "ওয়াদাদার" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। খাণ্ডবঘোষের ষষ্ঠ উত্তর পুরুষ প্রথমত উজিরী পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধারাবাহিক রূপে উজিরী, দেওয়ানী ও অন্যান্য প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল। † এই বংশাবলী তাম্রশাসন ও

---

* সুবা বংশাবলী। ১ যোগীরাম সুবা, ২ আছুমনী সুবা, ৩ ধনঞ্জয় সুবা, ৪ কালীকৃষ্ণ সুবা, ৫ জগমোহন সুবা, ৬ মহেশ চন্দ্র সুবা।

† খাণ্ডবঘোষের বংশাবলী। ১ বড় খাণ্ডবঘোষ ওয়াদাদার,

কাগজের সনন্দসমূহ দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ছত্রমাণিক্যের শাসনকালে সেন বংশীয় মধুসূদন বিশ্বাস উজির

২ তরণী ওয়াদাদার, ৩ নাগর ওয়াদাদার, ৪ শ্রীহরি ওয়াদাদার ৫ বনমালী ওয়াদাদার, ৬ প্রজাপতি উজির, ৭ দেবানন্দ শুভ-ঙ্কর, ৮ যাদবানন্দ উজির, ৯ পদ্মলোচন উজির, ইহার তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ ১০ কবিবল্লভ উজির, দ্বিতীয় কবিচন্দ্র বড়নারায়ণ সেনাপতি, ইনি মণিপুরীদিগের সহিত যুদ্ধে তথায় অবরুদ্ধ হন। তৃতীয় কবিরত্ন সেনাপতি, ইহার পুত্র মাধবচন্দ্র উজির ছিলেন। কবিবল্লভের পুত্র ১১ রাজছত্র নারায়ণ উজির, ১২ রামকান্ত বিশ্বাস, ১৩ অনন্তরাম উজির, ১৪ নরম বিশ্বাস, ১৫ বিশ্বাসনারায়ণ, (গোবিন্দ মাণিক্যের) উজির, ১৬ বাঞ্ছারাম দেওয়ান, ১৭ কমলনারায়ণ (ধর্ম্মমাণিক্যের) উজির, ইহার দুই পুত্র ১৮ বলরাম বিশ্বাস ও মায়ারাম বিশ্বাস। বলরামের দুই পুত্র ১৯ রামহরি ও রামদুলাল। রামহরি বিশ্বাস, রামগঙ্গা মাণিক্যের শাসন কালে বাঙ্গালি কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। ইহা যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে। রামহরির পুত্র ২০ দুর্গাশঙ্কর বিশ্বাস, ইহার একমাত্র কন্যা এক্ষণ জীবিত আছেন। রামদুলালের পুত্র শিবশঙ্কর, গৌরীশঙ্কর ও চন্দ্রনাথ বিশ্বাস। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ও ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সময় এই শিবশঙ্কর চাকলে রোসনাবাদের সর্ব্বপ্রধান তহশীলদার ছিলেন। গৌরীশঙ্করের পুত্র ২১ গগনচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস। এই গগনচন্দ্র খাস আপীল আদালতের পেস্কারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এইরূপ ধারাবাহিকরূপে ক্রমে ২১ পুরুষ অন্য কোন বাঙ্গালি ত্রিপুরার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন নাই।

ছিলেন। জয়মাণিক্যের সময় ঘোষ বংশের দৌহিত্র রামধন দত্ত উজির ছিলেন। তদ্ব্যতীত উদয়াদিত্যনারায়ণ, সত্রাজিত নারায়ণ ও উত্তরসিংহ প্রভৃতি উজিরগণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।

কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে তিনি স্বজাতীয় জয়দেবকে উজিরী পদ প্রদান করেন। ক্রমে তিনপুরুষ তাঁহার বংশধরগণ উজিরী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল। * কৃষ্ণজয় উজিরের লোকান্তরের পর মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য উজিরী পদ লোপ করেন। তদনন্তর ত্রিপুরার সর্ব্বকার্য্যাধ্যক্ষ "মোক্তার" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। বর্ত্তমান মহারাজ "উজির" বা "মোক্তারের" পরিবর্ত্তে "মন্ত্রী" বা "প্রধান মন্ত্রী" উপাধি সৃষ্টি করিয়াছেন। নাজির বংশধর দীনবন্ধু প্রথম এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ঠাকুর ধনঞ্জয় দ্বিতীয় মন্ত্রী, তৎপর যথা-

* কল্যাণ মাণিক্যের দৌহিত্র বংশে পীতাম্বর ও নীলাম্বর নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বরের পুত্র (১) জয়দেব প্রথম উজিরের পদ লাভ করেন। তাহার দুই পুত্র (২) দুর্গামণি উজির ও রাজমণি উজির। দুর্গামণির পুত্র (৩) কৃষ্ণজয় উজির, তৎপুত্র (৪) শিবজয় ঠাকুর, তাঁহার দুইপুত্র (৫) গোপী কৃষ্ণ ঠাকুর ও কিশোরীমোহন ঠাকুর। ইহারা উভয়েই বর্ত্তমান মহারাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। নীলাম্বরের পৌত্র মদনমোহন কিছুকাল উজিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

ক্রমে বাবু দীননাথ সেন, বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন এবং রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রীত্ব করিয়াগিয়াছেন।

নাজির ঃ—গবর্ণমেণ্টের পুলিস পদাতিগণের ন্যায় "বিনন্দীয়া" আখ্যা বিশিষ্ট ত্রিপুরাপতির এক প্রকার সৈন্য বা পেয়াদা ছিল। ইহাদের সরদার নাজির উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ এই নাজিরী পদ লাভ করিয়াছেন। শেষ নাজির বংশের বংশাবলী নিম্নে প্রকাশ করা গেল। *

দেওয়ান ঃ—এই পদটি বাঙ্গালিদিগের একচাটিয়া ছিল। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য জমিদারির দেওয়ানী পদে দুর্গাপুরের সিংহ বংশীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়া, পার্ব্বত্য রাজ্যের জন্য জনৈক স্বজাতীয় দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ক্রমে তিনপুরুষ ইঁহারা নাম মাত্র দেওয়ানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাজ্য ও জমিদারির উভয় দেওয়ানের পদ বাঙ্গালিগণ অধিকার করিয়াছেন। সিংহ বংশের পর যেসকল বাঙ্গালি জমিদারির দেওয়ানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রায় রামদুলাল নন্দী মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইনি শ্যামাবিসয়ক পদাবলী রচনা দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। মহারাজের স্বজাতীয় দেওয়ানগণের কার্য্যকালে "সেরেস্তাদার" উপাধিধারী কর্ম্ম-

* ১ অভিমন্যু নাজির, ২ জয়মঙ্গল নাজির, ৩ রাজমঙ্গল নাজির, ৪ জগদ্বন্ধু নাজির, ৫ দীনবন্ধু নাজির, ৬ কুমুদবন্ধু ঠাকুর।

চারিগণই প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব ও আয়ব্যয় বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দেওয়ানগণ সাক্ষীগোপাল স্বরূপ ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অধুনা কতক-গুলি বিচারআদালত সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে খাস-আপীল আদালত সর্ব্বপ্রধান। ইহার অধীনে জজ, মেজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি রহিয়াছেন। এই সকল বিচারকগণ রাজধানীতে থাকিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সোনা-মুড়া, বিলনীয়া ও কৈলাসহর সবডিবিসনে তিনজন ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট আছেন। তাঁহারা সেই সেই সবডিবিসনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সৈন্য বিভাগ পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। সুবার অধীনে হাজারী, জমাদার, দফাদার প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সৈন্য পরিচালন করিতেন। অধুনা ইংরেজ অনুকরণে কর্ণেল, কাপ্তান কুমেদান, (কমেণ্ডার) সুবাদার প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা সৈন্য বিভাগ পরিচালিত হইতেছে। ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। একশতাব্দী মধ্যে ত্রিপুরার সৈন্য চারি সহস্র হইতে ২৯৪ জনে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে মুসলমানদিগের অনুকরণে প্রত্যেক পরগণনায় এক একজন চৌধুরী নিযুক্ত করা হইত। * অধুনা

---

* নুরনগরের ধর চৌধুরী, ধলেশ্বরের দাস চৌধুরী,

ত্রিপুরেশ্বরগণ, তাঁহাদের পার্ব্বত্য রাজ্যে গ্রামে গ্রামে এক এক জন চৌধুরী নিযুক্ত করিতেছেন। প্রাচীন কালে হিন্দু নিয়মে সেনানায়কগণ "সেনাপতি" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। অধুনা সেই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা ত্রিপুরারাজ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

১৩০০ ত্রিপুরাব্দের (১৮৯০—৯১ খৃষ্টাব্দের) ত্রিপুরারাজ্যের আয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

বিশালগড়ের দেব চৌধুরী, লৌহগড়ের দাস চৌধুরী, মেহেরকুলের দেব চৌধুরী, বগাসাইরের কুণ্ড চৌধুরী; ইত্যাদি।

* ভূমির রাজস্ব … …	৫৭৭৮৮
ঘরচুক্তি (পার্ব্বত্য প্রজাদিগের কর)	৩২২২৩
বনকর (পর্ব্বতজাত দ্রব্যের শুল্ক)	১০২৬৮৬
ফেণীনদীর বনকর ঘাটের শুল্ক …	৭২৫৪
কার্পাস ও তিলের শুল্ক …	৬৯২৫৪
শালবৃক্ষ বিক্রয় …	৯৯৯৩
হস্তীর শুল্ক … …	৯৯৩৬
মহিষের ঘাসকর … …	৩৭৮২
খোট গারি … …	৪১০১
কাজাই মহাল … …	৯২৯
বাজারের কর … …	১৯৯৬
আদালতের আয় … …	৪২৪২
ষ্টাম্প ও কোর্টফি … …	৯৯৫৪
প্রসেশ ফি … …	৩৫৬১

ত্রিপুরারাজ্য হইতে অধুনা প্রায় চারিলক্ষ ও জমিদারী হইতে ছয় লক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১০ লক্ষ টাকা মহারাজ প্রাপ্ত হইতেছেন। অরণ্যজাত কাষ্ঠ, বাঁশ, বেত এবং জুমক্ষেত্র সমুৎপন্ন কার্পাস ও তিল ত্রিপুরারাজ্যের প্রধান পণ্য দ্রব্য। ইহার শুল্ক হইতে মহারাজ বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরেশ্বরের সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের তালুক ও ইজারা সমূহ দ্বারা ভূমির রাজস্বের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে। নচেৎ ইহার রাজস্ব আশাতীতরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে মহারাজের জমিদারীর শাসনকার্য্য দেওয়ান দ্বারা

খোয়ারের কর	২২০৯
আবকারী (মাদক দ্রব্যের শুল্ক)	৩৯৪৫
বিবিধ প্রকার নজর	৩১৫৩
ঘাসকর	৮৪০৬
আড্ডা মহাল	৫৩২০
রেজেষ্টরী বিভাগের আয় ...	২১৪৩
জেইলের আয়	২২৮৩
বিবিধ প্রকার	২১২৫
	৩৪৭২৮৩
জমিদারির আয়	৬০৩৬১৫
সর্ব্বশুদ্ধ	৯৫০৮৯৮

নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য প্রথমত ফরাসী এফ্ কোরজন সাহেবকে জমিদারীর মেনেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর জে. পি. ওয়াইজ, কেম্বল, স্মিৎ, লার্মেনী, সেন্‌স ও মেকমিন সাহেব চাকলে রোসনাবাদের মেনেজারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। উল্লিখিত ওয়াইজ সাহেব ঢাকার নামজাদা জমিদার ও নীলকুঠির অধিকারী ছিলেন। তিনি কদাচিৎ কুমিল্লায় পদার্পণ করিতেন। তাঁহার নিযুক্ত জনৈক এসিষ্টাণ্ট সাহেব তাঁহার পক্ষে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই সকল সাহেবগণ ধারাবাহিক রূপে নিযুক্ত হন নাই। কোন কোনসময় সাহেব মেনেজারের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালি দেওয়ান কিম্বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা জমিদারি শাসিত হইয়াছে।

ত্রিপুরায় বাঙ্গালাসাহিত্যঃ— প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরার রাজকার্য্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত হইতেছে। তদ্দারা সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ত্রিপুরাবাসী বাঙ্গালিগণ জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের আশ্রয় ও উৎসাহ দাতা ছিলেন।

রাজমালাঃ— ১৩২৯ শকাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস "রাজমালা" পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর দ্বারা রচিত হইয়াছিল। সেই রাজমালা অধুনা দুষ্প্রাপ্য। মহারাজ অমর মাণিক্যের শাসন কালে রাজমালা পরিবর্দ্ধিত

হইয়াছিল। ইহাই অধুনা প্রাচীন রাজমালা বলিয়া আখ্যাত এই প্রাচীন রাজমালা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য দেব ত্রৈপুর সন্ততি।
রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী॥
পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা।
তত্তঃপর নৃপচর্য্য না হইছে গাথা॥
অতএব কহি আমি শুন সেনাপতি।
পয়ারে লিখায় তুমি রাজমালা পুথী॥
শুন শুন বলি বল চতুর নারায়ণ।
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন॥
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান।
ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান॥
সভাসদ আছে যত ব্রাহ্মণ কুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি।
সেইমত দ্বিজগণ হয় মহামানী।
দুর্লভেন্দ্র নামে ছিল চন্তাই প্রধান।
পূর্ব্বকথা জানে সেই অতি সাবধান॥
রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ॥
সিংহাসনে একদিন বসিয়া নৃপতি।

বংশ কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ প্রতি ॥
শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর দুই দ্বিজবর।
চন্তাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥
নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন।
রাজাতে কহিল তিনে বংশের কথন ॥
রাজমালিকা * আর যোগিনী মালিকা।
বারুণ্য কালির্ণয় আর লক্ষণ মালিকা ॥
হরগৌরী সম্বাদ আছিল ভস্মাচলে।
নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতূহলে ॥
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজার নির্ণয়।
রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয় ॥

ইতি দ্রুহ্যু খণ্ড প্রথম অধ্যায়।

ত্রিপুরার প্রাচীন কবিদিগের কতকগুলি প্রিয় শব্দ ছিল, সেইগুলি তাহারা কোন রূপে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। রাজমালা গ্রন্থে "ভেদ দণ্ড সাম দান" নীতির বারংবার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরের পরবর্ত্তী কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী তাঁহাদের মহাভারতে বারংবার এই কয়টি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

* "রাজমালিকা" নামে বোধ হয় পূর্ব্বে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। তদনুসারে বাঙ্গালা গ্রন্থ রাজমালা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরেশ্বরদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রাচীন কবিগণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ লেখা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের আদেশানুসারে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ রচিত হইয়াছিল।

যে সময় এই সকল প্রাচীন পণ্ডিত ও কবিগণ পয়ারাদি ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় কায়স্থ কর্ম্মচারিগণ গদ্য রচনা দ্বারা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধনে রত ছিলেন। তাম্রশাসনগুলির ভাষা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সঙ্গীতের আলোচনা ঃ—প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা ও উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী। মহারাজ ধন্যমাণিক্য স্বীয় প্রজাবর্গকে গীত বাদ্য শিক্ষা প্রদান জন্য মিথিলা হইতে সংগীতাধ্যাপক আনয়ন করেন। তদবধি অবচ্ছিন্ন ভাবে ত্রিপুরায় সঙ্গীতের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। ত্রিপুরায় গীতি কবিতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, ইহা তাহারই ফল।

ত্রিপুর-রাজবংশাবলী

যযাতি

দ্রুহ্যু

১। ত্রিপুর
২ ত্রিলোচন
দৃকপতি কাছাড়ের অধিপতি। ৩ দক্ষিণ
৪ তয়দক্ষিন
৫ সুদক্ষিণ
৬ তরদক্ষিণ
৭ ধর্ম্মতর
৮ ধর্ম্মপাল
৯ সুধর্ম্ম
১০ তরবঙ্গ
১১ দেবাঙ্গ
১২ নরাঙ্গিত
১৩ ধর্ম্মাঙ্গদ
১৪ রুক্মাঙ্গক
১৫ সোমাঙ্গদ
১৬ নৌযুং রায়
১৭ তরজু রায়
১৮ তররাজ
১৯ হামরাজ
২০ বীররাজ
২১ শ্রীরাজ
২২ শ্রীমন্ত
২৩
২৪ ত
২৫ মাইলক্ষ্মী
২৬ নাগেশ্বর
২৭ যোগেশ্বর
২৮ ঈশ্বর ফা
২৯ রঙ্গথাই
৩০ ধনরাজ ফা
৩১ মুচুংফা
৩২ মাইচুংফা

৩৩ তওরাজ
|
৩৪ তরফানাই ফা
|
৩৫ সুমন্ত
|
৩৬ রূপবন্ত
|
৩৭ তরাহাম
|
৩৮ খাহাম
|
৩৯ কতর ফা
|
৪০ কালতরফা
|
৪১ চন্দ্রফা
|
৪২ গজেশ্বর
|
৪৩ বীররাজ
|
৪৪ নাগপতি
|
৪৫ শিক্ষরাজ
|
৪৬ দেবরাজ
|
৪৭ ধুরাসা
|
৪৮ তিররাজ
|
৪৯ সাগরফা

৫০ মলয়চন্দ্র
|
৫১ সূর্য্য রায়
|
৫২ হাতুং ফনাই

৫৩ চরাতর ৫৪ হাচুংফা
|
৫৫ বিমার
|
৫৬ কুমার
|
৫৭ শুকুরায়
|
৫৮ তছরাও
|
৫৯ রাজেশ্বর
|
৬০ মিসলিরাজ ৬১ তেজঙ্গফা বা তৈচুংফা
|
৬২ নরেন্দ্র
|
৬৩ ইন্দ্রকীর্ত্তি
|
৬৪ বিমান রাজ

৬৫ যশোরাজ
|
৬৬ নবাঙ্গ
|
৬৭ রাজগঙ্গা
|
৬৮ শুক্ররায়
|
৬৯ প্রতীত
|
৭০ মিরিছিম
|
৭১ গগণ
|
৭২ নাওরাই
|
৭৩ জুঝারুফা
|
৭৪ জাঙ্গে ফা
|
৭৫ দেবরায়
|
৭৬ শিবরায়
|
৭৭ ডুঙ্গুরফা
|
৭৮ থারুং ফা
|
৭৯ ছেঙ্গফনাই ৮০ ললিতরায়

৮১ মুকুন্দ ফা
|
৮২ কমল রায়
|
৮৩ কৃষ্ণদাস
|
৮৪ যশোফা
|
৮৫ মুচুংফা ৮৬ সাধুরায়

৮৭ প্রতাপ রায়
|
৮৮ বিষ্ণু প্রসাদ
|
৮৯ বাণেশ্বর
|
৯০ বীরবাহু
|
৯১ সম্রাট
|
৯২ চাম্পা
|
৯৩ মেঘ
|
৯৪ ছেংফাছাগ
|
৯৫ ছেংথুমফা
|
৯৬ আচঙ্গফা

৯৭ খিচুংফা
|
৯৮ ডুঙ্গুরফা
|
৯৯ রাজা ফা   ১০০ রত্নমাণিক্য
|
১০১ প্রতাপমাণিক্য   ১০২ মুকুটমাণিক্য
|
১০৩ মহামাণিক্য
|
১০৪ ধর্ম্ম মাণিক্য   গগণফা
|
১০৫ প্রতাপ মাণিক্য   ১০৬ ধন্য মাণিক্য   *
|
১০৭ ধ্বজ মাণিক্য   ১০৮ দেব মাণিক্য   *
|
১০৯ ইন্দ্রমাণিক্য   ১১০ বিজয় মাণিক্য   ১১৪ অমর মাণিক্য
|
১১১ অনন্তমাণিক্য   ১১৫ রাজধর মাণিক্য   *
|
১১২ সুবা গোপীপ্রসাদ উদয় মাণিক্য   ১১৬ যশোধর মাণিক্য   *
|
১১৩ জয়মাণিক্য   ১১৭ কল্যাণ মাণিক্য

রাজমালা।

দ্বিতীয় ভাগ।

রাজমালা।

প্রথম অধ্যায়।

চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর বংশে বলিনামে এক নরপতি ছিলেন। বলিরাজ-পত্নী মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। বলির ক্ষেত্রজ্ঞ পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই পূর্ব্ব ভারত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি প্রদেশের রাজ দণ্ড ধারণ করেন। স্থাপয়িতার নামানুসারে সেই সেই রাজ্য অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।

কামরূপের দক্ষিণ সীমা হইতে রাক্ষিয়াং(আরাকান)পর্য্যন্ত*

---

* বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক উইল্‌সন সাহেবের মতে ত্রিপুরা (ত্রিপুরা রাজ্য, জেলা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী) এবং আরাকান লইয়া সুহ্মদেশ গঠিত হইয়াছিল।

বিস্তৃত,ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের পূর্ব্বদিকস্থ-সমগ্র ভূমি প্রাচীনকালে সুহ্মনামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের সভা পর্ব্বে, পূর্ব্ব-দিগ্বিজয়ী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কর্ত্তৃক সুহ্ম দেশীয় নরপতির পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, "বিজয়ী ভীম মোদাগিরি (মুঙ্গের) হইতে পুণ্ড্রাধিপতি বাসু-দেবের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদনন্তর তিনি কৌশকি-কচ্ছ পতিকে জয় করত বঙ্গ দেশীয় নরপতি সমুদ্র সেন ও চন্দ্র সেন এবং তাম্রলিপ্ত ও কর্ব্বটাধিপতিকে বিজিত করিয়া, সুহ্মদেশাধিপতি ও সাগর তীরবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়া-ছিলেন।* দক্ষিণ দিগ্বিজয়ী সহদেবের বিজয় বৃত্তান্তে যে ত্রিপু-রার উল্লেখ আছে, তাহা আধুনিক ঝব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী পরিত্যক্ত নগরী "তিওর" বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।† প্রকৃত পক্ষে হৈহয় বংশীয়দিগের রাজধানী ত্রিপুরীকে ভারতের পূর্ব্ব

* সুহ্মানামাধিপশ্চৈব যে চ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।
সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়।

† হৈহয় বংশীয় নরপতিগণের বিবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপিতে তাঁহাদের রাজধানী "ত্রিপুরা" বা "ত্রিপুরী" আখ্যাদ্বারা পরিচিত হইয়াছে। এই ত্রৈপুর নরপতিগণ ১৭১ শকাব্দে (২৪৯ খৃষ্টাব্দে) যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা তাঁহাদের ক্ষোদিত লিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা অবধারণ করিতে যত্নবান হওয়া, নিতান্ত ভ্রমাত্মক কার্য্য। *

কবিচূড়ামণি কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যগ্রন্থে সুহ্ম-দেশকে মহাসাগরের "তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* ১২৮৯ বঙ্গাব্দে "জনৈক ঢাকা নিবাসী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সাময়িক সমালোচনার সমালোচন ও মীমাংসা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সহদেবের বিজয় বৃত্তান্ত হইতে—

ত্রৈপুরংস বশেকৃত্বা রাজানামমিতৌজসং।
নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরম্।

এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান ত্রিপুররাজবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার সত্যেরপ্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, এরূপ স্বার্থান্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎপরবর্ত্তী শ্লোকটী দৃষ্টি করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। কারণ মহাভারতে লিখিত আছে যে, "সহদেব ত্রৈপুররাজ ও পৌরবেশ্বরকে জয় করিয়া তৎপর সৌরাষ্ট্রাধিপতির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন।" সহদেব কিরূপে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা হইতে এক লম্ফে পশ্চিম সাগরের তিরস্থিত সৌরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন, ইহা গ্রন্থকারের স্থূল বুদ্ধির আয়ত্ত হইল না। বিশেষতঃ মহাভারতের সভাপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, "অর্জ্জুন উত্তরদিক, ভীম পূর্ব্বদিক, সহদেব দক্ষিণদিক এবং নকুল পশ্চিমদিক জয় করিলেন।" সহদেব যে পূর্ব্ব ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

প্রাচীন কালে সুহ্মদেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজ্য সমূহের ভৌগোলিকতত্ত্ব কিম্বা ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা নিতান্ত সুকঠিন। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দে "কমলাঙ্ক" আখ্যা দ্বারা পরিচিত ছিল। চীনপরিব্রাজক হিয়োন সঙ সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব্ব দক্ষিণদিকে কমলাঙ্ক রাজ্যের স্থিতি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালিদাসের ন্যায় তিনিও কমলাঙ্ককে সাগর তীরবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তৎকালে সাগর সঙ্গম জন্য নদরাজ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদকে ঝাপ্‌টার মোহনা অতিক্রম করিতে হয় নাই।

শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ পাটি-কাড়া নামক স্থানে "কমলাঙ্ক" রাজ্যের রাজধানী ছিল।

ব্রহ্মার ইতিহাস "মহারাজোয়াং" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৯৭৯ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ "থ্যানশিশা" সিংহাসন আরোহন করেন। তৎকালে পাটিকাড়ার জনৈক রাজকুমার ব্রহ্মরাজ্যে

বনপর্ব্বের ২৫৩ অধ্যায়ে কর্ণের দিগ্বিজয় উপলক্ষে যে ত্রিপুরার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে মধ্যভারতের অন্তর্গত জব্বল-পুরের নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ তাহাতে ত্রিপুরা ও কোশল দেশের কথা একি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহা বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, এই কোশল আধুনিক ছত্রিশগড়জেলা ও তৎসন্নিহিত স্থান লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

গমণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাজ খ্যানশিশা স্বীয়একমাত্র দুহিতা কে সেই রাজকুমারের করে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই বিবাহ প্রস্তাব পণ্ড করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। "কোলা" অর্থাৎ বিদেশী ব্রহ্মারাজ-দণ্ডের অধিকারী হইবেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বোধ হইল। মনুষ্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ। অমাত্যবর্গ যদিও পাটিকাড়ার রাজকুমারের সহিত ব্রহ্মরাজকুমারীর বিবাহপ্রস্তাব পণ্ড করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন তথাপি অল্পকালমধ্যে ইহা প্রচারিত হইল যে, সেই রাজপুত্রের সহযোগে ব্রহ্মরাজ কুমারীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। কালক্রমে সেই গর্ভে ভাবিব্রহ্মরাজ আলংশিশু জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু আলংশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার জনক আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। শৈশবেই আলংশিশু স্বীয় মাতামহ কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, এবং মাতামহের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন আরোহন পূর্ব্বক প্রবল বিক্রমে ৭৫ বৎসর ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। আলংশিশু রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক প্রথমেই পিতৃ-ভূমি সন্দর্শন জন্য পাটিকাড়ায় আগমন করিয়াছিলেন। আলংশিশু ও তাঁহার উত্তরবর্ত্তি পুরুষগণ ২০৬ বৎসর ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা পাটিকাড়া রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্বভাবরক্ষা করিতে যত্নবান ছিলেন।

১১৪১ শকাব্দের এক খণ্ড তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রণবঙ্কমল্ল নামক জনৈক নরপতি কমলাঙ্ক, পাটিকাড়া প্রভৃতিস্থানে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। "মহারাজোয়ং" গ্রন্থে যে পাটিকাড়া রাজবংশের উল্লেখ রহিয়াছে, আমাদের বিবেচনায় রণবঙ্কমল্ল সেই বংশীয় নরপতি। আধুনিক মেহেরকুল, পাটিকাড়া, গঙ্গামণ্ডল ও তৎসন্নিহিত পরগণাগুলি এই রাজবংশের শাসনাধীন ছিল।

কমলাঙ্ক বা পাটিকাড়া রাজ্যের পূর্ব্বদিকে রাঙ্গামাটীয়া নামে একটী রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত প্রদেশ যে কতগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন।

প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নরপতির সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। * ভুলুয়া নামক স্থানে সুরবংশীয় নরপতিগণ দীর্ঘ কাল রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ভুলুয়া রাজগণ ত্রিপুরেশ্বর দিগের সর্ব্ব প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিচিত হন।

রাঙ্গামাটীয়া রাজ্যের দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য

---

* রঙ্গপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানে প্রাচীন কালে ভবচন্দ্র নামে অন্য একজন নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ছিল। স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত বিলনীয়া উপবিভাগের মধ্যে বিবিধ স্থানে সেই রাজ্যাধিপতিগণের বাস ভবনের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চট্টগ্রাম প্রদেশে আর একটি স্বতন্ত্র হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১১৬৫ শকাব্দের এক খণ্ড তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দামোদরদেব নামক চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি তৎকালে চট্টগ্রাম শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন দেব, পিতামহের নাম পুরুষোত্তম দেব। তাম্রশাসনে দামোদর দেবকে "সকল ভূপতি চক্রবর্ত্তী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাঙ্গামাটীয়ার উত্তর দিকস্থ প্রদেশে কতগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু তরপ, শ্রীহট্ট লাউড়, প্রভৃতি স্থানে যে সকল রাজবংশ শাসন দণ্ড পরিচালন করিয়াছেন, তাঁহারা অপ্রাচীন নহেন।

বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তর প্রান্ত হইতে কিরূপে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া চট্টলাচল পর্য্যন্ত আপনাদের করতলস্থ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগে শ্যানবংশীয়গণ প্রবল বিক্রমে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই রাজ্য "পোয়াং" আখ্যায় আখ্যাত হইত। "মাগুয়াং" নগরী

পোয়াং রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শ্যানবংশের এক শাখা কামরূপের পূর্ব্বাংশে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের অধিপতিগণ "ফা" উপাধি ধারন করিতেন। পার্ব্বত্য মানব দিগের দ্বারা "ফা" বংশীয়গণ কামরূপ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ঠ নরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র আধুনিক নাগাপর্ব্বতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাই প্রাচীন কাছাড় বা কৃত্রিম হেরম্ব রাজ্য। দিমাপুর তাহার আদিম রাজধানী। সেই হৃতরাজ্য কামরূপপতির কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রজের ন্যায় আধুনিক কাছাড় প্রদেশের উত্তরাংশে দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা প্রাচীন "তৃপুরা" বা "ত্রীপুরা" রাজ্য। এই "তৃপুরা" বা "ত্রীপুরা" শব্দ হইতে আধুনিক ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি।

ক্রমে এই "তৃপুরা" রাজ্য প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। গুপ্তসম্রাট দিগের ভারত শাসন কালে তৃপুরা গণনীয় রাজ্য শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ সমুদ্র গুপ্তের লাট-প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশ পংক্তিতে লিখিত আছে যে, সমতট (বঙ্গ), কামরূপ, নেপালক, এবং তৃপুরা প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজ্যের অধিপতিগণ সমুদ্র গুপ্তকে কর দান করিয়া ছিলেন। সমতটও কামরূপের নিকটবর্ত্তি প্রতন্ত্যরাজ্য "তৃপুরা" আমাদের এই ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য হইতে পারে না। সমুদ্রগুপ্ত শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী

নরপতি; সুতরাং "তৃপুরা" তদপেক্ষা প্রাচীন নির্ণীত হইতেছে।

ভারতে এক্ষণ যে সকল রাজ্য বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে "তৃপুরা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মিবারের ভট্টকবিগণ যাহাই বলুন না কেন মিবার ও তৃপুরার ন্যায় প্রাচীন নহে। সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সেনাপতি ভট্টার্ক কণক সেনকে মিবার রাজবংশের আদি পিতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অথচ এই ভট্টার্ক সেনাপতির পিতামহের সময়ে যে "তৃপুরা" রাজ্য বর্ত্তমান ছিল, লাটপ্রস্তর লিপিই তাহার প্রমাণ।

প্রবাদ অনুসারে জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিমতীরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাই অধুনা "ত্রিপুরাব্দ" নামে পরিচিত। ১৮১৬ শকাব্দে, ১৩০৪ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। সুতরাং ৫১২ শকাব্দ হইতে ইহার গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

৬৯৯ শকাব্দে শ্যান রাজার ভ্রাতা শ্যামলুং মাগুয়াং নগরী হইতে দূত স্বরূপ ত্রিপুরায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি মিতাই ভূমির (আধুনিক মণিপুর) মধ্য দিয়া গমন করেন। যে মণিপুরী অর্থাৎ মিতাইগণ অধুনা বভ্রুবাহনের বংশধর (চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়) বলিয়া

আত্ম পরিচয় প্রদানে গৌরবান্বিত হইয়া থাকেন, রাজকুমার শ্যামলুং সেই মিতাইগণকে কুকি জাতির ন্যায় উলঙ্গ, নিতান্ত কদাচারী ও হীন-অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়াছিলেন।

ত্রিপুর বংশীয়গণ ক্রমে দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে উত্তর কাছাড় হইতে মধ্য কাছাড় এবং তথা হইতে দক্ষিণ কাছাড়ে, এবং সেই স্থান হইতে আধুনিক কৈলাসহর উপবিভাগের অন্তর্গত ফটীয়াথুলী, মাণিকচন্দন প্রভৃতি বিবিধ স্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত বিবিধ স্থানে ইঁহাদের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ক্রমে ত্রিপুর নরপতিগণ কৈলাসহরের নিকট-বর্ত্তী স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন সেই সকল বৃত্তান্ত যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৫। ৬ শতাব্দী পূর্ব্বে আদি কাছাড় অর্থাৎ দিমাপুরের জনৈক নরপতি ত্রিপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আধুনিক কাছাড় জেলার মধ্যভাগ যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। কাছাড় জেলার দক্ষিণাংশ অল্পকাল হইল ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বর হইতে কৌশল ক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। পেম্বার্টনের মানচিত্রই তাহার প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৌদ্ধ বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণগণ ভারতের দিগ্‌দিগন্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ভারতের যে সকল ক্ষত্রিয় নরপতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের অসীম আধিপত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ সেই সকল ক্ষত্রিয়বর্গকে ব্রাত্য শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া, আপনাদের আশ্রয়দাতা নরপতিবর্গকে চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় প্রচার করত তাঁহাদের শ্রেষ্টত্ব প্রতিপাদন মানসে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যে লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম সাধারণ তন্ত্র শাসন প্রণালী জগতে প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই ভারতের গৌরব—জগতের গৌরব—সূর্য্যবংশীয় লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের জাতক্রোধের অপূর্ব্বকাহিনী আমরা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি। * যে মল্ল ক্ষত্রিয়গণের বীরত্ব কাহিনী কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন,—ভগবান্ শাক্যসিংহের চিতাভস্ম লইয়া যে মল্ল ক্ষত্রিয়গণ সমস্ত ভারতে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য-বশিষ্ঠ গোত্রজ-বীর-

* মল্লিখিত "লিচ্ছবি রাজাগণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (ভারতী ১২৯৭ বঙ্গাব্দ)

কুলাগ্রগণ্য সেই মল্ল ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাত্য শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন। *

সেনাপতি ভট্টার্ক কণক সেন ও তাঁহার বংশধরগণ প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর বল্লভী দেশে অধীন ও স্বাধীন ভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। সেই রাজবংশের অনেক গুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সকল অনুশাসন পত্রে তাঁহারা সূর্য্যবংশজ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন নাই। রাজপুতনার ভট্টকবিগণ মিবার রাজবংশকে ভট্টার্ক সেনাপতির বংশধর প্রচার করত তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশ-তিলক ভগবান রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লবের বংশে উদ্ভূত বলিয়া দুন্দুভি নিনাদিত করিয়াছেন। রাজস্থানের ভট্ট কবিগণ এবম্প্রকার অন্যান্য রাজবংশকে ও সূর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা বলিয়া প্রচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু মূলবংশ সমূহের অংসখ্য প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া ভট্টকবিগণের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। রাজস্থানে যে রূপ সূর্য্যবংশের বাহুল্য প্রদর্শিত হইয়াছে, বাঙ্গালা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহে তদ্রূপ চন্দ্রবংশের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় নরপতিগণের অনুশাসন পত্রে তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশজ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বাঙ্গালার সেন

* মনু সংহিতা। দশম অধ্যায়, ২২ শ্লোক।

রাজগণও সোমবংশ সমুদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। চট্ট-গ্রামাধিপতি যে দামোদর দেবের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাম্রশাসনে তিনিও চন্দ্রবংশজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীহট্টাধিপতি গোবিন্দদেব ও ঈশান দেবের তাম্র ফলকে তাঁহাদিগকে "নিশাপতি"বংশজ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রিপুরা ও কাছাড় রাজবংশীয়গণ এক আদিপিতা হইতে উদ্ভূত হইয়াও একটি শাখা যযাতিপুত্র দ্রুহ্যের বংশধর ও অন্যটি ভীমপুত্র ঘটোৎকচের সন্তান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মিতাই অর্থাৎ মণিপুর রাজবংশ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করত শ্রীহট্টের অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের কৃপায় অর্জ্জুনপুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা-মগ নরপতিগণ অল্পকাল মধ্যে চট্ট-গ্রামের ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কৃপায় চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কেবল আসামের প্রাচীন "আহম" বংশীয়গণ ইন্দ্রবংশজ এবং কোচবিহার পতিগণ শিববংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশীয় নরপতিগণ সকলেই চন্দ্রবংশজ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

যে কারণে ব্রাহ্মণগণ রাজস্থানের প্রধান রাজবংশগুলিকে সূর্য্যবংশজ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই কারণের বশবর্ত্তী

হইয়াই ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ রাজমালা গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঃ—

চন্দ্রবংশাবতংশ মহারাজ যযাতি স্বীয় পুত্র যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, এবং অনুকে বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে সাম্রাজ্যাসন প্রদান করেন। মহাবল দ্রুহ্যু পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া হস্তিনানগর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করত কিরাত ভূমিতে † উপনীত হন এবং কতিপয় প্রধান কিরাত নরপতিকে জয় করিয়া "কোপল" নদীর তীরে ত্রিবেগ-নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তথায় রাজপাঠ সংস্থাপন করেন।

দ্রুহ্যের স্থাপিত রাজ্য-সীমা রাজমালায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বে মেখলিদেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে আচরঙ্গ নামক রাজ্য। ত্রিবেগ রাজ্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশদ্বারা রাজমালালেখক আমাদের মতের সত্যতা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে পোষণ করিতেছেন। কাছাড়বাসিগণ দ্বারা "মিতাই" অর্থাৎ মণিপুরিগণ ও তাহাদের বাসভূমি "মেখলি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই মেখলি দেশের পশ্চিমস্থ ত্রিবেগ রাজ্য আধুনিক কাছাড় ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে পারে না।

---

† বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাতদিগের বাস।

সেই দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর। * মতান্তরে দ্রুহ্যের বংশে দৈত্য নামক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই দৈত্যের ঔরসে ত্রিপুরের জন্ম। † তিনি কিরাত নামের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম "ত্রিপুরা" এবং স্বজাতীয় ব্যক্তি-বর্গকে ত্রিপুরাজাতি বলিয়া প্রচার করেন। আমাদের ঐতি-হাসিক দৃষ্টিতে ত্রিপুর হইতে বংশাবলী গণনা করা সঙ্গত।

---

* দ্রুহ্যরাজ সুতোজাত স্ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ।

সংস্কৃত রাজমালা।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের কৃত (১৮০৪ খৃষ্টাব্দের) বংশাবলীতে দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর লিখিত হইয়াছে। চক্রধ্বজ ঠাকুর বনামে বীরচন্দ্র যুবরাজ, ১৮৬৩ ইং ৯নং এবং রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ বনামে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, ১৮৭৪ ইং ৩৫নং দেওয়ানী মোকদ্দমায়, বিবাদী মহারাজ বাহাদুর স্ববংশের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতেও "ত্রিপুর পেছরে দ্রুহ্য" লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু জলতরঙ্গের কৃপায় রাজবংশের যে অভিনব বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দ্রুহ্য ও ত্রিপুরের মধ্যে কতগুলি কাল্পনিক নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। একেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস কল্পনা-জালে জড়িত, তাহার উপর আবার এরূপ ঘৃণিত কার্য্য নিতান্তই বিস্ময়জনক।

† যযাতি রাজার পুত্র দ্রুহ্য নাম যার।
তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্রবংশ সার॥
তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নামে ধর্ম্মে।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যযাতি, দ্রুহ্যুপ্রভৃতি নামগুলি বৌদ্ধদ্রোহি-ব্রাহ্মণদিগের কল্পনা প্রসূত। রাজমালা-লেখক বলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়কালে এই ত্রিপুর নরপতি সহদেবকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। ‡ এইরূপ বর্ণনা যে নিতান্ত কবিকল্পনা-প্রসূত তাহা বারংবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুর অতিশয় প্রজাপীড়ক নরপতি ছিলেন। তিনি "দেবদ্রোহী", "নিত্য-পরদার-রত" ও "পররাজ্যাপহারক" বলিয়া রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছেন। প্রজাগণ ত্রিপুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া শিবারাধনায় রত হইল। দেবাধিদেব আশুতোষ প্রজাগণের কাতরোক্তিতে সদয় হইয়া ত্রিশূলদ্বারা ত্রিপুরকে নিপাত করিলেন।

মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুর হত হইলে বিধবা রাজ্ঞী হীরাবতী সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্যের উত্তরাধিকারী নাই, ভবিষ্যতে কিরূপে ইহার শাসন সংরক্ষণ হইবে, এই চিন্তায় প্রজাগণ অধীর হইল। দৈবানুকম্পা ভিন্ন অন্য উপায় অদর্শনে তাহারা পুনর্ব্বার মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবাধিদেব আশুতোষ তাহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন। ভগবানের

‡ যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞার্থে সহদেবেন নির্জ্জিতঃ।
সংস্কৃত রাজমালা।

কৃপায়* বিধবা রাজ্ঞী গর্ভবতী হইয়াছিলেন। * তৎকালে তিনি উপযুক্ত পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন। † কালক্রমে বিধবা রাজ্ঞী শিবাংশ সম্ভূত—সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত, চন্দ্র, শূল ও ধ্বজচিহ্ন বিশিষ্ট এক মনোরম পুত্র প্রসব করেন। এই শিশু যৎকালে ভূমিষ্ঠ হন, তৎকালে তাঁহার ললাটে একটী নেত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, এজন্য তিনি ত্রিলোচন আখ্যা প্রাপ্ত হন। দশম বর্ষ বয়ক্রমে ত্রিলোচন সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার মাতা যে চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনি সেই চতুর্দ্দশ দেবতার মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎপূজা পদ্ধতি প্রচলিত করেন। ইঁহারাই ত্রিপুর রাজবংশের আদি-কুলদেবতা। সেই আদিম পুরোহিত "চন্তাই" দ্বারা অদ্যাপি সেই চতুর্দ্দশ দেবমুণ্ডের পূজা হইতেছে।

* শিবলিঙ্গ নত্বা ধ্যানাৎ সাবভূব সুগর্ভিনী।

সংস্কৃত রাজমালা।

† শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমলাং তথা।
ভারতীঞ্চ কুবেরঞ্চ গণেশং বেধসং তথা।
ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা।
হুতাশঞ্চ নগেশঞ্চ দেবতাস্তাঃ শুভাবহাঃ।

সংস্কৃত রাজমালা।

মতান্তরে:—
হারোমো হরিমা বাণী কুমারোগণকো বিধিঃ।
থাব্ধি*গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশাঃ।

ইহার সহিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পূজা বিধির কোনরূপ সংস্রব নাই।

দ্বাদশবর্ষবয়োক্রমকালে মহারাজ ত্রিলোচন কাছাড়াধিপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই রাজ্ঞীর গর্ভে ত্রিলোচনের দ্বাদশটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্রের নাম দৃক্‌পতি, দক্ষিণ, দক্ষ, দ্রুমায়ু, দ্রবিণ, দৃষ্টঘ্নো, ভৃগু, দুর্দ্ধর, দ্রুহ, তুম্বায়ু, দৈবিরি, এবং দম্প। রাজকুমারগণ সকলেই নাতিদীর্ঘ নাসিকা, স্থূল কলেবর, সুন্দরকর্ণ, বিশালবক্ষ, সুচন্দ্রবদন, রক্তপঙ্কজলোচন, গজ-গ্রীবা ও শালতরু সদৃশ হস্তপদবিশিষ্ট ছিলেন। মহারাজ ত্রিলোচন ১২০ বৎসর প্রবল পরাক্রমে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃক্‌পতি তাঁহার অপুত্রক মাতামহ কর্ত্তৃক তদীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কাছাড়পতির মৃত্যুর পর দৃক্‌পতি সেই রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। ত্রিলোচন স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে দক্ষিণ পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। দৃক্‌পতি পিতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষিণকে পৈত্রিক আসন পরিত্যাগ করিতে লিখিলেন। তদুত্তরে দক্ষিণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিলেন,

"মাতামহ আপনাকে পুত্রিকা, পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পৈত্রিক রাজ্যে আপনার অধিকার নাই; বিশেষতঃ ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গীয় পিতা মহারাজ আমাকে পৈত্রিক রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমিই তাহার অধিকারী।" দক্ষিণের পত্রপ্রাপ্ত হইয়া দৃকপতি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ৭ দিবস ঘোরতর সংগ্রামের পর দৃকপতি জয়লাভ করত পৈত্রিক রাজধানী অধিকার করিলেন। মহারাজ দক্ষিণ মধ্যকাছাড়ে উপনীত হইয়া, বড়বক্র নদীতীরে এক অভিনব রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ অনুসারে মহারাজ দক্ষিণ ত্রিবেগ হইতে পলায়ন কালে চতুর্দ্দশ দেবতার মুণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি দক্ষিণের সন্তানগণ সেই চতুর্দ্দশ দেবমুণ্ডের পূজা করিয়া আসিতেছেন। দৃকপতির বংশধরগণ দীর্ঘকাল সেই ছিন্নশীর্ষ চতুর্দ্দশ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন। ত্রিবেগনগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মহারাজ দক্ষিণের বড়বক্র নদীতীরে রাজ পাটসংস্থাপন দ্বারা, ত্রিপুরবংশীয় দিগের দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত হইল।

দক্ষিণের মৃত্যুরপর তৎপুত্র তয়দক্ষিণ সিংহাসন আরোহণ করেন। তয়দক্ষিণ হইতে নাগপতি পর্য্যন্ত ৪১ জন রাজার শাসন কালের কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা রাজমালায় প্রাপ্ত

হওয়া যায় না। নাগপতির পুত্র শিক্ষরাজ নরমাংস ভোজন করিয়াছিলেন। *

মহারাজ বিমারের † পুত্র কুমার ধার্ম্মিক ও শিবভক্তি-পরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি মনুনদীতীরস্থিত শ্যামল নগরে গমনপূর্ব্বক শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। ‡ তিনি

---

* তস্যপুত্র শিক্ষরাজ নরমাংস খায়।

সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

নাগপতেঃ সুতাজাত শিক্ষরাজ ইতিরিতঃ। স একদাবনং যাতোমৃগায়ার্থং মহীপতিঃ। বহুকালং বনে ভ্রান্ত্বা মৃগংন প্রাপ্তবান্ নৃপঃ। অতি শ্রান্ত স্ততোরাজা নিজ মন্দিরমগমৎ। ততঃ ক্ষুধার্ত্তো নৃপতি র্মাংস পাকার্থ মুক্তবান্। মৃগমাংসম্ নাবা প্রাপ্য বিহ্বলঃ পাচক স্তদা। অষ্টম্যাং দেবদত্তস্য নরস্য মাংস মানয়ৎ। তন্মাংসমতি সৎপক্বং ভোজয়া মাস ভূমিপং। শিক্ষরাজস্ততভুক্তা সন্তুষ্টঃ প্রাহ পাচকং। ঈদৃশং সুরসং মাংসং কুতস্ত্বংসমুপেতবান্। পাচকস্তু ততঃ প্রাহ ভূমিপং সুভয়াতুরঃ। দেবদত্ত নরস্যৈতন্মাংসং ভোজিতং মায়া। ইতিশ্রুত্বা ততোরাজা কম্পান্বিত কলেবরঃ। হরেত্রাহি হরেত্রাহি বিমৃস্যান্তি পুনঃ পুনঃ। মহাবৈরাগ্য মাস্থায় বনবাস মুপাশ্রিতঃ। সংস্কৃত রাজমালা।

† রাজমালায় ইঁহার নাম বিমার, কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের কৃত পূর্ব্বোক্ত বংশাবলীতে এই নরপতির নাম "প্রমার" লিখিত হইয়াছে।

‡ এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে যে, "পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ। অত্রৈব বিরলে

সেই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আজীবন শিবারাধনা করিয়াছিলেন। রাজমালার উক্ত বর্ণনা দ্বারা ত্রিপুরবংশীয় দিগের আর এক পদ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহারাজ ত্রিলোচনের পুত্র দক্ষিণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বারা তাড়িত হইয়া, কোপল নদীর তীরস্থিত ত্রিবেগ নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়বক্র (বড়াক) নদীর তটে রাজপাট স্থাপন করেন। মহারাজ কুমার সেই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনুনদী তীরস্থিত শ্যামলনগরে উপনীত হইয়াছিলেম।

মহারাজ রাজেশ্বরের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মিসলিরাজ কনিষ্ঠ তেজাঙ্গ ফা। পিতার মৃত্যুর পর মিশলিরাজ সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজমালা বলেন, মিশলিরাজের প্রকৃত

স্থানে মনুনাম নদী তটে। গুপ্তভাবেন দেবেশঃ কিরাতনগরে বসৎ। একাকিরাতিনী তত্র স্থিতা পরম সুন্দরী। রূপ যৌবন সম্পন্না নিত্যং শিবমপূজয়ৎ। ততঃ প্রত্যক্ষ মেবাসৌ দেবদেব স্তদালয়ং। গত্বা কিরাতিনীংতাঞ্চ বুভুজে সুচিরং শিবঃ। ইতিশ্রুত্বা জগন্মাতা পার্ব্বতী বহুকোপিতা। কেশেষ্যাকৃষ্য সংতাড্য সংজহার কিরাতিনীং। ততোতি লজ্জিতঃ শম্ভুঃ শিব লিঙ্গ মুপাবিশৎ।", এস্থলে রাজমালা লেখক আমাদিগকে কোচবিহার রাজবংশের আদি মাতা হীরার কাহিনী স্মরণ করিয়া দিতেছেন।

যোগিনীতন্ত্র। ত্রয়োদশ পটল দ্রষ্টব্য।

নাম ক্রোধেশ্বর। ইনি অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ ছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমার পুত্র হইবে না।" মহাদেবের বাক্য শ্রবণে রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে মহাদেবকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। মহাদেবের ক্রোধ দৃষ্টিতে রাজা তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইলেন। রাজ-পুরোহিত চন্তাই রাজার চক্ষু প্রদান জন্য মহাদেবের আরাধনা করিলেন। চন্তাইর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া আশুতোষ বলিলেন "নরবলি দ্বারা আমার পূজা করিলে, রাজা পুনর্ব্বার দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু স্ত্রী সহবাসকালে তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমি আর সাক্ষাৎ দর্শন দিবনা। এই মন্দিরে আমার পদচিহ্ন মাত্র থাকিবে।" নরবলি দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া মিশলিরাজ দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি স্বীয়পত্নী সন্দর্শনে কামোন্মত্ত হইয়া রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। মহাদেবের অভিসম্পাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ মহারাজ তেজাঙ্গ ফা সিংহাসন আরোহণ করেন।

শুক্ররায়ের পুত্র মহারাজ প্রতীতের শাসনকালে বড়বক্র-নদী কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যসীমা নির্ণীত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কাছাড়পতিগণ যে রূপ দিমাপুর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, ত্রিপুরা-

পতিগণও সেইরূপ দক্ষিণদিকে আপনাদের রাজ্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। এই সময় মনু নদীর নিকটবর্ত্তি স্থানে ত্রিপুরার রাজপাট সংস্থাপিত ছিল। তদনন্তর তাহা কৈলাড় গড়ে উঠিয়া আইসে। প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসে কৈলাড় গড় "জাজীনগর" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। কৈলাড় গড়ের উপকণ্ঠস্থ একখানি পল্লী অদ্যাপি জাজীশার নামে পরিচিত রহিয়াছে।

নওরায়ের পুত্র জুঝারু ফা যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তিনি বিশালগড় নামক স্থানে একটি রাজ-ভবন নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার শাসনকালে লিক (বা নিক্ষ) নামক নরপতি রাঙ্গামাটীয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। জুঝারুফা তাঁহাকে জয় করিয়া রাঙ্গামাটীয়া নগরীতে ত্রিপুরার রাজপাট সংস্থাপন করেন।

মহারাজ ছেংথুমফা বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি মিহিরকুল * (প্রাচীন কমলাঙ্ক বা পাটী-কাড়া রাজ্য) জয় করিয়া মেঘনাদ তীর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরেশ্বরের অধিকার মধ্যে "হিরাবন্ত" নামক জনৈক ধনবান্

* মিহিরকুল হইতে মেহেরকুল নামের উৎপত্তি।
"তানপুত্র ছেংথুম রাজা মেহেরকুল জিনে।"
সংক্ষিপ্ত রাজমালা।

সামন্ত বাস করিতেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী ও বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। "হিরাবন্ত" ত্রিপুররাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য মহারাজ ছেংথুমফা বৃহৎ একদল সৈন্য সহ তিন জন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ গঙ্গা তীরে উপনীত হইলে, "হিরাবন্ত" ভয়াতুর হইয়া গৌড়েশ্বরের আশ্রয়গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপতি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বৃহৎ এক দল সৈন্য ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গৌড়সৈন্যগণ ত্রিপুররাজ্যসীমায় উপনীত হইলে মহারাজ ছেংথুমফা স্বীয় সৈন্যাপেক্ষা বিপক্ষের সৈন্য অধিক বিবেচনায় ভয়াতুর হইয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র গমনে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহার রাজ্ঞী স্বামীকে রণ-পরাঙ্‌মুখ দর্শনে স্বয়ং সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, " সাহসাশ্রয়তে লক্ষ্মী " আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষ বিনাশে কুলগৌরব রক্ষা করিব; তোমরা প্রস্তুত হও।" রাজ্ঞী তৎপর দিবস যুদ্ধে গমন করিবেন বলিয়া সৈন্যগণকে বহু সংখ্যক মহিষ এবং ছাগ দ্বারা ভোজ দানে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পর দিবস প্রত্যুষে রণসজ্জা করা হইল, ত্রিপুরেশ্বরী হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। মহারাজও বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভীষণ সংগ্রামে রণক্ষেত্রে মহারক্ত স্রোত প্রবাহিত করিয়া, ত্রিপুরেশ্বরী বিজয়ী মালায় বিভূষিতা হইলেন। ভারতীয় মহিলাকুল মধ্যে এরূপ

দৃষ্টান্ত অতি বিরল। গড়মণ্ডলের অধিশ্বরী দুর্গাবতী এবং ঝান্সীর রাজ্ঞী লক্ষ্মীবাই ভীষণ সমরে স্বস্ব প্রাণ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করত বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু বিজয় লক্ষ্মীর সাহচর্য্য তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, বিজয়ী পতাকা তাঁহাদের শীর্ষে উড্ডীন হয় নাই। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, রাজমালা লেখক বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া এহেন রমণী-রত্নের নাম স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

যুদ্ধাবসানে মহারাজ ছেংথুমফা রণক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া হতাহত জীবগণ দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সংগ্রামে মহারাজ ছেংথুমফার জামাতা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্য মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। তদবধি রাজ-জামাতৃগণের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রথা, ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাল অথবা সেনরাজাগণের বাঙ্গালা শাসনকালে, কিম্বা মুসলমানদিগের লক্ষ্মণাবতী অধিকারের পরে উল্লেখিত যুদ্ধঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ১১৬৫ শকাব্দে (১২৩৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতীর "মালিক" (শাসনকর্ত্তা) ইজাজদ্দিন আবুল ফতে তুগ্রল তুগন খাঁ আজনগর আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কোন কোন

ইতিহাস-লেখক এই জাজনগরকে ত্রিপুরা নির্ণয় করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে তুগন খাঁ ছেংথুমফার মহিষী দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া লেখা যাইতে পারে। মতান্তরে তুগন খাঁ যে জাজনগর আক্রমণ করেন তাহা উড়িষ্যার রাজধানী যাজপুর লিখিত হইয়াছে। মেজর ষ্টুয়ার্ট উড়িষ্যাপতিকে তুগনখাঁর পরাজয়কারী বলিয়া লিখিয়াছেন। * খ্যাতনামা হণ্টার সাহেব ষ্টুয়ার্টের মতানুসরণ করিয়াছেন। † আমাদের বিবেচনায় ষ্টুয়ার্ট ও হণ্টার সাহেবের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। ‡

---

* Stewart's History of Bengal. pp. 38, 39.

† Hunter's Orissa. Vol. II. p. 4.

‡ মল্লিখিত "জাজনগর রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উৎকলাধিপতি বীরচূড়ামণি নরসিংহদেব, (যিনি উড়িষ্যার ইতিহাসে লাঙ্গুলীয়া নরসিংহ নামে পরিচিত,) বারংবার তুগন খাঁকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্মণাবতী (গৌড়নগরী) অধিকার ও লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করেন। (ভারতী সপ্তম ভাগ; ১২, ১৩, পৃষ্ঠা।) উড়িষ্যাই হউক, আর ত্রিপুরাই হউক, জাজনগর-পতিদ্বারা তুগন খাঁ নিঃসন্দেহে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয়-পক্ষপাতান্ধ ফেরেস্তা পবিত্র ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া গৌড় বিজেতাকে চঙ্গিস খাঁ লিখিয়াছেন। হিন্দুরহস্তে মুসলমানের এরূপ লাঞ্ছনা বর্ণনা করিতে মুসলমান লেখক নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন।৮

মহারাজ ছেংথুমফার শাসনকালে কিম্বা তাহার অল্পকাল পরে চট্টলাচলে ত্রিপুর-রাজপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

মহারাজ ছেংথুমফা পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র আচঙ্গফা সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মাতৃগুণ লাভ না করিয়া পিতৃগুণ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী স্বীয় শ্বশ্রুর ন্যায় তেজস্বিনী, বিদ্যাবতী এবং গুণসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে ত্রিপুরাতে শিল্পকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মহারাজ আচঙ্গফা পরলোক গমন করিলে তাঁহার একমাত্র পুত্র খিচুংফা রাজদণ্ড ধারণ করেন। তদনন্তর তৎপুত্র ডুঙ্গুরফা রাজ্যাধিকারী হইলেন। তিনি অষ্টোত্তর-শত-দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি পুত্রগণের বুদ্ধি পরীক্ষা দ্বারা ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারিত্ব স্থির করন মানসে যুদ্ধের কুক্কুটসকল নিরাহারে আবদ্ধ রাখিতে ভৃত্যদিগকে অনুমতি করেন; পরে যখন স্বয়ং পুত্রগণের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিলেন, তখন একজন অনুচরকে ঐ সকল কুক্কুট আহার স্থলে আনিয়া ছাড়িয়া দিতে গোপনে আদেশ করিলেন। তদনুসারে যখন ৩০টী কুক্কুট ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা সমস্ত দিন নিরাহারের পর ভোজ্যদর্শনে রাজকীয় পাত্রের দিকে ধাবিত হইল; মহারাজ কুক্কুট সকল যাহাতে পাত্র স্পর্শ করিতে না পারে, তদুপায় বিধান জন্ত কুমারগণকে আদেশ

করিলেন; কিন্তু কুমারেরা সমস্ত কুক্কুট একেবারে নিবারণের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তৎকালে সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার রত্নফা সহসা পাত্র হইতে কতকগুলি অন্ন লইয়া কুক্কুটগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। * নৃপতি তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রগণ নিতান্ত দুঃখিত ও ঈর্ষাপরবশ হইয়া নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, এবং মহারাজ ডুঙ্গুরফা পরলোক গমন করিলে সমস্ত কুমারেরা একত্রিত হইয়া রত্নফাকে বহিস্কৃত করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠকুমার রাজাফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সম্ভবতঃ ১১২১ শকাব্দে (৫৯৪-৯৫ হিং সালে) অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ মহম্মদ বখ্তিয়ার খিল্জী নামক জনৈক জায়গীরদার নবদ্বীপ অধিকার করেন। মহারাজ বল্লালসেন দেবের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব তৎকালে

* সংস্কৃত রাজমালা লেখক বলেন যে, ভীমএকাদশীর পারণের সময়ে ঘটনাক্রমে এইরূপ হইয়াছিল। মহারাজ ডুঙ্গরফা ইচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ করেন নাই।

বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতেছিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিলে তিনি খিড়কীর দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া বঙ্গের রাজধানী সমতট (রামপাল) নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ লুণ্ঠন পূর্ব্বক লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরে গমন করত তথায় রাজপাট সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের পূর্ব্বে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তাগণ "মালিক" উপাধি দ্বারা পরিচিত হইতেন।

দিল্লীর পাঠান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের, তাতার জাতীয় জনৈক সাহসিক কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান ক্রীতদাস ছিল। তাঁহার নাম তুগ্রল। লক্ষণাবতীর মালিক তাতার খাঁ ৬৭৬হিং সালে (১১৯৯ শকাব্দে) পরলোক গমন করিলে সুলতান বলবন সেই ক্রীতদাস তুগ্রলকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তুগ্রল লক্ষ্মণাবতীর মালিকের পদ গ্রহণ করিয়া প্রবল-বিক্রমে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন।

কুমার রত্নফা পৈত্রিক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে উপনীত হইলেন। মালিক তুগ্রল তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কুমার রত্নফা কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে তুগ্রল ত্রিপুর রাজকুমারের সাহায্যার্থ বৃহৎ একদল সেনা প্রদান করেন। রত্নফা সেই সেনাদলের সহিত ত্রিপুরায়

উপনীত হইলে দেশস্থ প্রাচীন সুহৃদবর্গ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ভীষণ সংগ্রামে মহারাজ রাজাফা ও তাহার অনুজগণ হত হইলেন। ৬৯২ ত্রিপুরাব্দে (১২০১ শকাব্দে) ভ্রাতৃরুধিরে বিজয়ী পতাকা অনুরঞ্জিত করিয়া মহারাজ রত্নফা ত্রিপুর সিংহাসন আরোহণ করেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ ইহাকেই তুগ্রল কর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* মহারাজ রত্নফা মৃগয়া উপলক্ষে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করত একটি অত্যুজ্জ্বল "ভেক মণি" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন†। তিনি সেই ভেকমণি ও একশত হস্তী তুগ্রলকে

* In the year 678, (1279 A. D.) he assembled a very numerous army, and invaded the country of Jagenagur (Tipperah). After having defeated the Raja in a general engagement, he plundered the inhabitants, and brought away with him immense wealth and one hundred elephants.

Stewart's History of Bengal. p. 44.

† "সমসরগাজি নামা" পুস্তকে এই ভেকমণির এক আশ্চর্য্য ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তাহা নিতান্ত অলৌকিক বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা হইল না। প্রবাদ অনুসারে কৈলাসহর উপবিভাগের অন্তর্গত "মাণিক ভাণ্ডার" নামক স্থানে এই মণি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

উপঢৌকন প্রদান করেন। তুগ্রল তখন দিল্লীশ্বরের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক "সুলতান মোঘিসউদ্দিন তুগ্রল" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ রত্নফা কর্ত্তৃক উজ্জ্বল মণি উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করিলেন। মহারাজ রত্নফা "মহারাজ রত্ন মাণিক্য" বলিয়া আখ্যাত হইলেন। * প্রাচীন "ফা" উপাধি পরিত্যক্ত হইল। অদ্যাবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ ফার পরিবর্ত্তে সেই "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপুত্র ও রাজ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ "ফা" উপাধি গ্রহণ করিতেন।

মহারাজ রত্ন মাণিক্যের সময়েই মুসলমানদিগের সহিত সংশ্রব আরম্ভ হয়, এজন্য পার্শি ও বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ আবশ্যক হইয়াছিল। রত্ন মাণিক্য যৎকালে লক্ষ্মণাবতী নগরে অবস্থান করেন তৎকালে তিনজন বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার দুইজন লিপি-ব্যবসায়ী-কায়স্থ, অন্য ব্যক্তি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। কায়স্থদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ়ী ঘোষবংশজাত,

* মহারাজ রাম মাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্য (দ্বিতীয়) হইতে পৃথক রাখিবার জন্য ইঁহাকে "আদি রত্নমাণিক্য" আখ্যায় পরিচিত করা হইয়া থাকে।

তাঁহার নাম বড় খাণ্ডব ঘোষ;* দ্বিতীয় ব্যক্তি "রাজ"বংশজাত তাঁহার নাম পণ্ডিতরাজ। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ধন্বন্তরি গোত্রজ সেন বংশীয়, তাহার নাম জয়নারায়ণ সেন। †

মহারাজ রত্ন মাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়া এই তিন ব্যক্তিকে স্ব রাজ্যে আনয়ন করেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দ্বারা পুরুষানুক্রমে প্রতিপালন করিবেন বলিয়া, জায়গীর, নিষ্কর ও বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক এই অনার্য্য প্লাবিত অরণ্যময় দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আধুনিক সরাইল পরগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে উপনিবিষ্ট হন। কিছুকাল

* বড় খাণ্ডব ঘোষের নিবাস স্থান রাঢ়দেশান্তর্গত রাঙ্গামাটী। এই রাঙ্গামাটী মুর্শিদাবাদের দ্বাদশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার অন্য নাম "কর্ণশোণা," বা "কর্ণসেন পুরী।" প্রবাদ অনুসারে প্রাচীনকালে কর্ণসেন নামক নরপতি এইস্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞবর ফারগুসন সাহেব ইহাকে হিয়োন সাঙের লিখিত "কিরণস্বুবর্ণ" নগরী নির্ণয় করিয়াছেন। কাপ্তান লেয়ার্ড রাঙ্গামাটীয়ার পুরাতত্ত্বমূলক একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এসিয়াটীক সুসাইটির জর্ণেলে প্রকাশ করিয়াছেন, (J. A. S. Bengal. Vol. XXII. pp 281, 282.) প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালে রাঙ্গামাটী একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী ছিল।

† মতান্তরে জয়নারায়ণ সেন, খাণ্ডব ঘোষের অধীনস্থ "পাত্র" অর্থাৎ পেস্কার ছিলেন।

অন্তে তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী কৈলার গড়ে বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। তদনন্তর ত্রিপুরেশ্বরদিগের রাজধানী পরিবর্ত্তনের সহিত ঘোষ, রাজ ও সেনের বংশধরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অদ্যাপি ত্রিপুরেশ্বর দিগের অধিকারভুক্ত স্থানে বাস করিতেছেন।

বড় খাণ্ডব ঘোষ ও রাজবংশীয় পণ্ডিতরাজ দ্বারা মহারাজ রত্নমাণিক্য মুসলমানদিগের অনুকরণে শাসন প্রণালী ও "সেরেস্তা" গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরেশ্বরের অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া "বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হন।- উত্তর কালে জয়নারায়ণ সেনের বংশধরগণ চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকার্য্যে প্রবেশ করত বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে তীষ্ণা পরগণার অন্তর্গত বাতিসা নিবাসী "বৈদ্যগণ" ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া রাজ চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন। ফলতঃ আদি রত্নমাণিক্যের শাসনকাল হইতে কৃষ্ণমাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাবধি ঘোষ, রাজ, ও সেন বংশীয় "বিশ্বাসগণ" একচেটিয়াভাবে সুদীর্ঘকাল ত্রিপুরার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। উজির, দেওয়ান ও সেনাপতির পদ হইতে সামান্য লেখকের (মোহরের) কার্য্য উল্লিখিত তিন বংশের বংশধরদিগের একচেটিয়া ছিল। কদাচিৎ তাঁহাদের বিশেষ সম্পর্কিত (জামাতা, ভাগিনেয়, দৌহিত্র) রাজকার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়া "বিশ্বাস" উপাধি

প্রাপ্ত হইতেন. কিন্তু তাঁহারা "উপবিশ্বাস" আখ্যা দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। *

প্রবাদ অনুসারে মহারাজ রত্নমাণিক্যের শাসনকালে এক দল ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ দিগকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক রাজকীয় পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন।† সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণ অধুনা পার্ব্বত্য ত্রিপুরাদিগকে যাজন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

উল্লিখিত রাজ পুরোহিতগণ ব্যতীত এই সময়ে আরও কতকগুলি ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হন। তাহারা ঘোষ, রাজ ও সেন বংশীয়দিগের সংশ্রবে এদেশে আগমন করেন। বড় খাণ্ডব ঘোষের যে বংশাবলী তাঁহার উত্তর পুরুষগণ নিকটে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত ঘোষ

* বিশ্বাস ও উপবিশ্বাসে প্রভেদ এই যে. ঘোষ, রাজ ও সেন বংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস উপাধি ধারণ পূর্ব্বক রাজকীয়বৃত্তি সকল ভোগ করিতেন। উপবিশ্বাসের মৃত্যুর সহিত তাঁহার সমস্ত বৃত্তি ও অধিকার বিলুপ্ত হইত।

† তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি তলাবায়েক এবং কালীয়াজুরি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

মহাশয়ের সহিত তাঁহার গুরু জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী ও পুরোহিত (সাবর্ণ গোত্রজ) তরণি মিশ্র আগমন করিয়াছিলেন। * প্রকৃতপক্ষে রত্নমাণিক্যের শাসনকালে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের ত্রিপুরায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার পন্থা বিশেষ রূপে পরিস্কৃত হইয়াছিল।

মহারাজ রত্নমাণিক্য প্রবল পরাক্রমের সহিত দীর্ঘকাল রাজত্বের পর দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া মানবলীলাসংবরণ করেন।

রত্নমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য শাসনকালে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশ (সমতট) মুসলমানদিগের কুক্ষিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। (১৩২৩ খৃষ্টাব্দ)। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ সমতট নগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুবর্ণগ্রামে রাজপাট সংস্থাপন করেন।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মালিক ফকিরদ্দিন "সুলতান সেকেন্দর" আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালায় স্বাধীনতাপতাকা উড্ডীন করেন। সুবর্ণগ্রামে তাঁহার রাজ-সিংহাসন সংস্থাপিত ছিল। সুতরাং তথা হইতে ত্রিপুরা আক্রমণ ও লুণ্ঠন মুসলমানদিগের পক্ষে

* তরণিমিশ্রের বংশধরগণনিকট তাঁহাদের সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। হস্তি-সংগ্রহ মুসলমানদিগের ত্রিপুরা আক্রমণের প্রধান কারণ। *

১২৬৯ শকাব্দে (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার পাঠান সুলতান সামসুউদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়া সাহ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। তিনি মহারাজ প্রতাপমাণিক্যকে পরাজয় করিয়া অর্থ ও হস্তী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময় চট্টগ্রাম মুসলমানদিগের কুক্ষিগত হয়। ১২৭২ শকাব্দে মুড় পরিব্রাজক ইবন বতোতা পীর বদরুদ্দিনের দর্শন জন্য চট্টগ্রামে গমন করেন। তৎকালে সুলতান ফকিরুদ্দিন চট্টগ্রামের করগ্রাহি অধিপতি ছিলেন।

অপুত্রাবস্থায় প্রতাপ মাণিক্য কাল কবলিত হন। তদন্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুট মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন তিনি দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১৩১৭ শকাব্দে (১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরেশ্বর আরাকানপতি রাজামেংদির নিকট উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। আরাকানের ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরা

* ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে হস্তী প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বতের হস্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবোল ফাজেল স্বীয় আইন আকবরী গ্রন্থে মোগল সম্রাট আকবরের "ফিলখানার" বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন; "The best elephants are those of Tipperah."
Gladwin's Ayeen Akbery. Vol. I. page 94.

"থু-র-তন" আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে।* মুকুট মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহামাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও পরম ধাৰ্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ধৰ্ম্ম ও তৎকনিষ্ঠ গগনফার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। জ্যেষ্ঠ কুমার ধৰ্ম্ম পিতার বৰ্ত্তমানে সন্ন্যাস গ্রহণ পূৰ্ব্বক তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। অপর রাজকুমারগণ পিতৃ-বিয়োগ সময়ে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন।

কুমার ধৰ্ম্মদেব সন্ন্যাসী-বেশে বারাণসীনগরে অবস্থানকালে একদা মধ্যাহ্নসময়ে মণিকর্ণিকাতটে নিদ্রিত ছিলেন; তৎকালে এক প্রকাণ্ড কালফণী ফণা বিস্তারপূৰ্ব্বক তাঁহার মস্তক মার্ত্তণ্ড দেবের প্রখর উত্তাপহইতে রক্ষা করিতেছিল। কান্যকুব্জ দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ এই ঘটনা দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুমার জাগ্রত হইলে বিষধর স্বস্থানে প্রস্থান

* আরাকানের ইতিহাস "রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরাকে "থু-র-তন" লেখা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক কর্ণেল ফেয়ার এই থুরতনকে সুবর্ণগ্রাম নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাঙ্গালার পূৰ্ব্বপ্রান্তে "ত্রিপুরা" নামে যে একটি প্রাচীন স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, ইহা ফেয়ার সাহেবের জ্ঞানই ছিল না।

করিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, কুমার! আপনি স্বদেশে গমন করুন, শীঘ্রই আপনার মস্তকে রাজছত্র ধৃত হইবে। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি সপরিবারে আপনার সহিত ত্রিপুরায় গমন করিতে প্রস্তুত আছি। এই সময়ে ত্রিপুরা হইতে কয়েকজন লোক তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া বারাণসী নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা কুমারের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "কুমার! আপনার পিতা বসন্ত রোগে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, সৈন্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আপনার জীবিতাবস্থায় অন্যের কথা দূরে থাকুক, আপনার অনুজকেও সিংহাসন আরোহণ করিতে দিবে না।" কুমার ধর্ম্ম এই বাক্য শ্রবণে ত্রিপুরায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কান্যকুব্জ দেশীয় কৌতুক নামক সেই ব্রাহ্মণ সপরিবারে তাঁহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। ১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য কান্যকুব্জ দেশীয় সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক প্রাচীন পুরোহিত-দ্বয়ের নিকট স্বীয় পিতৃপুরুষগণের যে কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই বাঙ্গলা

পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়া "রাজমালা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি "ধর্ম্মসাগর" নামক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন * এই সরোবরের খনন কার্য্য দুই বৎসরে শেষ হইয়াছিল। সেই দীর্ঘিকা উৎসর্গ কালে ১৩৮০ শকাব্দের বৈশাখ মাসে সোমবার শুক্ল-পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি তাম্রশাসন দ্বারা কৌতুক ও অন্যান্য ৭ জন ব্রাহ্মণকে "২৯ দ্রোণ শস্য পূর্ণ ভূমি" ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল সনন্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য লিখিয়াছিলেন—"আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এইরাজ্য অন্য কোন নরপতির করতলস্থ হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহার দাসানুদাস হইব, তিনি যেন ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করেন।" †

* ধর্ম্মসাগর নামে দুইটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী প্রাচীন কৈলারগড় রাজধানীতে, অন্যটি কুমিল্লা নগরী-বক্ষে, বিষ্ণু বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভমণির ন্যায় দর্শকমণ্ডলীর নয়না-নন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। রাজমালা লেখক কেন যে একটি ধর্ম্মসাগরের উল্লেখ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিনা।

† মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতির্ভবেৎ।
তস্য দাসস্য দাসোহহং ব্রহ্মবৃত্তিঃ ন লোপয়েৎ।

প্রাচীন হিন্দুনরপতিগণের তাম্রশাসন সমূহে ভাবি-নরপতিবর্গকে দত্তভূমিরপ্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ ধন্য, কনিষ্ঠ প্রতাপ।

মুসলমানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার

করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করা হইয়াছে। প্রায় সমস্ত তাম্রশাসনে "ধর্ম্মানুশাসনোক্ত" নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়।

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্॥

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেৎ বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥

তড়াগানাং সহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুদ্ধ্যতি॥

কান্যকুব্জপতি গোবিন্দচন্দ্রের ১১৬৩ সংবতের এক খানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, মদ্বংশজ কিম্বা অন্য বংশজাত ভাবিনরপতিগণ যেন দত্তভূমির এক খানি দুর্ব্বা ও গ্রহণ না করেন।

মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের শাসনকালে বামরথ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এক কূট (জাল) সনন্দের বলে আধুনিক অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত সোমকুণ্ডিকা নামক গ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তৎ সংবাদ অবগত হইয়া, সেই কূট সনন্দ বিনষ্ট করত সোমকুণ্ডিকা গ্রাম অন্য দুইজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। কিন্তু তিনি তাহা "খাস দখলে" আনয়ন করেন নাই।

মানসে মহারাজ ধন্মমাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ভীষণ সংগ্রামে সুলতান আবুল মোজাহেদ আহাম্মদ শাহকে জয় করত সুবর্ণগ্রাম লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে আরাকানপতি "মেং-সো-মোয়ান" ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ত্রিপুরপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুর সৈন্যের বাহুবলে মগরাজ স্বীয় সিংহাসন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য যেরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তদ্রূপ একজন প্রবল পরাক্রমশালী নরপতিও ছিলেন।

ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয়) প্রতাপ মাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি অতি অল্পকাল রাজ্যশাসন করিয়া জনৈক দুষ্ট সেনাপতি কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার হত্যার পর জ্যেষ্ঠ ধন্যমাণিক্য ১৪১২ শকাব্দে (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজাসনে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, সৈনিকগণ যার পর নাই পরাক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা যখন যাহাকে ইচ্ছা করে, তখনই তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিতে পারে। অতএব ইহাদিগকে আশু দমন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিশ্বস্ত অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ স্থির হইলে মহারাজ এক দিবস পীড়ার

ভান করিয়া, সেনাপতিগণকে নিভৃত স্থানে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে দশজন সেনাপতি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তখন হঠাৎ কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া অসিদ্বারা তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিল। এবম্প্রকার কুচক্রী সেনাপতিগণের অদৃষ্টে প্রায়ই ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের জেনিজারি নামক সৈন্যগণের এই দশা ঘটিয়াছিল। ত্রিপুরার সেনাপতিরাও জেনিজারি এবং মিসর দেশীয় মেমলুক্‌সদিগের ন্যায় প্রায়ই রাজকার্য্যে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিত।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য কুচক্রী সেনাপতিগণকে নিপাত করিয়া বিশ্বস্ত সমরকুশল রায় চয়চাগ* নামক ব্যক্তির উপর সমস্ত সৈন্যের ভার অর্পণ করেন। সেই সময় ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে একটী শ্বেত হস্তী দৃষ্টিগোচর হয়। মহারাজ ধন্য মাণিক্য তাহা ধরিবার জন্য আদেশ করেন; কিন্তু থানাসী নগরের কুকি নরপতি ঐ হস্তীটীকে আবদ্ধ করাতে ত্রিপুরসেনাপতি এক দল সৈন্য লইয়া কুকিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেনাপতি প্রথমতঃ থানাসীনগরের কুকিরাজকে পরাজয় করিয়া শ্বেতহস্তী হস্তগত করেন, তৎপর অন্যান্য

* মেকেঞ্জি সাহেব সেনাপতি চয়চাগকে ত্রিপুরাপতি চয়চাগ মাণিক্য লিখিয়াছেন।

North-East Frontier of Bengal. p. 270.

কুকিগণকে সম্পূর্ণরূপে পদানত করিয়া রাঙ্গামাটীয়া নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ রায় চয়চাগ কর্ত্তৃক কুকিগণ যেরূপ অবস্থায় পরাজিত এবং নিহত হইয়াছিল, আর কখনও কুকিগণ সেই প্রকার অবস্থাপন্ন হয় নাই। তিনি অনেকানেক কুকি স্ত্রীলোক আবদ্ধ করিয়া আনিয়াছিলেন। মহারাজ ধন্যের শাসন সময়েই ত্রিপুরার পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত সমস্ত কুকিজাতি, সেনাপতি রায় চয়চাগের বাহুবলে ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে ত্রিপুরার পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মদেশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য, বাঙ্গালার সুবিখ্যাত সুলতান সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মোজাফর হুসন সাহ এবং আরাকানের প্রবল-বিক্রম নরপতি মেং রাজার সমসাময়িক। তাঁহারা উভয়েই ত্রিপুরা ধ্বংস করিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁহার সুবিখ্যাত সেনাপতি রায় চয়চাগের বাহুবলে তাঁহারা কৃত-কার্য্য হন নাই।

ধন্য মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরে চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও মগ এই জাতিত্রয়ের রুধিরে চট্টলাচল রঞ্জিত হইয়াছিল।* ত্রিপুর সেনানী মহাবীর রায় চয়চাগ হনুমান-

মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত-পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন, আরকানরাজ বৃষভ ধ্বজ,—ও হুসনসাহের সৈন্যগণ অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত-পতাকা লইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। দীর্ঘকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। অবশেষে যবন ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া রায় সেনানী বিজয়ী পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছিলেন।

“কামরূপ ও কোমতা বিজয়ী” হুসন সাহ এই অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাঙ্গলার দ্বাদশ বিভাগ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং গৌর মল্লিককে তাহার সৈনাপত্যে নিয়োগ করিয়া ত্রিপুরায় প্রেরণ করিলেন। কুমিল্লা নগরীতে গৌর মল্লিকের সহিত চয়চাগের প্রথম সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে ত্রিপুর সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া গেলে, মুসলমানেরা মেহেরকুল দুর্গ অধিকার করিয়া ক্রমশঃ রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ত্রিপুর সৈন্যেরা সোণামাটীয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোমতী নদীতে একটা বাঁধ নির্ম্মাণ করে; তাহাতে ৩ দিবস নদীর জলস্রোত বদ্ধ ছিল। তৎপরে যখন মুসলমান সৈন্য জলশূন্য শুষ্ক গোমতী অতিক্রম করিতেছিল, তখন তাহারা ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে ত্রিপুরা বিজয় অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। প্রায় অধিকাংশ মুসলমান জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া-

ছিল। * অবশিষ্ট মুসলমান সৈন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পরিশেষে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিরাপদ হইল না। ত্রিপুরসৈন্যেরা রাত্রিশেষে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবেশ করত অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। অতি অল্প-সংখ্যক মুসলমান প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কথিত আছে ত্রিপুর সৈন্য মেহেরকুল দুর্গে পরাজিত হইলে, শত্রুজয় উদ্দেশে মহারাজ ধন্য মাণিক্য একটী কৃষ্ণবর্ণ চণ্ডাল বালককে বলি প্রদান করিয়া ভবানীর পূজা করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগকে জয় করিয়া মহারাজ ধন্য মাণিক্য একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। সেই বাপী অদ্যাপি "ধন্যেব দীঘি" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। † সেই সরোবর তীরে মহারাজ ধন্য মাণিক্য বিজয়স্তম্ভস্বরূপ এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

সেনাপতি চয়চাগ হুসন সাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া মগ-দিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। তিনি মগদিগকে

* স্পেনীয়দিগের লিডন আক্রমণকালে ওলন্দাজেরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন।

† এই স্থানটী অধুনা বলদাখাল (বরদাখ্যাত) পরগণার অন্তর্গত। দীঘির চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম "ধন্যংখলা দীঘির পাড়" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে।

বাবংবার পরাজয় করিয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরা রাজ্য-ভুক্ত করেন।*

এদিকে হুসেন সাহ পুনরায় বৃহৎ এক দল সৈন্যের সহিত হাতিয়ান খাঁকে রাঙ্গামাটীয়া অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি চয়চাগ চট্টগ্রাম রক্ষারজন্য কতি-পয় সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত হাতিয়ান খাঁকে অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কুমিল্লার নিকটে উভয় দল একত্রিত হয়; তাহার পর দিবস প্রত্যূষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সমস্ত দিন সংগ্রামের পর চয়চাগ পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। কিন্তু পুনরায় পূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া গোমতী স্রোতে মুসলমানদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। হাতিয়ান খাঁ পলায়ন করিয়া গুগড়িয়া দুর্গ মধ্যে আসিয়া মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া বসিলেন এবং বলিলেন "যদি ত্রিপুরা জয় করিতে হয়, তবে দ্বিগুণ সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।" কিন্তু তিনি স্বীয় প্রভুর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পদচ্যুত হইলেন।

মহারাজ ধন্য মাণিক্য বন্দীকৃত শত্রুগণকে বলি প্রদান

---

* মহাবীর চয়চাগ যে সমুদ্রবক্ষে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন রাজমালা গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তেতুলীয়ার মোহনায় যে "ধন মাণিকের চর" নামক একটি দ্বীপ দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত কি ধন্য মাণিক্যের বিজয় বৃত্তান্তের কোন সংশ্রব নাই?

করিয়া মহোৎসবের সহিত চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা করিলেন। ত্রিপুরাতে বার্ষিক এক সহস্র নরবলির প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত ছিল। মহারাজ ধন্য মাণিক্য তাহা রহিত করিয়া কেবল অপরাধী এবং যুদ্ধে বন্দীকৃত শত্রুকে বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন।

এই সময় মহারাজ ধন্য মাণিক্য দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরের ক্ষোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে, ১৪২৩ শকাব্দে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। * রাজমালায় লিখিত আছে, দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী চট্টলাচল মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে মহারাজ ধন্য মাণিক্যের প্রতি আদেশ করেন। তদনুসারে ধন্য মাণিক্য দেবীকে রাঙ্গামাটিয়া নগরে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা

* আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকল গুণযুতো ধন্যমাণিক্য দেবো
যাগে যস্যাহ্বরীশঃ ক্ষিতিতল মগমৎ কর্ণতুল্যস্তু দানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেহম্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগন পরিগতং সেবিতায়ৈ সদেবৈঃ॥

(মন্দিরগাত্রে সংযোজিত প্রস্তরলিপি।)

মহারাজ ধন্য মাণিক্য যে সময় ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হুসন সাহ ঢাকার অন্তর্গত বল্লীপুর মধ্যে এক প্রকাণ্ড মসজিদ প্রস্তুত করেন। মসজিদের ক্ষোদিত লিপির তারিখ ৯০৭ হিং ২২ জুমদা। উভয়ই ১৫০১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত।

প্রচার করেন। এই দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী দ্বারা তান্ত্রিক জগতে ত্রিপুরা একটি তীর্থ (পীঠ) স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। মহারাজ ধন্য মাণিক্য স্বর্ণময়ী ভুবনেশ্বরী দেবী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিব ও শক্তি মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং শৈবছিলেন।

হুসন সাহ তৃতীয় বার ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এইবার তিনি কুমিল্লার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী কৈলারগড় (মুসলমান লেখকদিগের লিখিত জাজিনগর) অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। কৈলারগড় (আধুনিক কসবা) নগরের প্রায় এক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে বিজয় নদীর তীরে তাঁহার সৈন্যগণ শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। এই স্থানের পূর্ব্বদিক উক্ত নদীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে যে প্রকাণ্ড গড় খাত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সেনানিবাস উত্তর দক্ষিণে ৯৫০ হাত দীর্ঘ, আমরা তাহার পরিমাপ করিয়াছি। এই সেনানিবাস রক্ষা করিবার জন্য বিজয় নদীর উভয় তীরে যে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। *

---

* কুমিল্লা হইতে যে প্রশস্ত রাজমার্গ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অভিমুখে গিয়াছে, তাহা এই গড়ের প্রায় বক্ষঃস্থল কর্ত্তন করিয়া

কৈলারগড় সন্নিকর্ষে হুসন সাহের সহিত মহারাজ ধন্য মাণিক্যের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, রাজমালা-লেখক তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় ইহার পরিণাম ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই, এজন্যই রাজমালা লেখক তাহা গোপন করিয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে যে

নির্ম্মিত হইয়াছে। পথিকগণ নয়াগাঁর পূর্ব্বদিকস্থ বৃহৎ বটবৃক্ষ পশ্চাৎ রাখিয়া কিয়দ্দূর উত্তরদিকে গমন করিলে সেই গড়ের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিতে পারিবেন। এই গড়ের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যে দুই খানা গ্রাম বর্ত্তমান আছে তাহাতে হুসন সাহের ত্রিপুরা বিজয়ের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গড়ের দক্ষিণদিকস্থ গ্রাম জমিদারি সেরেস্তার কাগজ পত্রে অদ্যাপি "হুসনপুর" এবং পশ্চিমদিগস্থ গ্রাম "সাহাপুর" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণে হুসনপুরকে "নয়াগাও" এবং সাহাপুরের দক্ষিণভাগ অর্থাৎ দক্ষিণ সাহাপুরকে "আকৃছিনা" বলিয়া থাকে। উভয় গ্রামের প্রধান অধিবাসী মুসলমান। বিশেষতঃ সাহাপুর গ্রামে এক অতি প্রাচীন মুসলমান বংশ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। ইঁহারা সৈয়দবংশীয়, সুলতান হুসন সাহও সৈয়দবংশীয় ছিলেন। সাহাপুর নিবাসী সৈয়দবংশীয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষ সুলতানের "সিপ্পাসেলার" আখ্যা প্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন। বোধ হয় হুসন সাহের বিজয়ের পর তিনি সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য স্বজাতীয় কোন কর্ম্মচারীকে এস্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

[৫]

হুসন সাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

সুবর্ণগ্রামের এক মসজিদের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুলতান হুসন সাহের শাসন কালে "ইক্লাম মোজমাবাদের" উজীর এবং ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্ত্তা খঁওয়াস খাঁ (১৪৩৫ শকাব্দা) সেই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হুসনসাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করিতে সক্ষম হন। * ইক্লাম মোজমাবাদ অর্থাৎ সুবর্ণগ্রামের উজীরের হস্তে সেই বিজিত অংশের শাসন ভার

* This masque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the kingdom of Soloman, Alauddunya-waddin Abil Muzaffar Husain Shah— * * * -by the great and noble khan, namely Khawac khan *Governor of the Land of Tipurah* and Vazir of the District Muazzamabud,—may God preserve him in both worlds. Dated 2*nd* Rabi II., 919. (7—6—1513) (J. A. B. XII. I, 333—34.)

১৪২৭ শকাব্দের একখণ্ড প্রস্তরলিপিতে ত্রিপুরাভূমির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তাহাতে খালিছ খাঁকে কেবল "মোজমাবাদের উজির" লেখা হইয়াছে, অতএব বোধ হয় ১৪২৭ শকাব্দের পর হুসন সাহ ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

অর্পিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও উত্তর দিকস্থ রাজ্য সমূহ জয় করিয়া হুসনসাহ "কামরু (কামরূপ) কাম্‌তা (কোমতাপুর) ও জাজনগর (ত্রিপুরা) বিজয়ী" উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু এই সকল বিজিত রাজ্য বা রাজ্যাংশ দীর্ঘকাল মুসলমান দিগের শাসনাধীন ছিলনা।

মহারাজ ধন্য মাণিক্য যৎকালে হুসনসাহের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরাকান পতি নির্ব্বিবাদে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৪৩৯ শকাব্দে পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী জন, ডি, সেলবেরা আরাকান-রাজকর্ত্তৃক আহুত হইয়া চট্টগ্রাম পরিদর্শন পূর্ব্বক মগরাজ্যে গমন করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম আরাকান পতির হস্তে ছিল।

মহারাজ ধন্য মাণিক্যের রাজ্ঞী মহাদেবী কমলা রাজধানী কৈলারগড়ে যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "কমলাসাগর" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কমলাসাগরের জল অতি উৎকৃষ্ট।

ধন্য মাণিক্য ৩০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া বসন্ত রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন। মহাদেবী কমলা ধ্বজ এবং দেব নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইলেন।

ধন্য মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র নামে তাঁহার

এক শিশু পুত্র ছিল। তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া তাঁহার পিতৃব্য দেব মাণিক্য ১৪৪২ শকাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৪৪৪ শকাব্দে তিনি আরকানপতি গজাবদিকে জয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরে হুসন সাহের পুত্র স্থলতান নাছিরদ্দিন নছরথ সাহ, স্বর্গীয় পিতার প্রেতাত্মার পরিতোষ সাধন জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। হুসন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর বাহুবলে চট্টগ্রাম নছরথ সাহের কুক্ষিগত হইয়াছিল। অনেকেরই এরূপ সংস্কার যে, নছরথ সাহ চট্টগ্রাম বিজয় করিয়া তথায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার অত্যাচারে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার নীচ শ্রেণীস্থ লোকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নছরথ সাহ পরাগল খাঁকে চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন। *

* রাজমালা লেখক নছরথসাহ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় বৃত্তান্ত গোপন করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সাক্ষি-স্বরূপ নছরথ সাহের অনুমতানুসারে খনিত "নছরথ সার দীঘি" নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নছরথ সাহের সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা "লস্কর" পরাগল খাঁর সভাসদ পণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জৈমিনির ভারত অবলম্বন পূর্ব্বক পিয়ারাদ

নছরথ সাহের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেব মাণিক্য রাজধানী রাঙ্গামাটীয়া নগরে উপনীত হইলেন। তিনি কয়েকজন বিপক্ষ সৈন্যকে বন্ধিস্বরূপ লইয়া আইসেন। তাহাদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলিদান করা হয়। চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাই দেব মাণিক্যকে বলিলেন মহাদেব আদেশ করিয়াছেন "রাজা, তাহার প্রধান যোদ্ধৃগণকে বলিদান করিলে, চতুর্দ্দশ দেবতা তৎপ্রতি প্রসন্ন হইবেন। তদনুসারে দেব মাণিক্য স্বীয় প্রধান সেনানী

ছন্দে মহাভারত রচনা করেন। পরাগল খাঁর উপযুক্ত পুত্র ছুটি খাঁর অভিপ্রায় মতে তাহার সভাসদ্ শ্রীকর নন্দী নামক জনৈক কবি অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকর নন্দীর রচিত অশ্বমেধ পর্ব্ব, যাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা ১৫৮৬ শকাব্দের লিখিত একখান প্রাচীন গ্রন্থ। ছুটি খাঁর গুণানুবাদ করিয়া কবি শ্রীকর নন্দী বলিতেছেন :—

তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজি কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

৮ জনকে বলি দিয়াছিলেন। পরে তিনি জানিতে পারিলেন, চন্তাই ধ্বজমাণিক্যের পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক হইলেন এবং চন্তাইর বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সতর্ক হওয়ার সময় অতীত হইয়া গিয়াছিল। চন্তাই দেবমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে গোপনে হত্যা করিলেন। চন্তাই ধ্বজমাণিক্যের অল্পবয়স্কপুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রচার করিলেন—"চতুর্দ্দশ দেবতার উপযুক্তরূপ অর্চ্চনা না করায় দেবমাণিক্য তাঁহাদের কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন।" চন্তাই ইন্দ্রমাণিক্যের মাতার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই ষড়যন্ত্র মূলক রাজ্যশাসন অল্প দিন

সমসাময়িক হইলেও কবি নন্দী মহাশয় ইতিহাস লেখক নহেন, তিনি যে তাঁহার আশ্রয়দাতার গুণ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত ইতিহাস লেখক অবশ্যই এরূপ অনুমান করিতে পারেন। নছরৎ সাহ কর্ত্তৃক ত্রিপুর সৈন্য জয় ও চট্টগ্রাম অধিকার, ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। ছুটি খাঁর ভয়ে তদানীন্তন ত্রিপুরেশ্বর "পর্ব্বত গহ্বরে" প্রবেশ পূর্ব্বক "গজ বাজী কর দিয়া" খাঁ মহাশয়ের পদ পূজা করিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা তোষামোদকারী কবির প্রলাপ বাক্য, আমরা ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না

মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। সৈন্যগণ যখন জানিতে পারিল, চন্তাই রাজ্ঞীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেবমাণিক্যকে হত্যা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমেই চন্তাইকে এবং তৎপরে মাতার সহিত ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া মৃত্তিকায় সমাহিত করিল। ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যশাসন কাল ৫ মাসের অধিক হইবেক না।*

পাঠান বিক্রম সম্রাট সের সাহের শাসনকালে ত্রিপুরার অন্তর্গত

পাখরাট

সাহ সুবর্ণ গ্রাম হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজমার্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মেঘনার পূর্ব্বতীর হইতে বরদাখাৎ ও নুরনগর পরগণার মধ্যদিয়া ত্রিপুরা পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত যে রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সর্ব্ব সাধারণে অদ্যাপি সেই রাজমার্গকে "গুনাজার জাঙ্গাল" বলিয়া থাকে। দেব মাণিক্যের অভিষেক কাল হইতে বিজয় মাণিক্যের উভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিপুরার অধিকার কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ দেবমাণিক্যের দুই পুত্র ছিল; জ্যেষ্ঠ বিজয়

---

* মতান্তরে ইন্দ্রমাণিক্য দেবমাণিক্যের পুত্র এবং তিনি বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

কনিষ্ঠ অমর। ইন্দ্রমাণিক্যের নিধনের পর ত্রিপুর-কুলতিলক বিজয় মাণিক্য ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে (১৪৫৭ শকাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি দৈত্যনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে পাপিষ্ঠ দৈত্য নারায়ণ স্বয়ং রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করেন। বিজয় মাণিক্য দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুরই প্রকৃত রাজা, তিনি স্বয়ং সাক্ষি গোপাল মাত্র। মহারাজ বিজয় মাণিক্য দৈত্য নারায়ণকে নিধন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় জনৈক আত্মীয় দ্বারা রাত্রিযোগে তাঁহাকে অপরিমিত মদ্য পান করাইলেন। তদনন্তর তিনি স্বয়ং অজ্ঞানবস্থাপন্ন দৈত্য নারায়ণকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার একজন প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী পিতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণে স্বামীর প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য দ্বারা তাঁহার মর্ম্ম পীড়া প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য মহারাজ বিজয় মাণিক্য তাঁহার প্রথমাপত্নীকে অরণ্য মধ্যে নির্ব্বাসন পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যের আভ্যন্তরিক সংস্কার ও উন্নতির প্রতি যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে ত্রিপুরার সৈন্য বল বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি কতকগুলি পাঠান দ্বারা একদল

অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার অনেকগুলি রণতরীও ছিল।

সের সাহের মৃত্যুর পর ত্রিপুর-কুল-তিলক বিজয়মাণিক্য যে ত্রিপুরার হৃত অংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি ত্রিপুরার উত্তর ও দক্ষিণস্থ স্থান সমূহ ও পূর্ব্ববঙ্গ লুণ্ঠন করিয়া মুসলমানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ চট্টগ্রামের উদ্ধার সাধনজন্য স্বীয় বাহুবলের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মগ ও মুসলমানদিগকে জয় করিয়া বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এই যুদ্ধ-যাত্রা কালে এক সহস্র পাঠান অশ্বারোহী কোন কারণে বিদ্রোহী হইয়া রাজার প্রাণ নাশ পূর্ব্বক রাজধানী অধিকারের চেষ্টা করে। মহাবীর বিজয় মাণিক্য স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও কতকগুলিকে জীবিতাবস্থায় বদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলিপ্রদান করিয়াছিলেন।

কররাণী-বংশীয় উড়িষ্যা-বিজয়ী সুলতানসুলেমান চট্ট-গ্রাম অধিকারজন্য মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে তিন সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি প্রেরণ করেন। চট্টগ্রামে ত্রিপুর সৈন্যের সহিত মুসলমান দিগের ক্রমান্বয়ে ৮ মাস যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি নিহত হন, কিন্তু পশ্চাৎ মুসল-

মানেরাই পরাজিত হয়। ত্রিপুর সৈন্যগণ বিপক্ষ সেনাপতি মহম্মদ খাঁকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া নগরে আনয়ন করে। মহারাজ বিজয় মাণিক্য তাঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলিদান করেন।

কিছুকাল পরে বিজয় বঙ্গদেশ আক্রমণে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি ২৬ সহস্র উৎকৃষ্ট পদাতি এবং ৫ সহস্র অশ্বারোহী ও কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত ৫ পাঁচ সহস্র নৌকায় আরোহণ করিয়া যাত্রা করিয়া প্রথমে সোণারগাঁয় মুসলমানদিগকে পরাজিত করিলেন। এবং তথা হইতে লক্ষা নদী অতিক্রম করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি সেই সকল নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর অর্থ এবং কতিপয় সুন্দরী যুবতী রমণী সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্র নদে উপস্থিত হইয়া ধন এবং স্ত্রীলোকদিগকে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করত মহারাজ বিজয় মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই স্থান অদ্যাপি "পাঁচদোনা" নামে পরিচিত রহিয়াছে। *

তদনন্তর মহারাজ বিজয় মাণিক্য শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রমণ

* সেই পাঁচ দোনা অধুনা ঢাকা জেলার অন্তর্গত

ও লুণ্ঠন করিলেন। জয়ন্তীয়াপতি নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করেন। জয়ন্তীয়া রাজের বিনয় ও ভক্তিতে বাধ্য হইয়া মহারাজ বিজয় মাণিক্য প্রসাদ স্বরূপ তাঁহাকে একটী হস্তী প্রদান করেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য কৈলারগড় রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া শ্রুত হইলেন,—যে জয়ন্তীয়াপতি প্রচার করিয়াছেন, "বিজয় মাণিক্য ভয়াতুর হইয়া আমাকে একটী হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।" তিনি এই বাক্য শ্রবণ মাত্র জয়ন্তীয়াপতিকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জয়ন্তীয়া-রাজ ত্রিপুর-সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ভয়ে কাতর হইয়া স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাছাড়ে পলায়ন করিলেন এবং কাছাড়পতি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ত্রিপুরেশ্বর নিকট পত্র পাঠাইলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য জয়ন্তীয়াপতিকে ক্ষমা করিয়া ত্রিপুর সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য বিজয় নদীর বিবিধ বাঁক কর্ত্তন করিয়া দেন, এজন্য সেই স্রোতস্বতী অদ্যাপি "বিজয় নদী" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। তদনন্তর মহারাজ বিজয় মাণিক্য নানাবিধ সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বিতরণ জন্য এক দিবস কল্পতরু হইয়াছিলেন। তিনি "তুলা

পুরুষ", জলাশয় খনন, মঠনির্ম্মাণ, দেবতা স্থাপন, দেবোত্তর, ব্রহ্মত্তর প্রভৃতি নানা প্রকার ভূমিদান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

মহারাজ বিজয় মাণিক্যের দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ পুত্র কুমার অনন্ত, প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপীপ্রসাদ চক্রান্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ কুমারকে জগন্নাথ দর্শনের ছলে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। এই সময় ৯৭২ ত্রিপুরাব্দে বিজয় মাণিক্য বসন্ত রোগে মানবলীলা সংবরণ করেন, তাহার কতিপয় সংখ্যক রাজ্ঞী তৎসহ অনুমৃতা হইলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য যে একজন বলবীর্য্যশালী নরপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল স্বীয় "আইন আকবরী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "ভাটী প্রদেশের * সহিত সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা) আর তাহার অধিপতির নাম বিজয় মাণিক্য। যিনি

* হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘনাদের তীর পর্য্যন্ত সমগ্র নিম্নভূমিকে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ "ভাটী" নামে পরিচিত করিয়াছেন। আধুনিক জেলা চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ ভাটী প্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছে।

রাজা হন, তিনিই তাঁহার নামের অন্তে "মাণিক্য" উপাধি সংযুক্ত করেন। সেই রাজ্যের আমির ওমরাহগণ "নারায়ণ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে, কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।"*

আইন আকবরী গ্রন্থে মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের যে হিসাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সাধারণে তাহা, রাজা তুড়ল মল্লের কৃত "ওয়াসীল তোমর জমা" বলিয়া জ্ঞাত আছেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় সাধারণের ঐরূপ জ্ঞান নিতান্ত ভ্রমাত্মক; কারণ মোগল সম্রাট আকবর, কিম্বা জাহাগীর যে সকল স্থান কস্মিন কালে অধিকার করিতে পারেন নাই, তাহাও উক্ত ওয়াসীল তোমর জমায় ভুক্ত রহিয়াছে। রাজা তুড়লমল্ল সুবেবাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া সরকার চট্টগ্রাম ও তদন্তর্গত মহাল সমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফজেল আইন আকবরী গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, "চট্টগ্রাম বন্দর মগরাজার অধিকার ভুক্ত"। রাজা তুড়ল মল্ল যে বৎসর ওয়াশীল তোমর জমা প্রস্তুত করেন, সেই বৎসর সুবিখ্যাত ইংরেজ ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছ বাঙ্গালায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য যে বৎসর মানব-লীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসর রল্‌ফ ফিছ চট্টগ্রামে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন,

* মূল আইন আকবরী হইতে অনুবাদিত ও উদ্ধৃত।

"সাতগাঁও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম, রাক্ষিয়াং ও রামুবাসী মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরাপতির দুর্ব্বলতায় চট্টগ্রাম বা পোর্টগ্রেণ্ডো বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার হস্তগত হয়।" *

আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত যে সকল মহাল বা পরগণা রাজা তুড়ল মল্লের ওয়াশীল তোমর জমা ভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে। এই সমস্ত মহাল বা পরগণা এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজচ্ছত্রের অধীন ছিল। তন্মধ্যে ভুলুয়া, সিংহেরগাঁও প্রভৃতি কতকগুলি পরগণা সামন্ত নরপতিগণের এবং তদ্ভিন্ন পরগণাগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আবুল ফজল ও রল্ফ ফিছের বর্ণনা দ্বারা ইহা বিশেষ রূপ নির্ণীত হইতেছে যে, সমগ্র ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উত্তরাংশ

* From Satagam I travelled by the country of the King of Tippara, with whome the Mogen have almost continual warres. The Mogen which be of the kingdome of Recon and Rame, be stronger than the king of Tippara. So that Chatigan, or *Porto Grando*, is often times under the king of Recon. (Ralph Fitch.)

এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণাংশ মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজচ্ছত্রের অধীন ছিল। চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগ লইয়া মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের কলহ চলিতেছিল। আমাদিগের বিবেচনায় রাজা তুড়লমল্লের ওয়াশীল তোমর জমা সম্পূর্ণ প্রত্যয়যোগ্য নহে। * বিজয় মাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্য-সীমা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহাকেই বঙ্গ ও ব্রহ্মরাজ্যের মধ্যস্থিত সমগ্র সুহ্মদেশের একমাত্র অধিপতি বলা যাইতে পারে। সংক্ষিপ্ত রাজমালা লেখক বিজয় মাণিক্যের নামের সহিত "সম্রাট" শব্দ সংযুক্ত করিয়াছেন।

বিজয় মাণিক্য পরলোক গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য স্বীয় শ্বশুরের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দেড় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া শ্বশুরের কুমন্ত্রণায় স্বীয় পাচিকা কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন। তাঁহার পত্নী অনুমৃতা হইতে প্রস্তুত হইলে, গোপীপ্রসাদ তাহাতে বাঁধা দেন। তৎপরে বিধবা রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি অর্থাৎ স্বীয় পিতার নিকট পতির সিংহাসনে স্বয়ং আরোহণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোপীপ্রসাদ তাহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ং

* বুকমান সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনিত হইয়াছেন।
J. A. S. B. XLII. I. pp. 214, 234.

রাজ্যেশ্বর হইয়া চণ্ডীগড় নামক স্থান জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক কন্যাকে চণ্ডীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করিলেন।*

পঞ্চম অধ্যায়।

গোপীপ্রসাদ নিজ নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক "উদয়মাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খৃঃ) ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি বহুবিধ জলাশয় খনন এবং প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন, এবং রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে "উদয়পুর" নাম করণ করিলেন। †

তাঁহার ২৪০টী স্ত্রী ছিল। স্ত্রীগণমধ্যে প্রায় অনেকেই রজনী যোগে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া পরপুরুষ সহযোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন। সে সময় গৌড়ের একজন মুসলমান রাজপুত্র দেশ পর্য্যাটনে বহির্গত হইয়া ত্রিপুরায় উপস্থিত হন। উদয়মাণিক্য তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু যখন

* আমাদের বিবেচনায় কুমিল্লার পশ্চিম দিগে অবস্থিত লালময়ী পর্ব্বত প্রাচীন চণ্ডীগড় হইতে পারে, কারণ এই পর্ব্বতের কিয়দংশ অদ্যাপি চণ্ডীমুড়া নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, ভগবতী চণ্ডীদেবী এইস্থানে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

† প্রকৃত পক্ষে উদয়পুর রাঙ্গামাটীয়ার কিয়দংশ মাত্র।

জানিতে পারিলেন, তাঁহার কয়েকটি স্ত্রী রাত্রি যোগে ঐ যবন রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া তৎসহবাসিনী হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; এবং ঐ সকল স্ত্রীকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করত ও কুক্কুর দংশনে বধ করিলেন।

ঐ সময়ে মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ উদয়মাণিক্য তাহাদিগকে পথিমধ্যে অবরোধ করিবার জন্য বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কথিত আছে সেই যুদ্ধ যাত্রা কালে আকাশ হইতে উল্কাপাত এবং শৃগালগণের ঘোরতর অমঙ্গলসূচক শব্দ হইয়াছিল। ত্রিপুর সৈন্যরা রাত্রিযোগে মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিল। ঘোরতর সংগ্রামের পর মুসলমানেরা জয়ী হইল। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুর সৈন্য এবং ৫ হাজার মুসলমান সৈন্য বিনষ্ট হয়। এই যুদ্ধ ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে কোন এক দুষ্টা স্ত্রীলোক বিষপান করাইয়া উদয় মাণিক্যের প্রাণ সংহার করে। তাঁহার রাজ্য শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানপতি মেংফালোং পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য যে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, তিনি সমগ্র ত্রিপুরা লুণ্ঠন করিয়া মেঘনাদ তীরে স্বীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন।

উদয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০৬ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি কেবল নামত রাজা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঙ্গনারায়ণই রাজ্য শাসন করিতেন। রঙ্গনারায়ণ দেখিলেন, বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমর ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছেন; যদি ঐ সময়ে তাঁহার বিনাশ সাধন না করিলে প্রাচীন রাজবংশই পুনরায় সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। এই বিবেচনা করিয়া রঙ্গনারায়ণ ভোজনার্থ অমরকে নিমন্ত্রণ করিলেন, অমর রঙ্গের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, অমরের এক বন্ধু তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তরবারি দ্বারা একটী পান দ্বিখণ্ড করিয়া সঙ্কেত করিলেন। রাজপুত্র অমর প্রাণনাশ শঙ্কা করিয়া অকস্মাৎ শারীরিক অসুস্থতার ভানে গত্রোত্থান করিয়া অশ্বশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় তাঁহার অশ্ব নাই; তখন তিনি অন্য একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিলেন এবং সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। রঙ্গ যেমন তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও তদ্রূপ রঙ্গের প্রাণসংহারের নিমিত্ত সৈন্যগণকে নানাবিধ বস্ত্রাদি পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহিত করিলেন। রঙ্গনারায়ণ ভয়ার্ত্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অচিরে সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্য পত্র লিখিলেন। কিন্তু

পত্রবাহক পথিমধ্যে অমর কর্ত্তৃক ধৃত হইল। অমর রঙ্গের স্বহস্তলিখিত পত্রের ন্যায় একখানি কৃত্রিম পত্র প্রস্তুত করিয়া একজন বিশ্বস্ত অশ্বারোহী দ্বারা রঙ্গনারায়ণের ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। রঙ্গের ভ্রাতা ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে যেমন বাহককে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, অমনি পত্রবাহক অশ্বারোহী তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া, তাহা রঙ্গনারায়ণের দর্শনার্থ দুর্গ মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

রঙ্গনারায়ণ নিজভ্রাতার ছিন্ন মস্তক দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতার অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছে, নচেৎ কখনই তাঁহার ভ্রাতা নিহত হইতেন না। রঙ্গনারায়ণ এইরূপ ভাবিয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষাভিপ্রায়ে রাত্রিযোগে গোপনে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি দুই দিবস কাল এক নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। ইতোমধ্যে অমরের একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিয়া স্বীয় প্রভুকে উপঢৌকন প্রদান করিল। অমর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া ঐ সৈনিককে "সাহসনারায়ণ" উপাধি প্রদান করিলেন।

জয়মাণিক্য এই সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া অমরকে লিখিলেন, তিনি কি জন্য এরূপ

অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। অমর স্থির করিলেন, পত্র দ্বারা প্রত্যুত্তর না দিয়া অস্ত্র দ্বারা উত্তর প্রদান করা সঙ্গত। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনজন্য তদভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। শত্রু সমাগত হইয়াছে, শুনিয়া জয়মাণিক্য অতিশয় ভীত হইলেন। অনন্তর তিনি রাজনিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কিন্তু অমরের সৈন্যগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে ধৃত করিয়া মস্তকচ্ছেদন করিল। জয় মাণিক্য সম্ভবতঃ এক বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

উদয়মাণিক্য এবং জয়মাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বিশেষরূপে খর্ব্ব হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি ত্রিপুরা-রাজ্যস্থ সমস্ত সামন্ত নরপতি ও জমিদারবর্গকে লিখিলেন যে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করা হইবে, এজন্য তাহারা সকলেই শ্রমন কুলী প্রেরণ করেন। তদনুসারে ৯ জন জমিদার ৭৩০০ কুলী পাঠাইয়া দেন। তদ্দ্বারা তিনি যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করেন, তাহা অদ্যাপি উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে, পর্ব্বত মধ্যে "অমরসাগর" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই সরোবর তীরে মহারাজ অমর মাণিক্য যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন

অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। একটি ত্রিতল অট্টালিকার বিচিত্র কারুকার্য্য অদ্যাপি ভ্রমণকারীদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রাজ-নিকেতন "অমরপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিঞ্চিদূন শত বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক ত্রিপুর নরপতি "অমরপুরের ছত্রধারি (স্বাধীন) রাজা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের জমিদার তাঁহার অনুমতি ক্রমে কুলী প্রেরণ করেন নাই। মহারাজ অমর মাণিক্য তাঁহাকে বন্ধী করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যের আগমণবার্ত্তা শ্রবণে জমিদার পলায়ন করিলেন, সৈন্যগণ তাঁহার পুত্রকে বন্ধী করিয়া আনয়ন করিল। জমিদার স্বয়ং শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অমর মাণিক্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র স্বয়ং শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার প্রতিকূলে গমন করিলেন।

মহারাজ অমরমাণিক্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গরুড় ব্যূহ রচনা করেন; সৈন্যগণ দেহ, সম্মুখস্থ দুই জন প্রধান সৈনিকপুরুষ চক্ষু এবং উভয় পার্শ্বস্থিত সেনানীগণকে পক্ষ বলিয়া বোধ হইল। অমর মাণিক্য গজারূঢ় হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে ছিলেন। সূর্য্যোদয়কালে উভয় দলের ঘোরতর যুদ্ধ

আরম্ভ হয়। সায়ংকালে মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর মুসলমানেরা যাবৎ শ্রীহট্টের পুনরুদ্ধারসাধন না করিয়াছিল. তাবৎ উহা ত্রিপুররাজের করপ্রদ ছিল।

অমর মাণিক্য স্বজন্মা নহেন, অতএব তিনি রাজ্যের বৈধ অধিকারী হইতে পারেন না, এই বলিয়া ভুলোয়ার অধিপতি রাজা বলরামস্থর কর প্রদানে অসম্মত হন, কিন্তু অমর মাণিক্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাকে করপ্রদ করিলেন। এই সংগ্রাম সময়ে ভুলোয়াপতির একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিহত হওয়াতে অমরমাণিক্য যার পর নাই দুঃখিত হইয়া হত্যাকারীকে শাস্তি দিবার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

তৎকালে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্য ইহা শ্রবণ করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য এই স্থান আক্রমণ ও অধিকার করেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে সেই স্থান লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য ধন এবং বহুসংখ্যক লোককে দাসরূপে বন্দী করিয়া আনয়ন করেন। অমরমাণিক্য দীর্ঘিকা উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণদম্পতীদান ও "তুলা" প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরেশ কিয়ৎকাল মাত্র শান্তিভোগ করিয়াছিলেন। বিজাতীয় শত্রুদমন জন্য পুনরায় তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তা সেখ ইসলামখাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১০১৯ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। অমরমাণিক্য ইষাখাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বৃহৎ এক দল সৈন্যের সহিত তদভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ইষা খাঁ শত্রু সম্মুখীন হইয়াও সুসময়ের অপেক্ষায় বিপক্ষ আক্রমণে ক্ষান্ত রহিলেন। ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী এই সংবাদ শ্রবণে আরও এক দল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া লিখিলেন, তিনি এই পত্র পাইবার পর কাল গৌণ না করিয়া যেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় অমরমাণিক্যের রাজ্ঞীও ইষাখাঁকে পাদোদক প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইষা খাঁ তাহা গ্রহণ করিয়া শীঘ্র শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। ইষা খাঁ রাজ্ঞীর স্নেহসূচক বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সেই পাদোদক গ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্যকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও অল্পমাত্র পদাতি লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। মুসল-মানেরা প্রথম উদ্যমেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইষা খাঁ জয়ী হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই তাঁহাকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়াছি-

লেন। কথিত আছে তৎপরে উদয়পুরে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, এবং মহারাজ অমর মাণিক্য তন্নিবারণ জন্য একটি নরবলি দিয়াছিলেন।

মহারাজ অমর মাণিক্য তাম্রশাসন দ্বারা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর রূপে চতুর্দ্দশ খানা গ্রাম দান করেন। তিনি মৃগয়া উপলক্ষে সরাইল গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সরাইলের দক্ষিণ দিগস্থ বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অমর মাণিক্যের অনুমত্যনুসারে তৎপুত্র রাজধর বেয়াল্লিশ নামক নগর সংস্থা- 'পণ করেন। মুসলমানেরা সেই বেয়াল্লিশ নগরকে সুলতান-পুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি সরাইল পরগণার দক্ষিণাংশ "তপে বেয়াল্লিশ" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে।

অমর মাণিক্য পুনরায় অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়া আরাকান আক্রমণ করেন এবং ক্রমশঃ কয়েকটী স্থান অধিকার করেন। অনন্তর আরাকানপতি পুনঃ পুনঃ পরা-জিত হইয়া পর্ত্তুগিজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যবলে ত্রিপুরেশকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি পরাজিত হইলেন। কিন্তু তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন না; পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। আরাকানপতি আগামী বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তাঁহাতে সম্মত

হইয়া তৎকালে সৈন্যগণের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইবার অব্যবহিত পরে সংবাদ পাইলেন যে, আরাকানপতি স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। ত্রিপুরাপতি আশু তাহার প্রতিহিংসা লওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। তিনি স্বয়ং ক্লান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার তিন পুত্রকে বৃহৎ একদল সৈন্যের সহিত প্রেরণ করিলেন। ত্রিপুর সৈন্যগণ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে আরাকানপতি ভয় প্রযুক্ত পুনর্ব্বার সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তৎসহ একটি বহুমূল্য রত্ন-খচিত গজদন্ত নির্ম্মিত রাজমুকুট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

যে একতাশূন্য হইয়া সোণার ভারত ছারখার হইয়াছে, যে একতাহীনতায় আমাদিগকে যবন পদানত হইতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একতা অমরের কুমারদিগের মধ্যে তিরোহিত হইল। একতাশূন্য হইয়া কুমারগণ যে কেবল চট্টগ্রামাদি হারাইয়াছিলেন এমত নহে, তাহাতেই ত্রিপুরার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। কুমারেরা সকলেই মুকুট গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিলেন। আরাকানপতি এই সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া পরমাহ্লাদিতচিত্তে ত্রিপুর সৈন্য আক্রমণ করেন। কুমারদিগের মধ্যে ঐক্য না থাকায় তাঁহারা সহজেই পরাজিত হইয়া দুই জন সসৈন্যে পলায়ন করিলেন এবং একজন স্বীয় বাহন হস্তী

কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। মগেরা পলায়িত ত্রিপুর কুমারদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কুমারেরা আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া পুনর্ব্বার মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সেইবারেও তাঁহারা অশ্বারোহিগণের অবাধ্যতায় পরাজিত হন। মগেরা রণমদে মত্ত হইয়া ত্রিপুর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, অবশেষে রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হইল। তাহাতে অমরমাণিক্য নিতান্ত ভীত হইয়া মনু নদীর তীরস্থিত তেতৈয়া নামক স্থানে পলায়ন করিলেন।* মগেরা পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে অবাধে উদয়পুর লুণ্ঠন এবং ত্রিপুরার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল। †

* তেতৈয়ার প্রান্তবাহিনী স্রোতস্বতী অধুনা খোয়াই নামে পরিচিত।

† আমরা বাল্যকালে এই সময়ের একটি গ্রাম্যগীতি শ্রবণ করিয়াছি, তাহার যে দুই একটি পদ অদ্যাপি স্মরণ রহিয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি,—

রাজা ভাগল থাইলারে।
উদয়পুরের সিংহাসন কারে দিলারে।
পানি'ত্ কাঁদে পানিখাউরি,
শুকনায় কাঁদে উদ।
উদয়পুরের গোয়ালে কাঁদে,
কারে দিবাম দুধ॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অমর মাণিক্য রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা চিন্তা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি মনু নদীর জলে স্নাত হইয়া অহিফেন ভক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রধান মহিষী সহমৃতা হইলেন।

১০২১ ত্রিপুরাব্দে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে) অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ দিগকে অপরিমিত ভূমি দান করাতে অমাত্যগণ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন "শেষ অবস্থায় আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে।" রাজধর সমরোৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া কেবল দৈবকার্য্যে লিপ্ত হইলেন। তিনি একটি উৎকৃষ্ট বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে সর্ব্বদা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তিনি আটজন গায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে হরি সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করাইত।

বঙ্গীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তা রাজধর মাণিক্যের এইরূপ অবস্থা শ্রবণে, ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মন্ত্রী এবং সৈনিকগণের পরাক্রম ও অধ্যবসায়ে মুসলমানেরা পরাজিত হইল। রাজধর ৩ বৎসর মাত্র রাজ্যশাসন করিয়া, গোমতী নদীর জলে নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

১০২৩ ত্রিপুরাব্দে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) রাজধরের পুত্র যশোধর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে মগদিগের উৎপাত নিবারণ জন্য অস্ত্রধারী হইতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহাকে আব এক ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তাঁহার নিকট কয়েকটি হস্তী ও অশ্ব রাজকর স্বরূপ চাহিয়া পাঠান। রাজধর করদানে অসম্মত হইলেন। সম্রাট তদ্বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাকে অনুমতি করিলেন। মোগল সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করিল। মহারাজ যশোধর মাণিক্য পরাভূত হইলেন। মোগলেরা তাহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ এবং লুণ্ঠন দ্বারা ত্রিপুরার রাজ কোষ শূন্য এবং প্রজাগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করিল। যশোধর দিল্লীতে উপস্থিত হইলে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মুক্ত করিয়া এই বলিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য প্রদান করেন যে, তিনি করস্বরূপ প্রতি বৎসর কেবল কতিপয় হস্তী এবং অশ্ব প্রদান করিলেই তদ্বিরুদ্ধে আর কোন যুদ্ধাদি হইবে না। কিন্তু যশোধর স্বীয় রাজ্যের দুরবস্থা চিন্তা করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি তীর্থ পর্য্যটনে কৃতসংকল্প হইয়া প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিষ্ণু উপাসনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে মোগলগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার পূর্ব্বক তাহার বন্দোবস্ত ও রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন। যে সকল পরগণা সামন্ত নরপতি কিম্বা জমিদারদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল তাহা ত্রিপুরা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। কয়েকটি পরগণায় মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করা হয়। তদ্ব্যতীত যে সকল স্থান মহারাজের খাসদখলে ছিল, মোগলগণ তাহাকে "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক নুরনগর মেহেরকুল, প্রভৃতি চারিটি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তাহার বার্ষিক রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা অবধারণ করেন। প্রায় দুই বৎসর কাল তাঁহারা এইরূপ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র শাসন করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মহারাজ যশোধর মাণিক্যের অভিপ্রায় অনুসারে কল্যাণ কা, "কল্যাণ মাণিক্য" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন। (১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে) আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার পিতার নাম অবগত হইতে পারিলাম না। রাজমালা গ্রন্থে তাঁহাকে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গগনফার বংশধর লেখা হইয়াছে। প্রাচীন বংশাবলিসমূহে তাঁহাকে যশোধর মাণিক্যের "জ্ঞাতি ভ্রাতা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কল্যাণ মাণিক্যের জন্ম সম্বন্ধে আমরা যে একটি প্রবাদ অবগত আছি, তাহাও বিস্ময়জনক। কথিত আছে, তাঁহার পিতা একদা কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া জন্য বনে গমন করেন। অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে করিতে স্বীয় অনুচরবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পলায়িত মৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু মধ্যাহ্নকালীন প্রখর সূর্য্যকিরণে তাঁহার পিপাসা প্রবল হইল। তিনি ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে করিতে এক বাছাল * প্রজার গৃহে উপস্থিত হইয়া জলপান পূর্ব্বক শান্ত হইলেন বটে কিন্তু সেই পরিবারের একটি বিধবা যুবতিকে দর্শন করিয়া কাম-বিমোহিত হইলেন। যুবতিও রাজ-বংশীয় যুবক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া সহর্ষচিত্তে তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিলেন। সেই সহযোগে ত্রিপুর কুলরত্ন মহাত্মা কল্যাণ মাণিক্য জন্মগ্রহণ করেন। বাছালেরা আজিও এই প্রবাদটির উল্লেখ করিয়া আপনাদের গৌরব করিয়া থাকে।

ইদানীন্তন ভূপতিগণ মধ্যে কল্যাণমাণিক্য একজন পরাক্রান্ত ও বলশালী নরপতি ছিলেন। কিন্তু অমর মাণিক্যের পুত্রগণ আরাকান যুদ্ধে একটি মুকুটের জন্য বিরোধ করিয়া যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিতে

---

* পূর্ব্বতন কিরাত বা বর্ত্তমান ত্রিপুর জাতির মধ্যে বাছাল নামে একটি সম্প্রদায় আছে।

পারেন নাই। ভবিষ্যতে কেহ পারিবে বলিয়াও আমরা আশা করিতে পারি না। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বেই ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা খর্ব্বীকৃত হয়। পশ্চিম দিগে মুসলমানগণ অনেকগুলি পরগণা অধিকার করিয়া তাহা স্থায়ী রূপে মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বাহুবল সম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার ছিন্ন ভিন্ন সৈন্য সমূহ একত্রিত করিয়া সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য মোগলগণকে দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার খর্ব্বীকৃত ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরারাজ্য তিনি অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসন কালে সৌরমণ্ডল * উপকুলের ওলন্দাজ গবর্ণর বান ডিন ব্রেকে লিখিয়াছেন :—

"ত্রিপুরা এবং উদয়পুর রাজ্য স্বাধীন, কিন্তু কোন সময় মোগল সম্রাট, কখন বা আরাকান রাজ ইহা অধিকার করিয়াছেন।"†

* সৌর মণ্ডল হইতে ছৌরমণ্ডল। বাঙ্গালি ভূগোল বেত্তৃগণ ইংরেজি C অক্ষরকে "ক" স্থির করিয়া সেই সৌর মণ্ডলকে "করমণ্ডল" করিয়া ফেলিয়াছেন।

† The countries of Oedapur and Tipera are sometimes independent, sometimes under the Great Mogúl and sometimes even under the king of Arakan. (Van den Broucke.)

বান ডিন ব্রোকের কৃত মানচিত্রে পর্ব্বত ও অরণ্যময় ত্রিপুরা রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। * কিন্তু উক্ত মানচিত্র দ্বারা তদানীন্তন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা রেখা বিশুদ্ধ রূপে নির্দ্দেশ করা নিতান্ত দুরূহ। ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে বিশুদ্ধভাবে "ভুলোয়া" চিত্রিত রহিয়াছে। আরাকান ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে "কোডাবাস্কাম" নামে আর একটি রাজ্য চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকে আমরা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম নির্ণয় করিতে পারি। ত্রিপুরার পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব তীরে "অস্থই" এবং "উদিসি" নামে দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য চিত্রিত রহিয়াছে। উক্ত "অস্থই" এবং "উদিসির" প্রকৃত নাম নির্ণয় করা অধুনা সুকঠিন। আমাদের বিবেচনায় এই দুইটী স্থান আধুনিক ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ ও ঢাকা জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশ অনুমিত হয়।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য "হরগৌরী" নাম স্বীয় নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক রাজকুমারদিগকে "ঠাকুর" আখ্যা প্রদান করেন। অদ্যাপি ত্রিপুর রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সেই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহার এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার নাম গোবিন্দদেব

* T Ryk Van Tipera.

ঠাকুর। তাঁহার অভিষেকের পর তিনি যে রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহার গর্ভে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হন, তাহার নাম "নক্ষত্ররায়" বা "নক্ষত্র ঠাকুর"। তাঁহার তৃতীয় পুত্রের নাম জগন্নাথ ঠাকুর এবং চতুর্থ পুত্র রাজবল্লভ ঠাকুর। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদেব ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কল্যাণ মাণিক্যের শাসনকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু কল্যাণ মাণিক্যের বাহুবলে মোগলগণ পরাজিত ও ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণ এবং দুঃখী প্রজাগণকে বাসনানুরূপ ভূমি ও অর্থদান করিয়াছিলেন। তিনি তাম্রশাসন দ্বারা অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত কয়েকখণ্ড তাম্রশাসন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পরিশিষ্টে তাম্র শাসনের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য "কল্যাণসাগর" নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি কৈলারগড় দুর্গমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহবাহিনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা ভগবতী মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। ঐ প্রতিমার নিম্নভাগে একটি শিবলিঙ্গ ক্ষোদিত থাকায় কালী মূর্ত্তি বলিয়া

আখ্যাত হয়। * এই দেবীর সুদৃঢ় ইষ্টক মন্দির দুর্গমধ্যস্থিত উচ্চভূমিতে অবস্থিত। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ ক্ষোদিত লিপিতে আমরা "সং ১০৯৭" প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ কল্যাণমাণিক্য ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপরবর্ত্তী ৩০ বৎসরে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এই মন্দিরের গঠন প্রণালী উল্লেখ যোগ্য বটে। ইহার চতুষ্কোণ প্রাচীরের পরিসর চতুর্দ্দিকেই ৪ হস্ত এবং মধ্যস্থান ৪ হস্ত. সুতরাং উভয়ই, দৈর্ঘ্য ও পরিসর দ্বাদশহস্ত পরিমিত।

এই মন্দির নির্ম্মাতা যে যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ ছিলেন, মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। দুর্গের পশ্চাৎভাগে অনন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার সম্মুখভাগে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। দূরবীক্ষণ কিম্বা চক্ষু দ্বারা যতদূর দৃষ্টি সঞ্চালিত হয় তত্তাবৎ সমতলক্ষেত্র করতলস্থ রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র হইতে এই মন্দির কিম্বা দুর্গ কিছুমাত্র লক্ষ্য হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে হুসন সাহেবকৃত বিজয়নদীর

---

* তদন্তে দুর্গমধ্যে চ স্থাপয়মাস কালিকাং॥
সংস্কৃত রাজমালা।

তীরস্থিত যে সেনানিবাস ও গড়ের উল্লেখ করিয়াছি এই মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে অদ্যাপি তাহা বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মন্দিরের গাথুনি এরূপ সুদৃঢ় যে দূরস্থিত কামানের গোলাতে তাহা সহজে বিনষ্ট হইবার নহে। মন্দিরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে তিনখানি ক্ষোদিত প্রস্তর লিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। উত্তর পার্শ্বের শিলালিপিতে যে কয়েকটি অক্ষর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে। পূর্ব্বপার্শ্বের লিপিখণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের শিলালিপির অন্তভাগে কেবল "স ১০৯৭" অক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে, অবশিষ্ট সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। উক্ত দেবতার সেবা পূজা নির্ব্বাহ জন্য পঞ্চদ্রোণ ভূমি দেবোত্তর প্রদান পূর্ব্বক কল্যাণ মাণিক্য "শাণ্ডিল্য" গোত্রজ বিশ্বনাথ শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি সেই দেবোত্তর ভূমি ভোগ করিয়া দেবীর সেবা পূজা নির্ব্বাহ করিতেছেন। *

জেলা ত্রিপুরার মধ্যে ৪ থানা গ্রাম মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের নামানুসারে "কল্যাণপুর" আখ্যায় পরিচিত।

---

* বিশ্বনাথ শর্ম্মার ষষ্ঠ উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণ বিশ্বনাথের ষষ্ঠ ও সপ্তম উত্তর পুরুষ জীবিত আছেন।

স্থলতান স্থজার বাঙ্গালা শাসনকালে (১৫৮০ শকাব্দে) স্থবে বাঙ্গালার যে সংশোধিত রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সরকার উদয়পুর সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় চরমাবস্থায় কল্যাণ মাণিক্য কিয়ৎপরিমাণে মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ গোবিন্দদেব ঠাকুর ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করেন। তিনিও কিয়ৎপরিমাণে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্যের সিংহাসন আরোহণে তৎকনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ নিকট যে রাজমালা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে,"স্থলতান স্থজার সাহায্যে উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া কুমার নক্ষত্র রায় গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।" গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতার অভিলাষ শ্রবণে বিবেচনা করিলেন, রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে হয় ভ্রাতৃশোণিতে পৃথিবী রঞ্জিত করিতে হইবে, নতুবা সমরানলে স্বীয় প্রাণ আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অতএব বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমত রিয়াংদিগের বাসস্থানে এবং তদনন্তর চট্টগ্রামের পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নক্ষত্র রায় স্থজার অধীনতা স্বীকার করত ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ পূর্ব্বক

সিংহাসন আরোহণ করেন।" কিন্তু নক্ষত্র রায়ের বংশধরগণ নিকট যে রাজমালা রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে লিখিত আছে যে, "নক্ষত্র রায় ভীষণ যুদ্ধে গোবিন্দমাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করেন।" এস্থলে কোন্ রাজমালার বর্ণনা সত্য, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইলেও ভারতের তদানীন্তন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া নক্ষত্ররায়ের বংশধরগণের নিকটে রক্ষিত রাজমালার উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।* ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ যে, নক্ষত্র ও জগন্নাথের বংশধরগণকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ মধ্যে যাঁহারা বাহুবলে কিম্বা কৌশলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ সেই সকল মহাপুরুষের চরিত্র নিতান্ত বিকৃতভাবে ইতিহাসপটে চিত্রিত করিয়াছেন।

কুমার নক্ষত্র "ছত্রমাণিক্য" নামগ্রহণ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে ত্রিপুররাজ-দণ্ডধারণ করেন। ১০৭০ ত্রিপুরাব্দে

* যে সময়ে সুলতান সুজার আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল, সেই সময় তিনি কিরূপে অন্য ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? সুতরাং নক্ষত্র রায় যে স্বীয় বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই সত্য।

তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার একটী রৌপ্য মুদ্রার প্রতিকৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠায়—"শ্রীশ্রীহরগৌরী পদে মহারাজ শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্য দেব" এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটী সিংহ ও তাহার নিম্ন ভাগে "শকাব্দা ১৫৮২" ক্ষোদিত রহিয়াছে। তাহার শাসনকালে ফরাসী দেশীয় দুইজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী ভারতের অন্তর্গত বিবিধস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহার নাম বর্ণিয়ার। দ্বিতীয় ব্যক্তি ফরাসীদেশীয় সম্ভ্রান্ত (ব্যরণ) বংশীয় বণিক, তাঁহার নাম জন ব্যাপ্‌টিষ্টা টেবার্ণিয়ার। আমরা টেবার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে ত্রিপুরেশ্বর "মহারাজ ছত্রমাণিক্যের' নাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি। টেবার্ণিয়ার বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান নামক তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যের সহিত সংযুক্ত। টেবার্ণিয়ার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য হইতে স্বর্ণ ও তসর বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য সমুৎপন্ন স্বর্ণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। *

মহারাজ ছত্রমাণিক্য যৎকালে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন, সেই সময় আর এক ভীষণ ভ্রাতৃবিরোধ দ্বারা সমগ্র ভারতভূমি নরশোনিতে রঞ্জিত হইতেছিল।

* Tavernier's Travels in India, p. 156.

মোগল সম্রাট সাহজাহানের দুর্ব্বিনীত পুত্রগণ পিতার বর্ত্ত-মানেই পৈত্রিক ময়ূরাসন অধিকার করিবার জন্য সমগ্র ভারত ব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখক ও ফরাসী ভ্রমণকারীগণ উল্লিখিত যুদ্ধ বৃত্তান্ত পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি একজন দয়ালু, প্রজা প্রিয় শাসন-কর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। * তাঁহার মহিষী পরিভানুর অসাধারণ বুদ্ধি গৌরব ও অত্যু-জ্জ্বল রূপরাশির খ্যাতি ইতিহাস পটে চিত্রিত রহিয়াছে। রাজ্ঞী পরিভানুর গুণ-গীতি দীর্ঘকাল বঙ্গের সর্ব্বত্র পরি-কীর্ত্তিত হইত। কিন্তু এক্ষণ সেই সকল গ্রাম্যগীতি বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আওরংজেব ও মুরাদবক্সের সম্মিলিত সৈন্যের বাহু বলে সোমনগরের (ফতেয়াবাদ) যুদ্ধে যেরূপ ধূর্ত্ত আওরংজেব দারার সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আলাহা-বাদের ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী কিরগাঁর যুদ্ধে শঠচূড়ামণি আওরং-জেব, তাঁহার পাপিষ্ঠ সেনাপতি মিরজুম্লার বুদ্ধিবলে, সুলতান সুজার রাজ-মুকুট লাভাশা চিরকালের তরে বিনাশ

* Dow's History of Hindostan. Vol. III. p 354.

করিতে সক্ষম হন। কিরগাঁর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা মুঙ্গেরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরংজেবের সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া তিনি মুঙ্গের হইতে রাজমহলে এবং তথা হইতে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী তাঁড়া নগরে; * তদনন্তর তাঁড়া হইতে ঢাকা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আওরংজেবের সেনাপতি মিরজুম্লা ঢাকা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এই সংবাদ শ্রবণে সুলতান সুজা সার্দ্ধেক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত ত্রিপুরা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া আরাকানে গমন করেন। কিন্তু বর্ণিয়ার বলেন যে, সুজা অর্ণবপোতারোহণে ঢাকা হইতে আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। † মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের মতে, সুলতান সুজা ব্রহ্মপুত্র নদী পার হইয়া রাঙ্গামাটীয়ার (ত্রিপুরার) পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। ‡ আমাদের বিবেচনায় এস্থলে বর্ণিয়ারের বর্ণনা অপেক্ষা মুসলমানদিগের লিখিত বৃত্তান্ত সমধিক প্রত্যয়োপযোগী। সুজা ত্রিপুরা পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ

* এই তাঁড়াকে ইংরেজ লেখকগণ Tanda এবং বাঙ্গালী লেখকগণ তণ্ডা করিয়া ফেলিয়াছেন।

† Bernier's Travels in the Mogul Empire, Vol. I., p. 120.

‡ Dow's History of Hindostan, Vol. III., p. 348.

করিয়া সম্রাট আওরংজেব ত্রিপুরেশ্বর সমক্ষে বন্ধুভাবে একখণ্ড পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই পত্রে মোগল সম্রাট ত্রিপুরার স্বাধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন যে, ত্রিপুরেশ্বর বন্ধুর ন্যায় আমার শত্রুকে স্বীয় শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবেন এবং তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার শত্রু সুজাকে ধৃত করিয়া স্বীয় সৈন্য দ্বারা মুঙ্গেরের দুর্গে প্রেরণ করিলে নিতান্ত উপকৃত হইব। কিন্তু এই পত্র ত্রিপুরায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সুলতান সুজা আরাকানে উপনীত হইয়াছিলেন।

সিংহাসন চ্যুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিলেন।* সুজা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটী হইতে পর্ব্বত

* গোবিন্দ মাণিক্যের বাস ভবনের চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কমিশনর লেউইন সাহেব লিখিয়াছেন :—Far in the Jungles on the banks of the Myance, an affluence of the Kassalong River, are found tanks, fruit-trees, and the remains of masonry building,—evidence that at some bygone period, the land here was cultivated and inhabited by men of the plains. Tradition attributes this ruins to a former Raja of Hill Tipperah who, it is said, was driven from that part of the country.

Lewin's Hill Tracts of Chittagong, page 6.

শ্রেণী অতিক্রম করত গোবিন্দ মাণিক্যের বাসভবনে উপনীত হন। * গোবিন্দ মাণিক্য সুজাকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন, এবং তিনি তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করিতে ক্রুটী করেন নাই। বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় ব্যবহার্য্য বহুমূল্য “নিমচা” তরবারি ও একটি হীরকাঙ্গুরীয় গোবিন্দ মাণিক্যকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্য সুজা আরকানপতি “সন্দ সু-ধর্ম্মের” আবাসে উপনীত হইলে রাজা সুজা-পুত্রীর রূপে বিমোহিত হইলেন। তিনি জনৈক অনুচর দ্বারা সুজার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা নিতান্ত ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। সুজার জীবিতাবস্থায় তাঁহার বাসনা পূর্ণ হওয়া দুষ্কর জানিয়া রাজা সন্দ সু-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন যে, সুজা কৌশলক্রমে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করিতে আসিয়াছেন, আশু তাঁহার প্রাণ বধ করা কর্ত্তব্য। বিনাযুদ্ধে রক্তপাত বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সুতরাং সুজাকে নৌকায় বন্ধন করিয়া জলমগ্ন করা হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী পরিভানু ও কন্যাদ্বয় আত্মহত্যা দ্বারা পামরের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সুজার তৃতীয়

* মতান্তরে আরাকাণের রাজসভায় গোবিন্দ মাণিক্যের সহিত সুজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কন্যা মগরাজ অন্তঃপুরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ণিয়ারের লেখা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুজা মৃত্যুকালেও স্বীয় বংশগৌরব রক্ষা করিয়া বীরের ন্যায় শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। যে পর্য্যন্ত তাহার অসি ধারণ ক্ষমতা তিরোহিত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত মগেরা তাহার নখাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সুজা আরকানরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া তথায় সুখে বাস করিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় শ্বশুরকে গোপনে বিনষ্ট করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আরকান রাজ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সুজাকে বধ করেন।

রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ ছত্রমাণিক্য "ছত্রসাগর" নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। এখন সেই দীর্ঘিকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তাঁহার নাম অনুসারে "ছত্রচূড়া" (ছাতাচূড়া) নামে পরিচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী "ছত্রেশ্বরী" ও চান্দিনা থানার অন্তর্গত "ছত্রকোট" ব্রাহ্মণবাড়িয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত ছত্রপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের নামকরণ যে তাঁহার নামানুসারে হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ বিখ্যাত

ত্রিপুর নৃপতি, রাজ্ঞী কিম্বা রাজপুত্র দিগের নামানুসারে বিবিধ স্থানের নামকরণ হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

গোবিন্দ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ রামদেব ঠাকুর ছত্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী আমতলী গ্রামে উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তুমুল সংগ্রামে যুবরাজ রামদেব ঠাকুর পরাজিত হন।

সম্ভবতঃ ৬ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ছত্রমাণিক্যপরলোক গমন করেন। গোবিন্দ মাণিক্য পুনর্ব্বার ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ছত্র মাণিক্যের পুত্র কুমার উৎসব রায় কাদবা, আমিরাবাদ প্রভৃতি পরগণা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দ মাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল বিশেষরূপে আবাদ হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গোমতীর জলপ্লাবনে তত্তীরস্থ শস্য ক্ষেত্র সর্ব্বদা বিনষ্ট হইত। তিনি "গাং আইল" নামক বাঁধ প্রস্তুত করিয়া শস্যক্ষেত্র রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। "গোবিন্দপুর নামে" ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহার অধিকাংশই মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময় সংস্থাপিত হয়। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য তাম্র শাসন দ্বারা ব্রাহ্মণ দিগকে বিস্তর নিষ্কর ভূমি

দান করিয়াছিলেন। আমরা তাহার অনেকগুলি তাম্র শাসন দর্শন করিয়াছি। তাম্র শাসন গুলি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। দুই খণ্ড তাম্র শাসনের পাঠ পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইবে।*

চন্দ্রনাথের শিবমন্দির গোবিন্দ মাণিক্যের একটী প্রধান কীৰ্ত্তি। তাঁহার অনুমত্যনুসারে উজির বিশ্বস নারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস তাহা নির্ম্মাণ করেন। ভূমিকম্প দ্বারা সেই মন্দির বিচূর্ণ হইয়া পর্ব্বত গহ্বরে সমাহিত হইয়াছে।

কসবা থানার অধীন জাজীয়াড়া গ্রামে তাহার মহিষী গুণবতী দেবী যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "গুণসাগর" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। জগন্নাথ দীঘি থানার অধীন বাতিসা গ্রামে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন তিনি আরও অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ ১০৭৯ ত্রিপুরাব্দে গোবিন্দ মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন।

রাজমালা লেখক বলেন, মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য স্বজার নিমচা তরবারী বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। গোমতী নদীর তীরে কুমিল্লা নগরীতে "সুজা মসজিদ" নামক একটি ইষ্টক নির্ম্মিত বৃহৎ মসজিদ অদ্যাপি

* উক্ত তাম্র শাসন সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য সেই স্থলে প্রকাশ করা হইবে।

দৃষ্ট হইয়াথাকে। এই মসজিদ সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়:—(১) সুজা ত্রিপুরা জয় করিয়া বিজয় বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (২)—মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিমচা তরবারী ও হীরকাঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অপেক্ষা প্রথমোক্ত প্রবাদ সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তর ফলক সংযুক্ত ছিল। জনৈক প্রাচীন মুসলমান নিকট আমরা এরূপ শ্রুত হইয়াছি যে, অর্দ্ধ শতাব্দী কিম্বা ততোধিক কাল পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ সরকারী জনৈক দেওয়ান "ওয়াকৃফ" সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য গোপনে সেই প্রস্তর ফলকখানা উৎপাটন করিয়া গোমতীজলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কুমিল্লার অন্তর্গত "সুজানগর" নামক পল্লী সেই মসজিদের "ওয়াকৃফ" সম্পত্তি বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।

গোবিন্দ মাণিক্য যৎকালে ছত্রমাণিক্য দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, তৎকালে তাঁহার মহিষীকে লইয়া উজির বিশ্বাস নারায়ণ বগাসাইর পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামবাসী "কুণ্ড" দিগের বাসভবনে লুক্কায়িত ছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য পুনর্ব্বার রাজদণ্ড ধারণ করিয়া কুণ্ডদিগকে

"চৌধুরী" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সেই পদের বৃত্তিস্বরূপ "নানকার" প্রদান করিয়াছিলেন।

কল্যাণমাণিক্যের পুত্রগণ মধ্যে গোবিন্দ মাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুর একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। যাঁহারা কুমিল্লা হইতে স্থল পথে চট্টগ্রামে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই সেই রাজপুত্রের অমর কীর্ত্তি "জগন্নাথ দীঘি" দর্শন করিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ কিঞ্চিদূন এক মাইল। কল্যাণ মাণিক্যের চতুর্থ পুত্রের নাম রাজবল্লভ ঠাকুর।

গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ রামদেব ঠাকুর ১০৮০ ত্রিপুরাব্দ "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করেন। তিনি মাইজখাড় গ্রামে একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি "রামসাগর" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। মহারাজ রাম মাণিক্য একজন ভ্রাতৃভক্ত নরপতি ছিলেন, এজন্য তিনি প্রথমতঃ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলিভীম নারায়ণকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করেন। তৎপর ক্রমে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রত্নদেব ঠাকুরকে যৌবরাজ্যে এবং "বড়ঠাকুর" নামে একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয় পুত্র দুর্জ্জয়দেব ঠাকুরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ রাম মাণিক্য নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শী

নরপতি ছিলেন। প্রথমতঃ স্বীয় শ্যালককে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করা, দ্বিতীয়তঃ "বড়ঠাকুরী" পদ সৃষ্টি করিয়া রাজ পরিবার মধ্যে অনন্ত কলহের বীজ বপন করা নিতান্তই নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শিতার কার্য্য হইয়াছিল। শ্যালককে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা জগতের ইতিহাসে একটী নূতন দৃষ্টান্ত বটে।

রাজ পরিবার মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মহারাজ রাম মাণিক্য কে সিংহাসন চ্যুত করিবার জন্য বাঙ্গালার মোগল শাসন কর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যুবরাজ রত্নদেব এবং বড় ঠাকুর দুর্জ্জয় দেবব্যতীত ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি নামক আর দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া রাম মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন।

জিলা ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা রাজ্য মধ্যে রামপুর নামে ৩৮ খানা ও রামনগর নামক ১৭ খানা গ্রাম বর্ত্তমান আছে। ইহার অধিকাংশ গ্রামের নাম করণ যে মহারাজা রাম মাণিক্যের নাম অনুসারে হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

পিতার মৃত্যুর পর মহারাজ রত্ন মাণিক্য (দ্বিতীয়) ১০৯২ ত্রিপুরাব্দে (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র ছিল।

সেই সুযোগে তাঁহার পিতৃব্য নরেন্দ্র মাণিক্য তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া রাজ্য দণ্ডধারণ করেন। কিন্তু অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কাল কবলিত হন। তদনন্তর ১০৯৪ ত্রিপুরাব্দে রত্ন মাণিক্য পুনর্ব্বার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার চারিজন যুবরাজ ছিল। তিনি স্বীয় মাতুল বলিভীম নারায়ণকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া স্বীয় অনুজ দুর্জ্জয় দেবকে এবং তদনন্তর রাজ বংশজ গৌরীচরণ ও চম্পক রায়কে যুবরাজের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি স্বীয় দ্বিতীয় অনুজ চন্দ্রমণিকে বড় ঠাকুরী পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজ রত্ন মাণিক্য এবং তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ দুর্জ্জয় দেব ও বড় ঠাকুর চন্দ্রমণি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় বয়োপ্রাপ্ত যুবরাজ বলিভীম নারায়ণ, গৌরীচরণ, ও চম্পক রায় রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকে এক এক প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন। নুরনগর পরগণা ও তৎসন্নিহিত স্থানের শাসন ভার যুবরাজ চম্পক রায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়া ছিল। চম্পক রায়ের মোহরাঙ্কিত সনন্দ নুরনগরের তালুকদার বর্গের নিকট সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। *

মহারাজ রত্ন মাণিক্য বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নুরনগরের "জমিদার ও তালুকদার" প্রভৃতির প্রতি ১১০৫ ত্রিপুরাব্দের ১১ই বৈশাখে

* এরূপ অনেকগুলি সনন্দ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি।

এক খণ্ড ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহার এক খণ্ড নিতান্ত জীর্ণ অবস্থায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার প্রতিলিপি পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। এই ঘোষণা পত্রের শীর্ষদেশে ভগবান নারায়ণের মূর্ত্তি এবং সেই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটি রমণী মূর্ত্তি চিত্রিত, রহিয়াছে। সনন্দ সমূহের শীর্ষভাগে কোন দেব মুর্ত্তি উৎকীর্ণ কিম্বা চিত্রিত করার প্রথা ভারতে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। কোন কোন প্রাচীন তাম্র শাসনের শীর্ষভাগে ভগবতী মুর্ত্তি কিম্বা গরুড় বাহন নারায়ণ মূর্ত্তি অথবা অন্য কোন দেবমূর্ত্তি চিত্রিত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। *

* গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের মুদ্রার শীর্ষদেশে কেবল গরুড় মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। (J. A. S. B., Vol. LVIII. Part I. plate VI.) মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের মুদ্রার শীর্ষদেশে মহাদেবের প্রিয় বাহন "বৃষভ" মুর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। (C. I. I. Vol. III. p. 231). নেপালের শৈব নরপতিগণের ক্ষোদিত লিপি সমুহের শীর্ষে "বৃষভ" মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। (Inscriptions' From Nepal. Nos. 7, 12.) কোন কোন ক্ষোদিত লিপিতে ভগবান নারায়ণের আদি অবতার "মৎস্য" মুর্ত্তি উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। (Inscriptions from Nepal. No. 9) গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন দেবের তাম্রশাসনের শিরোভাগে ভগবতী মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এবম্প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মহারাজ রত্নমাণিক্য স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। মেজর ষ্টুয়ার্ট স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, "যদিচ ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের বাহুবলে ত্রিপুরা লুণ্ঠিত ও বিজিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরেশ্বর স্বাধীন ছত্র ধারণপূর্ব্বক স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচার করিতেছিলেন। ১৭০৭-৮ খৃষ্টাব্দে (১১১৮ ত্রিপুরাব্দে) ত্রিপুরেশ্বর নবাব মুরসিদকুলী খাঁর প্রবল বিক্রম কাহিনী শ্রবণে তাঁহাকে গজ ও গজদন্ত প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করেন। তদ্বিনিময়ে নবাব ত্রিপুরেশ্বরকে "খেলাত" প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ত্রিপুরাপতি নবাবকে যেরূপ উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন নবাব ও তদ্রূপ তাঁহাকে "খেলাত" প্রদান করিতেন। *

মহারাজ রত্নমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বদিকে "সতর রত্ন" নামক এক প্রকাণ্ড ও অতি উচ্চ দেব মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তিনি ১২০টি বিবাহ করেন, কিন্তু তাহার কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। ১১২২ ত্রিপুরাব্দে কুমার ঘনশ্যাম রত্নমাণিক্যকে বধ করিয়া ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যাভিষেক কালে ঘনশ্যাম "মহেন্দ্রমাণিক্য' আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিদূন দুই বৎসর

* Stewart's History of Bengal. page 233.

মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া মহেন্দ্র মাণিক্য কাল কবলিত হন। *

ত্রিপুরা রাজ্য ও জেলা ত্রিপুরার মধ্যে ১২ খানা গ্রাম রত্ননগর ও রতনপুর নামে পরিচিত। এই সকল গ্রামের নামাকরণের সহিত অবশ্যই মহারাজ রত্ন মাণিক্যের কোন রূপ সংশ্রব আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

১১২৪ ত্রিপুরাব্দে (১৭১৪ খৃষ্টাব্দে) যুবরাজ দুর্জ্জয়দেব "ধর্ম্ম মাণিক্য" (দ্বিতীয়) নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন। ইহার অল্পকাল পরে বাঙ্গালার নবাব ধর্ম্ম মাণিক্যকে পরাজিত করিয়া পর্ব্বতের উপত্যকস্থ সমতলক্ষেত্র অধিকার পূর্ব্বক তাহাতে মোগলবংশীয় জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলগণ দীর্ঘকাল এই সুবিধা ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করত ধর্ম্ম মাণিক্য অধিকাংশ

* মহেন্দ্র মাণিক্যের গুণানুবাদমূলক ৫টি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহা তাঁহার সমসাময়িক কোন কবির রচনা। পরিশিষ্টে সানুবাদ সেই সকল শ্লোক মুদ্রিত হইবে। কবি, মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্যকে দানে কল্পতরু, সৌন্দর্য্যে কন্দর্প, পাণ্ডিত্যে সুরগুরু বৃহস্পতি অথবা মহাদেব, কীর্ত্তিতে নারায়ণ এবং কুবের সদৃশ ধনবান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মোগল জমিদারকে দূরীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরাপতির সহিত যে সন্ধি করেন, সেই সন্ধিদ্বারা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য কেবল নুরনগর পরগণার জন্য বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা কর প্রদান করিতে বাধ্য হন। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে, নুরনগরের তালুকদারগণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নবাব যে জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই মহারাজের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক জমিদারি স্বরূপ সেই পরগণা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু মোগল সম্রাট স্বয়ং নুরনগরের বার্ষিক রাজস্ব উক্ত টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দিয়াছিলেন।*

অমরমাণিক্যের শাসনকালে "ভুলোয়া" রাজবংশজ রাম রতন (সুর) রায় মেহেরকুল পরগণার অধীন দুর্গাপুরগ্রামে উপনিবিষ্ট হন। সেই রামরতনের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রামবল্লভ

* The son of Ram Manik Raja zeminder of Tipperah for a while appears to have been wholly shaken off the Mogul Yoke virtually, being only liable to a nominal tribute of 25000 rupees for the perganah of Noornagar, which at the same time. was entirely remitted to himself, in the form of a military Jaigeer from the court of Delhi.

Grant's View of the Revenues of Bengal.
(Fifth Report. page 395—96.)

রায়কে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য "চৌধুরাই" নানকার প্রদান করেন। *

১১৩২ ত্রিপুরাব্দে (১৭২২ খৃষ্টাব্দে) নবাব মুরশিদকুলি খাঁ "জমা কামেল তুমারি" নামক যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, ত্রিপুরেশ্বরের অধিকৃত স্থান সমূহের সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত পক্ষে ইহার দশ বৎসর অন্তে ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের হিসাব ভুক্ত হইয়াছিল।

১১৪২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর বলদাখালের জমিদার আকা সাদে-কের † সাহায্যে ঢাকা নেয়াবতের সুবিখ্যাত দেওয়ান মির

* রামবল্লভ চৌধুরীর প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত পীতাম্বর চৌধুরী অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রদত্ত রামবল্লভ চৌধুরীর নামীয় ১১৩১ ত্রিপুরাব্দের ১৫ ফাল্গুনের (১৭২২ খৃষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি) ২ খণ্ড সনন্দ এবং তাঁহাদের একখণ্ড সুদীর্ঘ বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। রাম রতনের জ্যেষ্ঠ সন্তানের অধস্তন শাখার অষ্টম, নবম ও দশম পুরুষ এক্ষণ জীবিত আছেন। এই সম্ভ্রান্ত বংশের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

† আকা সাদেকের বাস ভবনের চিহ্ন অদ্যাপি থুল্লাগ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার নাম অনুসারে মেঘনাদের তীরবর্ত্তী একটি স্থান "আকা নগর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

হবিবের সহিত সম্মিলিত হন। মির হবিব ত্রিপুরা বিজয়ের উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিয়া স্বীয় প্রভু বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা "নবাব মতিমনউল্ মুল্ক, সুজা অদ্দিন মাহাম্মদ খাঁ সুজাঅদ্দৌল্লা, আসাদ জং বাহাদুর" সংক্ষেপে সুজাউদ্দিনের * অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া জগৎরাম ঠাকুরের সাহায্যে ত্রিপুরায় উপনীত হন। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী স্থানে ত্রিপুর সৈন্যের সহিত মির হবিবের যুদ্ধ হয়। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের উজির কমল নারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস সেই যুদ্ধে নিহত হন।† ধর্ম্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির হবিব জগৎরাম ঠাকুরকে "রাজা জগৎমাণিক্য" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজা

* রাজামালা গ্রন্থে কেবল নবাব "সুজা খাঁ" মাত্র লিখিত আছে।

† মির হবিব কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ঘোলনল গ্রামস্থিত কমল নারায়ণের বাস ভবন লুণ্ঠণ ও অগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। কমল নারায়ণের বাটীর পূর্ব্বদিকস্থ বৃহৎ পুষ্করিণী দ্বারা অদ্যাপি তাঁহার নাম সেই স্থানে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ঘোলনল ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণ অদ্যাপি তাহাকে "কমল নারায়ণের পুকুর" বলিয়া থাকে। উল্লেখিত দুর্ঘটনার পর কমলনারায়ণের দুইটি পুত্র পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরগণে নুরনগরের অন্তর্গত মাইজখাড় গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক পুত্রের বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

বলিয়া প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল মাত্র সমতলক্ষেত্র জগৎমাণিক্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রকে "চাকলে রোশনাবাদ" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক বার্ষিক ৯২৯৯৩ টাকা কর ধার্য্য পূর্ব্বক জগৎমাণিক্যকে জমিদারি স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। * কিন্তু উক্ত রাজস্ব

* তদাসীৎ ত্রৈপুরেরাজা ধর্ম্মমাণিক্য নামকঃ।
মহাবল মদোন্মত্ত দিল্লীশে ম দদৌকরং।
ততঃ সুজাখ্য যবনো দিল্লীশপ্রতি রূপকঃ।
জগন্মাণিক্য ভূপাল মসংখ্যৈ সহ সৈনিকৈঃ।
মহাবল পরাক্রান্তৈ স্ত্রৈপুরে সংন্যয়োজয়ৎ।
জগন্মাণিক্য ভূপাল স্ত্রৈপুরে সমুপস্থিতঃ।
অতীব তুমুলং কৃত্বা ধর্ম্মমাণিক্য ভূপতিং।
পরাজিত্যা ভবদ্রাজা ত্রৈপুরেশ মহাবলঃ।
সংস্কৃত রাজমালা।

A nephew of the Raja of Tipperah, having displeased his uncle, was banished the country. The youth took refuge with a Mohamedan Zemindar, named Aka Sadik, and entreated him to assist him in recovering the share of his inheritance. The Zemindar being intimately acquainted with Meer Hubbeeb, recommended the cause of the young man to him: and pointed out the favourable opportunity it offered of subjecting Tipperah to the Mohamedan arms.

মধ্যে পরগণে নূরনগরের বার্ষিক রাজস্ব ২৫০০০ টাকা দিল্লীর সম্রাটের পূর্ব্ব আদেশমত সামরিক জায়গীর এবং হস্তীধৃত করিবার খরচ বাবত ২০০০০ টাকা মোট ৪৫০০০ টাকা বাদে ৪৭৯৯৩ টাকা আদায়ী রাজস্ব নির্ণীত হয়। রাজা জগৎ মাণিক্যকে রক্ষা করিবার জন্য কুমিল্লা নগরে একদল মোগল সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। আকা সাদেক তৎকালে "ত্রিপুরার ফৌজদারের" পদে নিযুক্ত হন।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মির হবিব দ্বারা এইরূপ লাঞ্ছিত

Meer Hubbeeb, having represented the circumstances to his master, obtained permission to proceed with all the troops that were then in the vicinity of Dacca, to effect the object. The Mogul troops crossed the Burmapooter, and entered Tipperah before the Raja was aware of their intentions ; and having the young man with them whose cause they espoused, he pointed out to them the road by which they should advance. Aided by such a guide, they reached the capital before the Raja could make any preparation to oppose them : he was obliged to flee to the mountains ; and the nephew was raised to the Raj, upon condition of paying a large portion of the revenue to the Governor of Bengal.

(Stewart's History of Bengal. pp. 266, 267.

হইয়া মুরসিদাবাদে গমন করেন। তথায় তদনীন্তন জগৎ শেঠের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। শেঠের সাহায্যে মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য নবাব সুজাউদ্দিনকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। নবাব কেবল চাকলে রোশনাবাদের বার্ষিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব অবধারণ পূর্ব্বক জমিদারী স্বরূপ তাহা ধর্ম্ম মাণিক্যকে অর্পণ করিবার জন্য ঢাকার শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ প্রচার করেন; তদনুসারে মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের জন্য বাঙ্গালার নবাবের অধীনস্থ জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হন। ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ, আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, স্মরণাতীত কাল হইতে যে ত্রিপুরা স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিতেছিলেন; অদ্য তাহা মোগলদিগের পদানত হইল। * কিন্তু আমাদের হর্ষ-বিষাদের কারণ এই যে, তৎকালে পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যান্ত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও "পার্ব্বত্য ত্রিপুরা"কে "স্বাধীন ত্রিপুরা" বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

* The province of Tippera, which from time immemorial had been an independent kingdom, became annexted to the Mogul Empire.

Stewart's History of Bengal, p. 267.

মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য যৎকালে মুসলমানদিগের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন। সেই সময় মিতাই-(মণিপুর)-পতি পামহেইবা (করিমনওয়াজ) ত্রিপুরার উত্তর সীমান্তপ্রদেশরক্ষক সৈন্যদল আক্রমণ ও জয় করিয়া মিতাই রাজ্যের সীমারেখা দক্ষিণদিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। সামান্য কতকগুলি ত্রিপুরা সৈন্য জয় করিয়া মিতাইগণ এরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে, এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহারা পামহেইবাকে "তাখেলঙাম্বা" (বা ত্রিপুরা জয়ী) উপাধিতে বিভূষিত করিতে ক্রটী করেন নাই। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া মণিপুরিগণ একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম "তখেলংনম্বা" অর্থাৎ ত্রিপুরা বিজয়।

চরমাবস্থায় ধর্ম্ম মাণিক্য নিতান্ত বিমর্ষভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত দুর্ঘটনার পর তিনি অধিককাল জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নানা প্রকার ধর্ম্ম ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাণ করিতে ক্রটী করেন নাই। নিষ্কর ভূমির যে সকল কাগজের লিখিত প্রাচীন সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহার অধিকাংশই মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের অনুশাসন পত্র। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মহাভারতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করাইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা চন্দ্রমণি ফৌজদারের সাহায্যে "মুকুন্দ মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক

সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজমালা গ্রন্থের মতে ১১৪১ ত্রিপুরাব্দে মুকুন্দ মাণিক্য রাজ দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ১১৪৩ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্বে মুকুন্দমাণিক্যের অভিষেক কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই।

তৎকালে চাকলে রোশনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ৭৮৩০৫ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সামরিক জায়গীর ও হস্তীধৃত করিবার খরচ ২০০০০ টাকা মোট ৪৫০০০ হাজার টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩৩৩০৫ টাকা নিয়মিত বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে প্রতিভূ স্বরূপ * মুরশিদাবাদের দরবারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হাজি মুনসম নামক জনৈক মুসলমান ত্রিপুরার ফৌজদারের কার্য্যে নিযুক্তছিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রদত্ত একটি তালুকের মকররী সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। তৎ সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। †

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র "সুবা" রুদ্রমণি ঠাকুরকে মুকুন্দমাণিক্য হস্তী ধরিবার

---

* Hostage.

† সেই তালুক উজির কমল নারায়ণের পুত্র মায়ারামকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

জন্য মতিয়া নামক স্থানে প্রেরণ করেন। রুদ্রমণি তথায় বুচর নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকজন পরাক্রমশালী পার্ব্বত্য সরদারের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মুকুন্দ মাণিক্যকে লিখিলেন,—“ত্রিপুরাবাসিগণ যবনদিগের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা করে না। মহারাজের অনুমতি পাইলে তাহারা সশস্ত্রে উপস্থিত হইয়া ফৌজদার হাজি মুনসম ও তাহার অনুচরগণকে বধ করিবে।” মুকুন্দ মাণিক্য পত্র পাইয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলেন এবং রুদ্রমণিকে লিখিলেন, এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক; কারণ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরশিদাবাদে প্রতিভূ স্বরূপ রহিয়াছেন; ফৌজদারের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, নবাব তৎপ্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করিবেন। রুদ্রমণি ঐ পত্র পাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না; পুনর্ব্বার মুকুন্দ মাণিক্যকে লিখিলেন, “মহারাজ আমাদিগকে অবিলম্বে অনুমতি পাঠাইবেন, তাহা হইলেই আমরা ফৌজদারের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিব।” কিন্তু মুকুন্দ মাণিক্য কোনমতেই মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রুদ্রমণি ঠাকুরের লিখিত পত্র ফৌজদারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা মুকুন্দমাণিক্যের অনুকম্পায় যে পাপাত্মা হাজিমুনসমের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তিনি একবারও তাহা মনে করিলেন না। অধিকন্তু মহারাজকে বলিলেন, আপনি এ বিষয়

সংলিপ্ত আছেন, নতুবা আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিরা কখনও এমত অন্যায় কার্য্যে উদ্যোগী হইতে পারেন না। আপনাকে সবংশে এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তৎপরে হাজি মুনসম মহারাজ মুকুন্দমাণিক্য এবং তৎপুত্রগণ ভদ্রমণি, কৃষ্ণমণি ও রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাধরকে বন্দী করিলেন। রুদ্রমণি ঠাকুর এই সংবাদ শ্রবণে বুচরনারায়ণের সহিত সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি সৈন্য দ্বারা উদয়পুর বেষ্টন করিলেন।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য যবন কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সৎকারার্থ চিতা প্রস্তুত হইল। তদীয় রাজ্ঞী সহমৃতা হইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন সরদার বুচরনারায়ণ মহারাণীকে তাঁহার কয়েকটী প্রার্থনা শ্রবণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল স্থিরভাবে থাকিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। বুচরনারায়ণ তৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনের অধিকারী নির্ণয় করিতে প্রার্থনা করেন। রাজ্ঞী স্বীয় পুত্র পাঁচকড়ি এবং তদভাবে যুবরাজ গঙ্গাধরকে সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া নির্ণয় করেন। বুচরনারায়ণ "তাঁহারা দূরে আছেন বলিয়া, রুদ্রমণি ঠাকুরকে মনোনীত করিতে বলেন।" রাজ্ঞী তৎশ্রবণে সক্রোধে উত্তর করিলেন, আমার পুত্রগণের, কি ভাশুর পুত্রের

জীবিতাবস্থায় রুদ্রমণি রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না; এবং আমি তাহাকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেও পারি না। তোমাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ কর। জগদীশ্বর আছেন। এই বলিয়াই রাজ্ঞী প্রজ্জলিত অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

মহারাজ মুকুন্দমাণিক্যের মৃত্যুর পর হইতে, ব্রিটীশ পতাকা উড্ডীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় বিংশতি বৎসর ত্রিপুরায় যেরূপ গণ্ডগোল চলিয়াছিল, তদ্দ্বারা তদানীন্তন ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়াছে। যখন কোন প্রাচীন রাজ্য বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাড়ায় ত্রিপুরার তদানীন্তন অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল। রাজবংশীয়-গণ অনেকেই রাজদণ্ড ধারণ করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছি-লেন; কিন্তু সেই দণ্ডধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। প্রোক্ত বিংশতি বৎসর মধ্যে যে সকল নরপতি ত্রিপুর-রাজ-দণ্ডধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র মহারাজ জয়মাণিক্যের নৃপজনোচিত ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু দুর্দ্দান্ত মোগল পরাক্রমে তাঁহার সেই বিকাশোন্মুখ ক্ষমতা নিষ্পিষ্ট হইয়া ত্রিপুরা বিনাশের

পথে ধাবিত হইল। আমরা যথাসাধ্য এই সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে কি না তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে।*

সম্ভবতঃ ১১৪৭ কিম্বা ৪৮ ত্রিপুরাব্দে রুদ্রমণি ঠাকুর "জয় মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন। ফৌজদার হাজি মুনসম তাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত প্রাণ রক্ষার

---

* একখণ্ড প্রাচীন লেখ্যপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"তুমার ওয়াশীলাত রূপেয়া পরগণে সাবেক রতননগর মোতালকে সরকার রোশনাবাদ। ওয়াদেদারী শ্রীযুক্ত রাজা জগৎমাণিক্য। এতমাম শ্রীচন্দ্রনারায়ণ সীকদার। তহসীল তহবীল শ্রীজমিদারাণ। ইপ্তাদায় মাহে আষাঢ় লাগায়তে বৈশাখ।

মং ৩৯৪৭

*　*　*　*

*　*　*　*

শ্রীজমিদারাণ মহাল্লাদ লৌওয়াজ

শ্রী তালুকদারাণ।

*　*

ইতিসন ১১৪৫ বাঙ্গালা ১১৪৭ পরগণা।—

ইহার অর্থ কি? রাজা জগৎমাণিক্য কাহার দ্বারা পরগণে সাবেক রতননগরের তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। "১১৪৭ পরগণা" ইহা অব্দের পরিচায়ক, কিন্তু ইহা বঙ্গাব্দ কি ত্রিপুরাব্দ নহে?

উপায়ান্তর অদর্শনে পত্রদ্বারা মহারাজ জয়মাণিক্যের সমীপে বিনীতভাবে মুক্তির প্রার্থনা করেন। মহারাজ জয়মাণিক্য তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে সদয় হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ফৌজদার ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিলে, মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্রগণ ও ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র যুবরাজ গঙ্গাধর পলায়ন পূর্ব্বক ঢাকানগরে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ জয়মাণিক্য মেহেরকুল নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই পরগণার নাম "জয়নগর" রাখিয়াছিলেন।*

মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র কুমার পাঁচকড়ি ঠাকুর নবাবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মুরশিদাবাদ হইতে ত্রিপুরায় আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে স্বীয় অনুজ কৃষ্ণমণির পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। পিতৃ-বিয়োগ ও রাজ্য নাশ প্রভৃতি দুঃখজনক সংবাদ শ্রবণে তিনি পুনর্ব্বার মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নবাবকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় অবগত করিলেন। তৎশ্রবণে নবাব তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ জন্য সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সাহায্য করণার্থ কারণ ঢাকার নায়েব নাজিমের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। হতভাগা পাঁচকড়ি রাজ্য লোভে নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুরার প্রকৃত স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।

---

* জয়মাণিক্যের ১১৫৪ ত্রিপুরার ১ চৈত্রের সনন্দ দ্রষ্টব্য।

পাঁচকড়ি ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া নবাব প্রদত্ত সৈন্যের সাহায্যে জয়মাণিক্যকে জয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি উদয়পুরে গমন করিয়া "ইন্দ্রমাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ ১১৪৯ ত্রিপুরাব্দে ইন্দ্রমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

সিংহাসন চ্যুত মহারাজ জয়মাণিক্য প্রায় ৬ মাস কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ১৪০০ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ত্রিপুরার প্রজাবর্গকে সেই সেনাদলের অঙ্গ পুষ্টি করিবার জন্য আহ্বান করেন। মেহেরকুলের সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী হরিনারায়ণ চৌধুরী * এবং অন্যান্য কতকগুলি ভূম্যধিকারী মহারাজ

* মেহেরকুলের ভূম্যধিকারীগণ মধ্যে এই সময় বিজয়পুরের চৌধুরীগণই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। হরিনারায়ণ চৌধুরীর পিতা কায়েস্থ বংশীয় মধুসূদন দেব পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগমন পূর্ব্বক বিজয়পুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র দর্প নারায়ণদেব প্রথমতঃ "চৌধুরী" উপাধি এবং সেই উপাধির বৃত্তি স্বরূপ "চৌধুরাই নানকার" প্রাপ্ত হন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হরিনারায়ণ চৌধুরী প্রবল হইয়া উঠেন। চৌধুরী বংশীয়দিগের প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের ভগ্নাবশেষ দ্বারা বিজয়পুর পূর্ণ রহিয়াছে। বৃহৎ দীর্ঘিকাগুলি, ভগ্ন ও অর্দ্ধ ভগ্ন দেবমন্দির সকল তাঁহাদের অতীত গৌরব ও কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। দর্পনারায়ণ, হরিনারায়ণ চৌধুরী ও তাঁহাদের ভ্রাতৃবর্গের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ উত্তর পুরুষগণ কথঞ্চিৎ রূপ জীবিকা নির্ব্বাহ

জয়মাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন করেন। নুরনগরের তালুকদার গণ প্রায় সকলেই ইন্দ্রমাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। জয়মাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের মধ্যে অনন্ত কলহের স্রোত প্রবাহিত হইল। ইন্দ্রমাণিক্যের আধিপত্য যেরূপ ত্রিপুরার উত্তরাংশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, জয় মাণিক্যের আধিপত্য তদ্রূপ দক্ষিণভাগে সুদৃঢ় হইল। তদনন্তর জয় মাণিক্য যেরূপ উত্তর ত্রিপুরাবাসী কোন কোন ব্যক্তিকে নিষ্কর প্রদান পূর্ব্বক হস্তগত করিতে যত্নবান হইলেন, ইন্দ্রমাণিক্যও তদ্রূপ দক্ষিণ ত্রিপুরার অনেক ব্যক্তিকে নিষ্কর প্রদান পূর্ব্বক স্বদল ভুক্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন। * ক্রমে জয় মাণিক্য বলবান ও ইন্দ্রমাণিক্য দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। সমর ক্ষেত্রে বারংবার পরাজিত হইয়া ইন্দ্রমাণিক্য নবাবের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। †

করিয়া, তাঁহাদের পিতৃ পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপের শ্মশান ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন।

* ধর্ম্ম মাণিক্যের মৃত উজির কমল নারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমল নয়ণবিশ্বাসকে দক্ষিণশিক পরগণা মধ্যে নিষ্কর প্রদানের ইহাই প্রধান কারণ।

† Then a war took place with Joy Manikya, The said Indra Manikya not being able to compete with Joy Manikya, again informed the Nobab.

Deposition of Ramratan Dewan. Dated 30th Sept. 1806. Before the Provincial Court of Dacca.

মহারাজ জয়মাণিক্য উৎকোচ দ্বারা ঢাকার নায়েব নাজিমকে বশীভূত করেন। নায়েব নাজিম ইন্দ্রমাণিক্যকে অবশিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য ধৃত করিয়া, ঢাকার কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সুযোগে জয়মাণিক্য সমগ্র ত্রিপুরা অধিকার করিলেন। ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র যুবরাজ গঙ্গাধর সেই সময় ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। তিনি উৎকোচ দ্বারা নায়েব নাজিমকে বশীভূত করায়, তিনি তাঁহাকে ত্রিপুরার সিংহাসনে স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। নায়েব নাজিম গঙ্গাধরের সহিত মহাম্মদ রফি নামক জনৈক অশ্বারোহী সেনাপতিকে একদল সৈন্যের সহিত ত্রিপুরায় প্রেরণ করিলেন। কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গাধর "উদয় মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ দণ্ডধারণ করিলেন। তিনি অল্পকাল মাত্র রাজ্য সুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জয়মাণিক্য ঢাকা নিবাসী জগৎমাণিক্যকে লিখিলেন, যদি তিনি উৎকোচ দ্বারা ঢাকার শাসন কর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া তাহার নামে সনন্দ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা নরহরিকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

জয়মাণিক্যের পত্রানুসারে জগৎমাণিক্য ঢাকার শাসন কর্ত্তাকে উৎকোচ দ্বারা হস্তগত করিলেন। নায়েব নাজিম সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার প্রকৃত অধিপতি

বলিয়া স্বীকার করিলেন। জয়মাণিক্য স্বীয় বাহুবলে উদয়-মাণিক্যকে দূর করিয়া সমগ্র ত্রিপুরা অধিকার করিতে যত্ন-বান্ হইলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে জগৎমাণিক্যের ভ্রাতা নরহরিকে যুবরাজের পদে নিযুক্ত করিলেন।

সুবিখ্যাত নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া স্বীয় জামাতা নিবাইশ মহম্মদকে ঢাকার নায়েব নাজিমের পদে নিযুক্ত করেন। হোসেন কুলি খাঁ তাঁহার সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জয়মাণিক্যের কৌশলে ইন্দ্রমাণিক্য ঢাকায় অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে হোসন কুল খাঁর সহিত ইন্দ্রমাণিক্যের সদ্ভাব জন্মিল। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ইন্দ্রমাণিক্য ত্রিপুরার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তৎপাঠে নবাব হোসন কুলি খাঁকে সসৈন্যে ত্রিপুরার উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইতে আদেশ করেন। নবাবের অনুমতিমতে হোসন কুলি খাঁ ইন্দ্রমাণিক্যকে বিমুক্ত করিয়া চতুর্দ্দশসহস্র সৈন্যসহ কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জয়মাণিক্য গিরি শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রমাণিক্য নবাব প্রদত্ত সৈন্যের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জয়মাণিক্যকে অবরুদ্ধ করিয়া কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হন। হোসেন কুলি খাঁ জয়মাণিক্যকে লইয়া ঢাকায় গমন করেন। নবাবের অনুমতি মতে

জয়মাণিক্যকে পশ্চাৎ মুরশিদাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইন্দ্রমাণিক্য কিছুকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

হোসেন কুলি খাঁর পরামর্শ অনুসারে ইন্দ্রমাণিক্য মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে জনৈক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রতিনিধি হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, নবাবের প্রিয় পাত্র হাজি হুসনের সহিত জয়মাণিক্যের বিশেষ সদ্ভাব হইয়াছে। হাজি হুসন পুনর্ব্বার জয়মাণিক্যকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। তদনন্তর ইন্দ্রমাণিক্য মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। তথায় অবস্থান কালে ইন্দ্রমাণিক্য মানবলীলা সম্বরণ করেন। জয়মাণিক্য পুনর্ব্বার ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্রমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কৃষ্ণ মণির সহিত তাঁহার অবিরত কলহ চলিতেছিল। তিনি তৃতীয়বার সিংহাসন আরোহণ করিয়া অতি অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। জয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর "বিজয়মাণিক্য" নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্য নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ হইতে ৬ই "জুলুষের ১৫ই জিহিজা" তারিখের সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। কতকগুলি পার্ব্বত্য প্রজা ব্যতীত সমতলক্ষেত্রবাসি প্রজাবর্গ হইতে

তিনি তৎকালে কোনরূপ কর গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ, রাজমালা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবাব বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বেতনে বিজয় মাণিক্যকে চাকলে রোসনাবাদের তহসীলদারি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্যের নামীয় নবাব প্রদত্ত সনন্দ, বিজয় মাণিক্যের প্রদত্ত কতকগুলি সনন্দ এবং মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্বের ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্ণীত হইতেছে যে, উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ অসত্য ও হিংসা প্রসূত। ইন্দ্র মাণিক্যের ন্যায় তিনিও নবাব হইতে সনন্দ গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিপুর রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয় মাণিক্যের শাসনকালে দক্ষিণশিক নিবাসী জনৈক মুসলমান প্রজা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইবে। মহারাজ বিজয় অত্যল্প বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া কাল কবলিত হন। তদনন্তর যুবরাজ কৃষ্ণমণি ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার বাসনা পূর্ণ হইল না। এক সামান্য প্রজার বাহুবলে পরাজিত হইয়া, তিনি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

মির হবিবের সাহায্যে যৎকালে জগৎ মাণিক্য চাকলে রোসনাবাদের আধিপত্য লাভ করেন, সেই সময় দক্ষিণশিক

নিবাসী ইমন সদা বা সদা গাজি নামক জনৈক মুসলমান প্রজা হল কর্ষণ কালে ভূগর্ভে কতগুলি মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া, রাজা জগৎ মাণিক্যকে উপঢৌকন প্রদান করেন। নরপতি সেই সকল উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া, সদাগাজিকে পরগণে দক্ষিণশিকের জমিদারি স্বত্ব প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে উক্ত পরগণার বার্ষিক রাজস্ব দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল, জগৎ মাণিক্য দুই সহস্র মুদ্রা বাদ দিয়া দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করেন। ইমন সদা বা সদাগাজি কাল কবলিত হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র নাছির মাহাম্মদ ॥৵ আনা ও খণ্ডল নিবাসী রতন চৌধুরী।৵ আনা জমিদারি প্রাপ্ত হন। নাছির মাহাম্মদ বয়োপ্রাপ্ত হইলে, কালক্রমে তাহার কয়েকটি পুত্র জন্মে। সেই জমিদারপুত্রগণের সহিত সমসের গাজি নামক এক দরিদ্র বালক এক পাঠশালায় বিদ্যা অধ্যায়ন করিত। এক সামান্যা রমণীর গর্ভে ও জনৈক ফকিরের ঔরসে তাহার জন্ম হয়। সমসেরের জীবন চরিত লেখক তাঁহাকে "পিরের নন্দন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অল্পকালেই সমসের বিদ্যা বলে ও বাহু বলে জমিদার পুত্রগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইলেন। সমসের বয়োপ্রাপ্ত হইলে জমিদার নাছির মাহাম্মদ তাহাকে এক কুত ঘাটের তহশীলদারি কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তৎকাল সমসরের দূরসম্পর্কিত ছাদুগাজী নামক ভ্রাতা তাহার সহচর হইয়াছিল। ছাদু যদিচ সমসরের ন্যায় বুদ্ধিমান ছিলনা, কিন্তু

সে ভীমের ন্যায় অলৌকিক বলবান ছিল। এই সময়ে গদা-হুসন খন্দকার নামক জনৈক সাধু পুরুষের সহিত সমসেরের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাধু পুরুষ তাহাকে একখানি তরবারি ও একটী অশ্ব প্রদান করিয়া বলেন "তুমি চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি হইবে, এজন্য তোমাকে এই তরবারি ও অশ্ব প্রদান করিলাম। রসাঙ্গের (আরাকানের) মগরাজ এই তরবারি ছৈয়দ সুলতানকে উপঢৌকন প্রদান করেন। আমি তাঁহার উত্তর পুরুষ বলিয়া এই বহুমূল্য তরবারি দীর্ঘ-কাল যাবৎ আমার নিকট আছে। অদ্য তোমাকে ইহা প্রদান করিলাম, ইহার দৈব শক্তি বলে তুমি সর্ব্বযুদ্ধে জয়ী হইবে, নাছির মাহাম্মদ জমিদার হত হইবেন। ত্রিপুরেশ্বরের সহিত তোমাকে বারংবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; কিন্তু পরিণামে তোমার জয় অনিবার্য্য"।

সেই সাধু পুরুষের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সমসের গাজি প্রথমেই জমিদার নাছির মাহাম্মদের কন্যার পাণি-গ্রহণা-ভিলাষী হইলেন। জমিদার, সমসেরের অন্যায় অভিলাষ শ্রবণে, তাহাকে বধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জমিদার সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সমসের ও ছাদু পলায়ন করিলেন। তাঁহারা কিছুকাল বেদরাবাদ পরগণায় লুক্কায়িত থাকিয়া কতকগুলি দুষ্টলোক সংগ্রহ করেন। সেই সকল দুষ্ট লোকের সাহায্যে ছাদু, জমিদার নাছির

মাহাম্মদ ও তাঁহার পুত্রগণের বিনাশ সাধন করেন। তদনন্তর সমসের বলক্রমে নাছির মাহাম্মদের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দক্ষিণশিক অধিকার করেন। ত্রিপুরেশ্বর এই সংবাদ শ্রবণে তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে সমসের বলে ও কৌশলে মহারাজার উজিরকে বাধ্য করিয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা "নজর" প্রদান পূর্ব্বক দক্ষিণশিকের জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিলেন। ইহার তিন বৎসর পর সমসের গাজি মেহেরকুল পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর সমসের গাজি রাজকর বন্ধ করিয়া স্বয়ং চাকলে রোশনাবাদের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বারংবার যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু একবারও সমসেরকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। সমসের ছয় সহস্র উৎকৃষ্ট বলবান সৈন্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি উদয়পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক রাজধানী আগরতলায় বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন।

এই সময় বাঙ্গালা দেশে ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লব চলিতেছিল। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু, তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র অপরিণত মস্তিষ্ক যুবক সিরাজদ্দৌলার অভিষেক, তদনন্তর গর্দ্দভ প্রকৃতি, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের অভ্যুদয় ও হতভাগ্য নবাব সিরাজের অধঃপতন প্রভৃতি ঘটনাবলীদ্বারা যখন বঙ্গের

অদৃষ্ট মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছিল, কতকগুলি অপরিণাম-দর্শী স্বদেশদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন বঙ্গলক্ষ্মী বঙ্গদেশ পরিত্যাগের জন্য চঞ্চলা হইয়াছিলেন তৎকালে সমসেরগাজি ত্রিপুরায় বসিয়া সিংহনাদ করিতে-ছিলেন। সমসের যে কেবল চাকলে রোশনাবাদ অধিকার করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, এমত নহে, তাঁহার অর্থের অভাব উপস্থিত হইলেই ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরগণা সমূহের দুর্ব্বল জমিদারদিগের গৃহে দস্যুবেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতেন। সমসেরগাজির প্রিয় ভক্ত, তাঁহার জীবন চরিত লেখক সেখ মনোহরও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। *

পর্ব্বতবাসী মানবগণ হইতে কর আদায় জন্য সমসের উজির রামধন বিশ্বাসকে † পর্ব্বত মধ্যে প্রেরণ করিলেন। পর্ব্বতবাসী অসভ্যগণ গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিল "আমাদের

* সেখ মনোহর বলেন, যে, তিনি কেবল একজন কৃপণ জমিদারের গৃহ হইতে এক লক্ষ টাকা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছিলেন। কারণ উক্ত জমিদার "দান খয়রাত করিত না" এজন্যই তাহার গৃহে ডাকাতি করা হইয়াছিল।

† ইনি পরাশর গোত্রজ দত্তবংশীয় কায়স্থ। ঘোষ বিশ্বাস বংশের দৌহিত্র বলিয়া উপবিশ্বাস শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। উজির রামধন শোলনল গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার বাস ভবনের চিহ্ন অদ্যাপি সেই গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজবংশ ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও কর প্রদান করিব না, তুমি বাঙ্গালি তোমার কথা আমরা গ্রাহ্য করি না।*

তৎকালে সমসের গাজি এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন; "উদয় মাণিক্যের" ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে "লক্ষ্মণ মাণিক্য" আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক এক অভিনব সিংহাসন প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করিলেন। মির কাশিমের অধঃপতনের পর ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যেরূপ মুরশিদাবাদে একজন সাক্ষী গোপাল নবাব রাখিয়াছিলেন, সমসের গাজীও তদ্রূপ লক্ষ্মণ মাণিক্যকে সাক্ষীগোপাল ত্রিপুরাপতি রূপে রাখিলেন। সমসের এই লক্ষ্মণ মাণিক্যের নামোল্লেখে কতকগুলি পার্ব্বত্য জাতি হইতে কর সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তখনও ত্রিপুরা, রিয়াং, কুকি প্রভৃতি অধিকাংশ পার্ব্বত্য প্রজা যুবরাজ কৃষ্ণমণির পক্ষেই ছিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বল সংগ্রহের অভিলাষে দীর্ঘকাল কাছার ও মণিপুর রাজ্যে ভ্রমণ করেন, কিন্তু আশানুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই।

সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগণায় সমসের গাজি এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন।

---

* ধন্য ত্রিপুরাজাতি! এজন্যই রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন—"The people of Tripura like the Shiks were a military race.

তাহাদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যাই অধিক ছিল। আবদুল রজক তাঁহার সৈন্য বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। মেহেরকুলের উত্তরদিকস্থ কোন পরগণা সমসের গাজীর অধিকার ভুক্ত ছিল কিনা তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত লেখক বলেন,যে বিশালঘর অষ্টজঙ্গল পরগণার শাসনভার ছানাউল্লার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নুর-নগর ও গঙ্গামণ্ডলের শাসন কর্ত্তৃত্বে আবদুল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা জীবন চরিত লেখকের সমস্ত বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। তাঁহার শাসনকর্ত্তৃগণ মধ্যে জগৎপুরের গঙ্গাগোবিন্দ ও চৌদ্দ-গ্রামের হরিশ্চন্দ্র এই দুইজন হিন্দুর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অন্যেরা সকলেই সমসেরের স্বজাতীয় ও সম্প-র্কীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত না। এজন্য হিন্দু শাসন-কর্ত্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ প্রধান দেওয়ান ও খণ্ডল নিবাসী হরিহর নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা রাজস্ব বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

সমসের গাজি তাঁহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের আশ্চর্য্য নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৮২ সিক্কা ওজনে সের ধার্য্য হইয়াছিল। সেই সেরের পরিমাণে কোন্

দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রী হইবে তাহার একটী তালিকা প্রত্যেক বাজারে লটকাইয়া দিয়াছিলেন।* কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিত না।

সমসেরগাজি প্রকৃত পক্ষে দাতা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমানকে চাকলা রোশনাবাদের মধ্যে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

সমসেরের সৌভাগ্য তপন পশ্চিমাকাশে বিলম্বিত হইল। অশেষ গুণালঙ্কৃত আলিজা মিরকাশেম বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব সমক্ষে উপস্থিত

* আমরা তাহার মূল্যের তালিকা এস্থানে প্রদান করিতেছি।

চাউল	/১	সের	৻৫ একপয়সা।
লঙ্কা মরিচ	/১	সের	৻৫ একপয়সা।
গুড়	/১	সের	৻১০ দুইপয়সা।
লবণ	/১	সের	৻১০ দুইপয়সা।
রশুন পিঁয়াজ	/১	সের	৻১০ দুইপয়সা।
কাপাস	/১	সের	/৫ পাঁচপয়সা।
কলাই	/১	সের	৻৫ একপয়সা।
মশুরি	/১	সের	৻১০ দুইপয়সা।
মটর	/১	সের	৻১০ দুইপয়সা।
মুগ	/১	সের	/০ চারিপয়সা।
অড়হড়	/১	সের	/০ চারিপয়সা।
তৈল	/১	সের	৶ আনা।
ঘৃত	/১	সের	।৴ আনা।

হইয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। ক্রমে সমসেরের দস্যুবৃত্তির সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইল। তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে "ত্রিপুরাপতি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া সমসেরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পশ্চাৎ নবাবের অনুমতি ক্রমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমসের গাজির প্রাণ দণ্ড করা হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

১১৭০ ত্রিপুরাব্দের ১ পৌষ যুবরাজ কৃষ্ণমণি "মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি যেরূপ নানা প্রকার যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, ত্রিপুর বংশীয় অন্য কোন নরপতি তদ্রূপ যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বারংবার সমরে পরাজিত হইয়া সাহায্যলাভ কামনায় কখন বা অনাহারে, কখন বা ফল মূল ভক্ষণে, কখন বা দগ্ধ মৃগ মাংস ভক্ষণে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া কাছার ও মণিপুর রাজসভায় গমন করিয়াছেন। কখন বা দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের ন্যায় কদর্য্য আহারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাজদণ্ড ধারণ করিয়াও তিনি কষ্ট হইতে এককালে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হন নাই। অল্পকাল মধ্যেই চাকলে রোশনাবাদের রাজস্ব পরি-

শোধ উপলক্ষে ফৌজদার, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সহিত ভীষণ কলহ উপস্থিত করিলেন। সেই কলহ হইতে ক্রমে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ফৌজদার নবাব সমক্ষে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নবাব তদানীন্তন ইংরেজ গবর্ণর বানসিটার্ট সাহেবকে ফৌজদারের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। বানসিটার্ট সাহেব চট্টগ্রামের সীমারেখা প্রসারিত করিবার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা "সরদার" * বারলেষ্ট সাহেবকে লিখিলেন, "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ত্রিপুরা অধিকার করিবে এবং নবাবের কর্ম্মচারিগণকে বলিবে যে, তাহারা এই ঘটনা নবাবকে জানাইতে পারেন। নবাব এসম্বন্ধে যাহা প্রশ্ন করিবেন তাহার উত্তর আমরা নবাবকে প্রদান করিব।"

তদনুসারে বারলেষ্ট সাহেব ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ২০৬জন পদাতি সৈন্য ও দুইটি তোপ সহ লেপ্টনাণ্ট মথি সাহেবকে চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তৎকালে নুরগর নগরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন কৈলারগড় দুর্গে সপ্ত সহস্র সুশিক্ষিত পদাতি, বহু সংখ্যক কুকি সৈন্য ও কয়টি তোপ লইয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। মথি সাহেব নুরনগর নগরে উপস্থিত হইয়া তাহার পশ্চিমদিকস্থ

* Chief of Chittagong.

ময়দানে শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। প্রবাদ অনুসারে রাজকীয় "ফৌজের বক্সীকে" * মথি সাহেব প্রলোভনে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্য দুর্জ্জয় ইংরেজের হস্তে প্রাণনাশ অনিবার্য্য বলিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজকীয় সৈন্যগণকে দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত মধ্যে পলায়ন করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। সৈন্যগণ ভয়াতুর হইয়া রজনী যোগে দুর্গের পূর্ব্বদিকস্থ গুপ্তদ্বার দিয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় পড়িয়া মথির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির চারি বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র ব্রিটীশ সিংহের কুক্ষিগত হইয়াছিল। লিক সাহেব ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির তিন বৎসর পরে অল্পকালের জন্য মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের অধিকার হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন। জগৎ মাণিক্যের বংশধর

---

* মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের প্রিয় সহচর রামহরি বিশ্বাসের কনিষ্ট ভ্রাতা ৬রামদুলাল ঘোষ বিশ্বাসের নিকট এইরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, বিক্রমপুর নিবাসী জনৈক কায়স্থ তৎকালে মহারাজের ফৌজের বক্সী ছিলেন। কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে বিদেশী বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্যের আমদানী আরম্ভ হয়।

বলরাম মাণিক্য চাকলে রোশনাবাদের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। কি রূপে তিনি এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার রূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। তিনি পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাহুবলে যে তিনি রোশনাবাদ অধিকার করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। শান্তিময় ব্রিটীশাধিকার কালে এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই বিস্ময়কর। যাহা হউক অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, "রাজা বলরাম মাণিক্য" কে দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার রোশনাবাদ অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বলরাম মাণিক্যের ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দের ১ বৈশাখের একখণ্ড নিষ্করের সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। সম্ভবতঃ ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দের শেষভাগে ও ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দের প্রথম ভাগে বলরাম মাণিক্য চাকলে রোশনাবাদ সম্পূর্ণ কিম্বা তাহার কিয়দংশ শাসন করিয়াছিলেন।

রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের সময় হইতে চাকলে রোশনাবাদ ও পার্ব্বত্য রাজ্যের বিচার কার্য্য স্বতন্ত্র ভাবে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশের বিচার কার্য্য মহারাজের নিযুক্ত বিচারকগণ দ্বারা নির্ব্বাহ হইত; রোশনাবাদের বিচার কার্য্য রেসিডেণ্ট সাহেব এবং মহারাজা বাহাদুর কিম্বা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ান উভয়ে একত্র বসিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালের কয়েক খণ্ড

নিষ্পত্তি পত্রের সহি মোহরাঙ্কিত সকল আমরা দর্শন করিয়াছি। আদর্শ স্বরূপ তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি যথাস্থানে মুদ্রিতহইবে।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য একজন দয়ালু, দাতা ও স্বধর্ম্ম নিরত নরপতি ছিলেন। কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্ব পার্শ্বে মহারাজ বিজয়মাণিক্য যে, সতররত্ন নামক দেবমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য সেই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তাহাতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। কথিত আছে, এই দেবমূর্ত্তি সংস্থাপন কালে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য চৌদ্দগ্রাম নিবাসী অনাচরণীয় নীচজাতীয় শিবিকা বাহক বেহারাদিগকে জলাচরণীয় শূদ্র শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সাহায্যে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বিনা অর্থব্যয়ে অক্লেশে যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মহারাজ স্বদেশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তদ্বৃত্তান্ত যথাস্থানে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে। তিনি তুলা পুরুষ প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে বাঙ্গলা দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রচুর পরিমাণে ভূমি ও অর্থদান দ্বারা নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানবাসী পণ্ডিতগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য যে কেবল দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ও

মহত্তরাণ প্রভৃতি নিষ্কর ভূমি দান করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, এমত নহে। তিনি "ডাকাইত" সমসর গাজির প্রদত্ত সমস্ত নিষ্কর "বহাল"করিয়া মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন *

---

* সমসর গাজি নামা পুস্তকে লিখিত আছে-

তবে গাজী যে সবারে দিল লাখেরাজ।
পাকড়ি আনিল রাজা লইতে খেরাজ॥
সকলে মিনতি করে মহারাজ আগে।
মহারাজ দোহাই দিয়া ক্ষমাবর মাগে॥
তছুন্দক খাই মোরা ফকির খোনার। ১
ভট্ট ব্রাহ্মণ মোরা পেসা নাই আর॥
মহারাজ বলে তোরে কে দিল নিষ্কর।
বলে, দিছে হেন রজক সমসব॥
এক পুরিয়া জমিদার দিল আমরারে।
পোস্তা পোস্থি হই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে॥ ২
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল সলজ্জিত।
পাত্রগণ বুঝাইল রাজার বিদিত॥
রায়ত হইয়া কর্ত্তা দিয়াছে নিষ্কর।
আপনি লইলে কর লজ্জা বহুতর॥
তবে মহারাজ বহাল করিল সবারে।
খয়রাত নিষ্কর মিনা আর দেবোত্তরে॥

১। খোনার—খন্দকার।

২। একপুরুষের জমিদার সমসর গাজি নিষ্কর দিয়াছেন, আর আপনি পুরুষানুক্রমের প্রাচীন অধিপতি হইয়া ভাঙ্গিতে চাহেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন কালে তিনি বিশ্বাস বংশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়া মেহেরকুলের অন্তর্গত দুর্গাপুর নিবাসী সিংহ বংশীয় সুরমণি সিংহকে চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ইহার উত্তর পুরুষগণ দীর্ঘকাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। * তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত নানাবিধ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিলা

---

* উক্ত সিংহ বংশের বংশাবলী ও দেওয়ান সুরমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান কালীচরণসিংহের জবানবন্দী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সুরমণির পিতা হরিচরণ ও পিতামহ বলরাম ত্রিপুর রাজ সরকারে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন্ নরপতির সময় কোন্ বিভাগে দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাহার কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উক্ত দেওয়ান বংশের বংশাবলী এস্থানে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইল।

দেওয়ান বলরাম সিংহ।
|
দেওয়ান হরিচরণ সিংহ।
|
দেওয়ান সুরমণি সিংহ।
|　(ইঁহার ছয় পুত্র)

দেওয়ান কালীচরণ সিংহ।　　দেওয়ান দুর্গাচরণ সিংহ।
|　(ইঁহার তিন পুত্র)
দেওয়ান গোপালকৃষ্ণ সিংহ।

এক সময় সমগ্র বঙ্গদেশে আপনাদের খ্যাতি প্রচার ও দাতৃত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের জীবিতকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ হরিমণি পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুইটী শিশুপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কণ্ঠমণি, কনিষ্ঠ রাজধর। ইঁহারা এক মাতার গর্ভজাত নহেন। বয়োজ্যেষ্ঠ কণ্ঠমণি জ্যেষ্ঠ তাতের স্নেহ ভাজন ছিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ও তাঁহার পত্নী মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী কুমার রাজধরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ক্রমেই কণ্ঠমণির প্রতি মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কুমার কণ্ঠমণির মাতা তাঁহাকে লইয়া কাছাড় রাজ দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদনন্তর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কুমার রাজধরকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কুমার রাজধর সৌভাগ্য বশতঃ রাজ্যাধিকারী নির্ণীত হইলেন বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাত পত্নীর অতিরিক্ত আদরে তিনি একটি সম্পূর্ণ মূর্খ হইয়া উঠিলেন। স্বীয় নাম স্বাক্ষর

এই দেওয়ান বংশে যাঁহারা দেওয়ানী পদপ্রাপ্ত হন নাই, আমরা তাঁহাদের নাম পরিত্যাগ করিলাম। তন্মধ্যে দেওয়ান সুরমণি সিংহের তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের বংশ এবং দুর্গাচরণ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র কাশীচন্দ্রের বংশধরগণ এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। কাশীচন্দ্র সিংহের পুত্র পৌত্র ব্যতীত অন্যান্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

করিতে যাঁহার গলদ্ঘর্ম্ম হইত তাঁহাকে সম্পূর্ণ মূর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? *

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১১ জুলাই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য মানব-লীলা সংবরণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্ঞী জাহ্নবী মহাদেবী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তৎকালে রেসিডেন্ট লিক সাহেব চট্টগ্রামে ও কুমার রাজধর কুমিল্লায় অবস্থান করিতেছিলেন।

লিক সাহেব ত্রিপুরা পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তদনীন্তন গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে লিখিলেন যে, অনপত্যাবস্থায় ত্রিপুরাপতির মৃত্যু হইয়াছে; কেবল রাজধর ঠাকুর নামে তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র জীবিত আছেন। তাহাকে রাজ্যাধিকারী করা মৃত রাজা এবং তাঁহার রাজ্ঞীর অভিপ্রায়।"† এই পত্র প্রেরণ করিয়া লিক সাহেব আগর-তলায় গমন করেন।

* রেসিডেন্ট জনবুলার সাহেবের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের চিঠীতে লিখিত আছে যে, রাজধর কিছুমাত্র লেখা পড়া জানিতেন না, এবং নিজের নামটিও দস্তখত করিতে পারিতেন না।

† Mr. Leeke's letter to the Honorable Warren Hastings Governor General Dated 15th July 1783.

মহারাণী জাহ্নবী (অন্য নাম রাণী চাম্পা) প্রায় তিন বৎসরকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কুমিল্লা নগরীতে তিনি যে দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "রাণীর দীঘি" আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। তাহার জল অতি উৎকৃষ্ট।

রেসিডেণ্ট লিক সাহেব আগরতলায় উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি লিক সাহেবকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন যে, "রাজধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াই তিনি সাংসারিক সমস্ত বিষয় হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।" রাজ্ঞী লিক সাহেবের পরামর্শানুসারে রাজধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণরজেনেরল নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

বীরমণি বড়ঠাকুর * রাজ্ঞীর বাসনা জানিতে পারিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য অভিলাষী হন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের রিপোর্টদ্বারা বড়ঠাকুরের দাবি অমূলক স্থির হইল। সমসের গাজির প্রতিষ্ঠিত রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য বল পূর্ব্বক রাজমুকুট ধারণ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মহারাণী জাহ্নবী কৌশল ক্রমে তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, রাজধর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি লক্ষ্মণ

---

* মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, হরমণিকে যৌবরাজ্য এবং বীরমণিকে বড়ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মাণিক্যের পুত্র কুমার দুর্গামণিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

রাজ দণ্ডধারণ করিবার পূর্ব্বেই কুমার রাজধর বিষম বিপদে পতিত হইলেন। চাকলে রোসনাবাদের শাসন কার্য্য সুচারু রূপে হইতেছেনা বলিয়া কৃষ্ণ মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট তাহা খাস করিয়া লইয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের হস্তে তাহার শাসন ভার সমর্পিত হয়। ১১৯২ ত্রিপুরাব্দে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) চাকলে রোসনাবাদ গবর্ণমেণ্টের খাস শাসনে আইসে। গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজকর পরিশোধ করিয়া শাসনসংক্রান্তব্যয় ও রাজপরিবারের ভরণ পোষণ জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। কৃষ্ণমাণিক্যের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই রাজধর আর একটী অচিন্তনীয় বিপদে পতিত হইলেন। মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয় কালে বাঙ্গালা দেশে কিরূপ ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এবম্প্রকার একদল ডাকাইতের আশ্রয়দাতা বলিয়া কুমার রাজধর গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া কিছু কাল চট্টগ্রামের কারাগারে বাস করিয়াছিলেন। (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) * অবশেষে তিনি নির্দ্দোষী বলিয়া কারাগার হইতে

---

* The Zemindari was taken into *Khas* or

মুক্তিলাভ করেন। যদিও গবর্ণমেণ্ট ১০ বৎসরের জন্য চাকলে রোশনাবাদের শাসন ভার রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন, যদিও কিছুকালের জন্য কুমার রাজধর গবর্ণমেণ্টের কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন পার্ব্বত্য ত্রিপুরার শাসনকার্য্যের প্রতি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে কুমার রাজধর গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরা রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।† তৎকালে তিনি লক্ষ্মণ মাণিক্যের পুত্র দুর্গামণিকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ রাজধরমাণিক্য মণিপুরপতি জয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন। মণিপুরের রাজ বংশের সহিত ত্রিপুর রাজবংশের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ। বিলাসের আধার মূর্ত্তি মণিপুরী রমণীগণের ত্রিপুর রাজপুরে ইহাই প্রথম প্রবেশ। মণিপুর রাজকুমারীর গর্ভে রাজধরের কোন সন্তান হয় নাই। অন্যান্য পত্নীর গর্ভে তাঁহার ৪টী

direct management by the Resident. The Raja was in 1783 sent prisoner to Chittagong on a charge of harbouring dacoits.

Mackenzies North-East Frontier of Bengal. Page 273.

† Government letter to Mr. Leeke, *Resident of Tipperah, 9th May* 1785.

পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দুইটী শৈশবস্থায় মানবলীলা সংবরণ করেন। কুমারদ্বয় রামগঙ্গা ও কাশীচন্দ্র দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন।

মহারাজ রাজধর মাণিক্যের শাসনকালে স্নুবা আছুমণি দেব প্রধান সেনাপতি এবং রামহরি ঘোষ বিশ্বাস "ফৌজের বক্সী" ছিলেন। * ইঁহারা উভয়েই বাহুবলশালী বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে বিশেষরূপে দমন করিয়া বৃদ্ধ স্নুবা আছুমণি ও যুবক বক্সী রামহরি রাজ দরবারে বিশেষ রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ রাজধর মাণিক্য ১১৯৫ ত্রিপুরাব্দে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১২০২ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্বে চাকলা রোসনাবাদের শাসনভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয় নাই। তৎকালে তিনি স্বয়ং রোসনাবাদের উপস্বত্ব হইতে বার্ষিক দ্বাদশ সহস্র টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট মহারাজ রাজধর মাণিক্যের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার পুনঃ প্রদান জন্য প্রস্তাব করিয়া ছিলেন, তৎকালে রেসিডেণ্ট জন বুলার সাহেব ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বুলার সাহেব ১৭৮৮

* ইনি অদ্যাপি "হরি বক্সী" বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্টের চিঠী দ্বারা বলেন যে, রাজধরের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার সমর্পণ করিলে যে, কেবল ষ্টেটের ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এমত নহে রাজপরিবার-বর্গ, যাঁহারা ষ্টেটের উপস্বত্ব হইতে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত কষ্টে পতিত হইবেন। বুলার সাহেবের প্রতিবাদ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে কিছুকাল গৌণ হইয়াছিল। অব-শেষে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস বাঙ্গালার জমিদারবর্গের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন তখন (১২০২ ত্রিপুরাব্দে) রাজধর মাণিক্যের সহিত রোসনাবাদের চির-স্থায়ী বা (দশশালা) বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে রোসনা-বাদের শাসনভার প্রত্যার্পণ করেন। এই সময় ত্রিপুরার রেসিডেণ্টের পদ এবালিস হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে "রোসনাবাদ ত্রিপুরা" জেলার সৃষ্টি হইয়া, জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ তাহার কালেক্টর নিযুক্ত হন।

রাজধর মাণিক্য স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রামগঙ্গাকে বড় ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। বার্দ্ধক্যাবস্থায় (১২১০ ত্রিপুরাব্দে) তিনি যুবরাজকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র রামগঙ্গার হস্তে রাজত্ব ও জমিদারির শাসন ভার সমর্পণ করেন। এই অন্যায় কার্য্যেরদ্বারা তিনি যে কেবল রাজ-পরিবারের মধ্যে আত্মকলহের বীজ বপন করিয়াছিলেন

এমত নহে, এই কলহ হইতেই রাজকীয় প্রকৃত সম্মানের মস্তকে কুঠারাঘাতের সূত্রপাত হইয়াছিল।

রাজধর শ্রীহট্ট প্রদেশবাসী জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের কন্যা চন্দ্রতারার সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামগঙ্গার বিবাহ দেন। তিনি অষ্ট ধাতু দ্বারা "বৃন্দাবন চন্দ্র" নামক দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চরমাবস্থায় রাজধর মাণিক্য বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা দেবোপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। ১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খৃষ্টাব্দে) রাজধর মাণিক্য মানবলীলা সংবরণ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাজধর মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজ পরিবার মধ্যে এক ভীষণ কলহ উপস্থিত হয়। অমাত্য ও রাজকর্ম্মচারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। উজির দুর্গামণি, বক্সী রামহরি ঘোষ বিশ্বাস, চাকলে রোসনাবাদের দেওয়ান কালীচরণ সিংহ, কুমার রামগঙ্গার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সুবা ধনঞ্জয় ও নাজির রাজমঙ্গল দেওয়ান রামরতন দেব * ও রামচন্দ্র সেন প্রভৃতি সেন বংশীয় বিশ্বাসগণ যুবরাজ দুর্গা-মণির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কুমার রামগঙ্গার পক্ষাবলম্বীগণ প্রকাশ করিলেন যে, রাজপুত্র প্রকৃত রাজ্যাধিকারী। যুবরাজ

* যুবরাজ দুর্গামণি, দেওয়ান রামরতনের ভগিনী সুমিত্রার পাণিগ্রহণ করেন।

জনৈক রাজকর্ম্মচারী মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহারা মহারাজ রাম মাণিক্যের শ্যালক যুবরাজ বলিভীম নারায়ণ, এবং মহারাজ রত্ন মাণিক্যের (ভ্রাতা ভিন্ন) অতিরিক্ত যুবরাজ গৌরীচরণ, চম্পক রায় এবং মুকুন্দ মাণিক্যের যুবরাজ কুমার গঙ্গাধর প্রভৃতি কতকগুলি যুবরাজের নাম উল্লেখ করিলেন। তদতিরিক্ত ভূতপূর্ব্ব রেসীডেণ্ট লিক সাহেবের ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারির বিস্তারিত রিপোর্ট তাঁহাদের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। কৃষ্ণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর বড় ঠাকুর বীরমণির জীবিতাবস্থায় রেসিডেণ্ট লিক সাহেব ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুসারে প্রথা অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট করেন তাহাতে তিনি মৃত রাজার নৈকট্য উত্তরাধিকারীকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট মৃত রাজার পুত্র ও ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধরকে ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী নির্ণয় করিয়াছিলেন।

যুবরাজ দুর্গামণির সহচরগণ প্রকাশ করিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্র ও রাজবংশের প্রথা অনুসারে যুবরাজই রাজ্যাধিকারী।

জেলা ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ-মাজেষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব কুমার রামগঙ্গার এবং ত্রিপুরার কালেক্টর যুবরাজ দুর্গামণির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কুমার রামগঙ্গা যথাশাস্ত্র পিতৃ-

শ্রাদ্ধ সমাপনান্তর সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক "মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ করেন। (১২১৪ ত্রিপুরাব্দ)

যুবরাজ দুর্গামণি স্নুবা ধনঞ্জয় ও নাজির রাজমঙ্গল প্রভৃতির সাহায্যে পার্ব্বত্য কুকি সরদারগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া রামগঙ্গার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য যে কেবল স্বীয় সৈন্য বলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এমত নহে, জজ সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রক্ষা করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্ট গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর দুর্গামণিকে জ্ঞাপন করিলেন যে, যুদ্ধ পরিত্যাগ পুর্ব্বক তিনি চাকলে রোশনাবাদে স্বীয় স্বত্ব সংস্থাপন জন্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করুন। দেওয়ানী আদালত দ্বারা জমিদারিতে তাঁহার স্বত্ব স্থির হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজ সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। যুবরাজ দুর্গামণি অনন্যোপায় হইয়া দেওয়ানী আদালতে রামগঙ্গার প্রতিকূলে জমিদারির জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইহা নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, মহারাজ রামগঙ্গা ও তাহার অমাত্যবর্গ কেবল রাজ পরিবারের উত্তরাধিকারিত্বের প্রথা লইয়া সেই মোকদ্দমায় বহুবিধ তর্ক ও আপত্তি উপস্থিত করিলেন, কিন্তু ব্রিটীস আদালতে এবম্প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারে কি না এই তর্ক

উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহাদের মস্তিক সঞ্চালিত হইল না। * তৎকালে এই তর্ক উপস্থিত হইলে বোধ হয় ত্রিপুরার এইরূপ অধঃপতন হইত না। এই মোকদ্দমায় কল্যাণ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুরের বংশধর রামচন্দ্র ঠাকুর তৃতীয় পক্ষ স্বরূপ দাবিদার হইয়াছিলেন।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই এই মোকদ্দমা ঢাকা প্রবিন্সিয়েল কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিষ্টার সারমেন বার্ড ও দ্বিতীয় বিচারপতি মিষ্টার জন মেলবিল দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়াছিল। উক্ত আদালত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে এইরূপ নির্ণয় করেন যে, রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন সুতরাং যুবরাজ দুর্গামণি রাজ্যাধিকারী ও জমিদারির ক্ষমতা প্রাপ্ত মেনেজার নির্ণীত হইবেন। কারণ চাকলে রোশনাবাদ কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণের অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি সুতরাং তাহার উপস্বত্ব তাঁহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে।

উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহারাজ রামগঙ্গা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করেন এবং কল্যাণ মাণিক্যের দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ ছত্র মাণিক্যের বংশধর ঢাকা নিবাসী রাজা পরশুরাম

* এই ঘটনার ৬০ বৎসর পর কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বেরিষ্টার মৃত মহাত্মা মনট্রীও সাহেবের মস্তিষ্কে প্রথমে ইহা উদিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ, রাজা প্রভুরাম ও মৃত রাজা রামচন্দ্রের পত্নী রাণী চন্দ্রকলা চাকলে রোশনাবাদের উপস্বত্বের।/৬।// ক্রান্ত (অর্থাৎ এক তৃতীয় অংশের) * উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবিদার হন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য প্রবিন্সিয়েল কোর্টের বিচারে পরাজিত হওয়ার পর নানা প্রকার বিপদে পতিত হইলেন। যুবরাজ দুর্গামণির পক্ষাবলম্বী সুবার উত্তেজনায় পরাক্রমশালী পৈতুকুকিগণ রামগঙ্গার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রামগঙ্গা পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলা ত্রিপুরার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। † রামগঙ্গার অনুরোধে গবর্ণমেন্ট পৈতুকুকির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। গবর্ণমেন্টের সৈন্যগণ কুকিদিগকে নির্য্যাতন করিয়া, নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিল।

---

* কল্যাণ মাণিক্যের তিন পুত্রের বংশই এইক্ষণ বর্ত্তমান আছে, এজন্য এক তৃতীয় অংশ দাবি করা হইয়াছিল।

† এই সময় তিনি মোগরা গ্রামে তত্রত্য তালুকদারগণ হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া একটি দীর্ঘিকা খনন করেন, সেই দীর্ঘিকা অদ্যাপি গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সেই দীর্ঘিকার উত্তর পাড়ে তিনি যে বাসভবন নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছিলেন, সেই অসম্পূর্ণ রাজ নিকেতন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে অধুনা চাকলে রোসনাবাদের উত্তর বিভাগের তহসীল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ (১২১৮ ত্রিপুরাব্দের ১৩ই চৈত্র) সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সুবিখ্যাত হেরিংটন ও ফ্লেমিং সাহেব মহারাজ রামগঙ্গার আপিল ডিস্‌মিস করেন; পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালত যুবরাজ দুর্গামণিকে ত্রিপুরারাজ্যের অধিকারী বলিয়া অবধারণ করেন। প্রবিন্‌সিয়েল কোর্ট চাকলে রোসনাবাদের উপস্বত্ব কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরদিগের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার জন্য যে আদেশ করিয়াছিলেন, সদর দেওয়ানী আদালত সেই আদেশ রহিত করিয়া বলেন যে, "রাজবংশীয় ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বাধ্য থাকিয়া রেস্পণ্ডেণ্ট যুবরাজ দুর্গামণি জমিদারির অধিকার প্রাপ্ত হইবেন"।

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর বলে যুবরাজ দুর্গামণি ১২১৯ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে চাকলে রোশনাবাদ অধিকার করেন। তদনন্তর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। দুর্গামণি সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক "মহারাজ দুর্গামাণিক্য" আখ্যা গ্রহণ করেন। ঐ সনের আশ্বিন মাসে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

রামগঙ্গার অধিকার কালে তাঁহার প্রিয় সহচর রামহরি ঘোষ বিশ্বাসের সহিত মহারাজ দুর্গামাণিক্যের শ্যালক দেওয়ান রামরতনের নানা প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল।

দুর্গামাণিক্য রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে রামরতন তাঁহার প্রতিশোধ লইতে যত্নবান হইলেন। একদা দেওয়ান রামরতন রামহরিকে অবমানিত করিতে যাইয়া স্বয়ং বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। রামরতন, রামহরি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া স্বীয় ভগিনী মহারাণী সুমিত্রা দেবীকে (ইনি পশ্চাৎ "জগদিশ্বরী" উপাধি প্রাপ্ত হন,) ইহার বিশেষ প্রতিকার করিবার জন্য অশ্রুপূর্ণলোচনে অনুরোধ করেন। মহারাণী সুমিত্রা রামহরির রক্তদ্বারা স্নান না করিলে জল গ্রহণ করিবেন না, বলিয়া স্বীয় স্বামীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাজ দুর্গামাণিক্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীর এবপ্রকার প্রতিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেও হৃদয়ের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইলেন না। তিনি মহারাণীকে বলিলেন, "অদ্যই রামহরিকে কারাগারে বদ্ধ করা হইবে, আগামী কল্য বিচারান্তে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে।" তদনন্তর রামহরিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া মহারাজ দুর্গামাণিক্য গোপনে কারাধ্যাক্ষকে বলিলেন, "বলরাম বিশ্বাস আমার শিক্ষক ছিলেন, আমি তাহার নিকট সমস্ত বাল্য জীবন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি আমার দ্বারা সেই বলরামের পুত্র রামহরির প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে না। তুমি নিশীথ সময়ে গোপনে রামহরিকে কারাগার পরিত্যাগের উপায় করিয়া দিবে।"

সিংহাসন-চ্যুত মহারাজ রামগঙ্গা মহারাণী সুমিত্রার

প্রতিজ্ঞা ও রামহরি কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ শ্রবণে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। তিনি রজনীতে যে কোন উপায়ে রামহরিকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। যথা সময়ে মহারাজ রামগঙ্গার প্রেরিত লোক কারাধ্যক্ষের সাহায্যে কারাগারে প্রবেশ করিয়া রামহরিকে বলিলেন, আপনি শীঘ্র কারাগার পরিত্যাগ করিয়া আসুন, আমরা মহারাজ রামগঙ্গার আদেশানুসারে তাহার সুন্দর উপায় করিয়াছি। রামহরি বলিলেন, আমি চোরের ন্যায় পলায়ন করিতে ইচ্ছা করি না। রামহরির এই বাক্য শ্রবণে কারাধ্যক্ষ তাহাকে আহ্বান করিয়া, মহারাজ দুর্গামাণিক্যের অভিপ্রায় গোপনে জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর রামহরি বিনা বাক্যব্যয়ে কারাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামগঙ্গার নিকট গমন করিলে তিনি রামহরিকে দর্শন করিয়া যথোচিত প্রীতি লাভ করিলেন। অন্যান্য আলাপের পর রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে বলিলেন, মহারাজ! এই বিপদ সময়ে আমি কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু আমার ভীষণ শত্রু মহারাণী সুমিত্রা ও তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান রামরতনের হস্ত হইতে আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, এজন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য অদ্যই আমি কিছুকালের নিমিত্ত মহারাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। তদনন্তর রামহরি স্বীয়

ভ্রাতা রামদুলালকে লইয়া শ্রীহট্ট প্রদেশে গমন করেন; তথে বিষগাঁও মধ্যে একটি জমিদারী ক্রয় করিয়া স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন

যথাকালে মহারাণী সুমিত্রা ও তাহার ভ্রাতা দেওয়ান রামরতন, রামহরির পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া নুরনগর ও মেহেরকুলস্থিত তাঁহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নষ্টের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল রাজধানী আগরতলা, মোগরা ও কুমিল্লায় বাস করিয়া হৃতরাজ্য মহারাজ রামগঙ্গা নানা প্রকার কষ্ট ও অপমান ভোগ করিলেন। এই সময়ে তিনি রামহরির বিষগাঁও জমিদারী ক্রয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রামগঙ্গা স্বদেশ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বোধে স্বপরিবারে বিষগাঁও গমন করেন। তিনি তাঁহার জন্য একটী জমিদারী ক্রয় করিতে রামহরিকে আদেশ করেন। তখন অসাধারণ প্রভু-ভক্তি-পরায়ণ রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে সেই বিষগাঁও প্রদান করিয়া বলিলেন, "মহারাজের কৃপাই আমার সমস্ত ধন সম্পত্তি, আমি ইহা মহারাজের জন্যই ক্রয় করিয়াছি, মহারাজ তাহা গ্রহণ করুন।" মহারাজ রামগঙ্গা সন্তুষ্ট-চিত্তে তাঁহার প্রিয় সহচরের দান গ্রহণ করিলেন। তৎপর তিনি বালিশিরা পরগণার কিয়দংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। রামহরি স্বীয় ভ্রাতা রামদুলালের নামে হরিতলা নামক মহালের

জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করেন। উজির দুর্গামণি মহারাজ দুর্গা-মাণিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন তৎপর উপায়ান্তর অভাবে তিনি রামগঙ্গার নিকট গমন করেন। মহারাজ রামগঙ্গার অনুরোধে রামহরি উজির দুর্গামণির নিকটে হরিতলা মহাল বিক্রয় করেন। এই ঘটনায় পর রামহরি জোয়ার বানিয়া চুং মধ্যে "তাং মহাম্মদ ছমি" নামক একটি জমিদারি ক্রয় করিয়া তথায় বাস ভবন নির্ম্মাণ করিতে সমুদ্যত হন।*

এইরূপে মহারাজ রামগঙ্গা ও তাঁহার ভ্রাতা কাশীচন্দ্র স্বীয় সহচর ও অনুচরবর্গের সহিত শ্রীহট্টবাসী হইলেন। তথায় তাঁহাদিগকে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইবে, ইহাই তাঁহারা স্থির করিলেন।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য স্বীয় শত্রুগণকে দূরীকৃত করিয়া রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। বিপদ সময়ে তিনি যে সকল ব্যক্তির নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের যথোচিত প্রত্যুপকার করিয়াছিলেন। ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গোকুল

* ইহার কিয়দংশ অদ্যাপি রামহরির উত্তরাধিকারি-গণ ভোগ করিতেছেন। বিষগাঁও ও বালিশিরা ত্রিপুরার রাজ ষ্টেটভুক্ত হইয়াছে। উজির দুর্গামণির উত্তরাধিকারী ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি ১২৯৫ ত্রিপুরাকে হরিতলা বিক্রয় করিয়াছেন।

ঘোষাল মহারাজ দুর্গামাণিক্যের সাহায্য করিয়াছিলেন এজন্য তিনি তাহাকে একখানা গ্রাম নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য অনেক ব্যক্তিকেও নানাপ্রকার নিষ্কর প্রদান করেন।

নুরনগরের নামকরণ কর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ তিতাস নদীর তীরে এক বাজার সংস্থাপন করিয়াছিলেন। লোকে তাহাকে "খাঁর হাটখলা" বলিত, মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মাতা রাণী মহোদয়া দেবী সেই বাজার ও তৎসন্নিহিত স্থান তালুক প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকট একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। তাঁহাদ্বারা সেই বাজারের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া লোকে অদ্যাপি তাহাকে মহোদয়াগঞ্জ বলিয়া থাকে। মৃত্যুকালে রাণী মহোদয়া দেবী স্বীয় পুত্রবধূ সুমিত্রাকে তাহা দান করিয়া যান।

মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মহিষী সুমিত্রার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর তিনি নকুল ঘালিমের কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য বারাণসী নগরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করেন। তিনি দ্বিতীয় বিজয়মাণিক্যের পৌত্র শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরকে ছত্র দণ্ড প্রভৃতি যৌবরাজ্য-চিহ্নাদি সমর্পণ করেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে

তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই। মহারাজ দুর্গা-মাণিক্য তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া শম্ভুচন্দ্রের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার সমর্পণ পূর্ব্বক বারাণসী যাত্রা করেন। তথায় পহুঁছিবার পূর্ব্বেই পাটনা নগরী সন্নিকর্ষে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। (১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল। ১২২২ ত্রিঃ অঃ ২৫ চৈত্র।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ত্রিপুর রাজলক্ষ্মী রামগঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। দুর্গামাণিক্যের মৃত্যু সংবাদ ত্রিপুরায় প্রচারিত হইলে জজ পেটন সাহেব ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারির দাবিদারগণকে উপস্থিত হইবার জন্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা, কুমার কাশীচন্দ্র, ঠাকুর শম্ভুচন্দ্র ও তাঁহার পিতা ঠাকুর রামচন্দ্র ও ঠাকুর অর্জ্জুনমণি এবং মহা-রাণী সুমিত্রা রাজত্বের দাবিদার স্বরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জজ সাহেব যুবরাজের অভাবে বড় ঠাকুরকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করিয়া সরাসরি বিচারে রামগঙ্গাকে ত্রিপুরারাজ্য ও জমিদারির অধিকারী বলিয়া অবধারণ করেন। তদনুসারে মহারাজ রামগঙ্গা পুনর্ব্বার রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। (১২২৩ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে)। শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অভি-

যেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে কিছুকাল অতীত হইয়াছিল। কারণ শম্ভুচন্দ্র, অর্জ্জুনমণি ও মহারাণী সুমিত্রা মহারাজ রামগঙ্গার বিরুদ্ধে রীতিমত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। শম্ভুচন্দ্রকে যুবরাজের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজ দুর্গামাণিক্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত মহারাজ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই বলিয়া, শম্ভুচন্দ্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হয়, যদি মহারাজ দুর্গামাণিক্যের দ্বারা শম্ভুচন্দ্র যথাবিধানে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন, তাহা হইলে ভূতপূর্ব্ব নরপতি রাজধরের প্রদত্ত বড়ঠাকুরী পদের বলে রামগঙ্গা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কারণ রামগঙ্গা স্বীয় আবেদন পত্রে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাজ দুর্গামাণিক্য জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তিকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই, এজন্য তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতির প্রদত্ত বড়ঠাকুরী পদের বলে রাজ্য ও জমিদারির স্বত্ববান্ হইতেছেন। *

* মহারাজ রামগঙ্গা স্বীয় আবেদন পত্রে বলিয়াছেন :— As your petitioner is the eldest son of Raja Rajdhar Manik, and his father also raised him to the rank of Burro Thakhur, and as in the life time of the deceased Raja Doorga Manik no one was appointed as Joobraj, your petitioner is consequently entitled to the Raj and landed estates.

অর্জ্জুনমণির পিতা কণ্ঠমণি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজধর মাণিক্যের রাজ্যাধিকারকালে অনুপস্থিত ও নীরব ছিলেন বলিয়া অর্জ্জুনমণি পরাজিত হন।

দুর্গামাণিক্যের জীবিতকালে রাণী সুমিত্রা সর্ব্বদাই শম্ভুচন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। তদনন্তর জজ পেটন সাহেবের নিকট ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখের ঘোষণাপত্র প্রচারের পর তিনি রামগঙ্গার পক্ষ সমর্থন করিয়া এক দরখাস্ত করেন। পুনর্ব্বার সেই দরখাস্ত অস্বীকার করতঃ রামগঙ্গার বিরুদ্ধে অমূলক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া পরাজিত হন।

উল্লিখিত মোকদ্দমা সমূহ নিষ্পত্তির পর গবর্ণমেণ্ট মহারাজ রামগঙ্গাকে খেলাত প্রদান পূর্ব্বক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩১ ত্রিপুরাব্দে) সিংহাসনে স্থাপন করেন। * তৎকালে তিনি স্বীয় ভ্রাতা কাশীচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করেন।

রামগঙ্গা দ্বিতীয়বার রাজ্যাধিকার করিলে, উজির দুর্গামণি ও রামহরি বিশ্বাসের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসন ক্ষমতা সমর্পিত হয়। মহারাজ রামগঙ্গা তাঁহাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়া-

---

* Letter from H. T. Prinsep Esq. Secretary to the Government (of India). To J. Hayes Esq. Judge and Magistrate of Tipperah.

Dated Fort William, 2nd June, 1821.

ছিলেন। উজির দুর্গামণি মহারাজের অনুগ্রহে এই সময় অনেকগুলি তালুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য তালুকের জন্য রামহরি লালায়িত ছিলেন না। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। * তাঁহাদের বিষগাঁও অবস্থান কালে রামহরি তথায় এক কালী দেবী সংস্থাপন করেন, রামহরির অনুরোধে মহারাজ রামগঙ্গা সেই কালী দেবতার সেবা পূজার ব্যয় চিরকাল রাজসরকার হইতে নির্ব্বাহ হইবে এরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। রামহরি মাইজখাড় গ্রামে স্বীয় মাতার শ্মশান ক্ষেত্রে এক সমাধি মন্দির (মঠ) নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত "করুণাময়ী" কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্টিত করেন। উক্ত মন্দিরের দ্বারস্থখোদিতলিপিপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় ১২২৬ ত্রিপুরাব্দে (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে) তাহা নির্ম্মিত হয়। উল্লিখিত মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে করুণাময়ী মূর্ত্তি স্থাপনকালে রামহরি তুলাপুরুষ প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করেন। তৎকালে যে কেবল বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এমত নহে, মিথিলা, বারাণসী ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশীয় প্রধান ব্রাহ্মণ

* রামগঙ্গা রাজচ্যুত হইবার পূর্ব্বে রামহরিকে কিঞ্চিৎ নিষ্কর ভূমি দান করেন। পুনর্ব্বার রামগঙ্গা রাজ্য প্রাপ্ত হইলে রামহরি কেবল করুণাময়ীর সেবা পূজার জন্য দেবোত্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত কোনরূপ ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই।

পণ্ডিতগণকেও নিমন্ত্রণ করিয়া ধন দানে পরিতৃপ্ত করেন। এই ক্রিয়া সম্পাদনকালে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বাহাদুর তাহার প্রিয় সহচর রামহরিকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ক্রিয়া সম্পাদনের দুই বৎসর পর মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য, চিরকাল করুণাময়ী দেবীর সেবা পূজা নির্ব্বাহ জন্য রামহরিকে দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেন। রামহরির প্রতি মহারাজ রামগঙ্গার এরূপ অতিরিক্ত অনুগ্রহ দর্শনে জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ তাঁহার রিপোর্টে মহারাজ রামগঙ্গার প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই "দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধ রাজা" তাহার বাঙ্গালি আমলার হস্তের ক্রীড়াপুত্তল মাত্র। মহারাজ রামগঙ্গা যে তাঁহার সুখ দুঃখের সহচর দুর্গামণি ও রামহরির এবম্প্রকার প্রত্যুপকার করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, তিনি তাঁহার সাধারণ ভৃত্য (সেবক) গোবিন্দভক্তিনারায়ণ প্রভৃতিকেও তালুক ও নিষ্কর প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শম্ভুচন্দ্র ঠাকুর আদালতের বিচারে অকৃতকার্য্য হইয়া বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিতে কৃত সঙ্কল্প হন। কাইপেং প্রভৃতি কতকগুলি হালাম ও কুকি শম্ভুচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করে। প্রায় তিন বৎসর কাল (১৮২৪ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে) শম্ভুচন্দ্রের সহিত রামগঙ্গার যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রজাবর্গকে শম্ভুচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করণোদ্দেশে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন।* কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণ শম্ভুচন্দ্রের এইরূপ অনুরক্ত ছিল যে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত পুরস্কার তুচ্ছজ্ঞান করিল। এই সময় শম্ভুচন্দ্র কিছুকাল পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ কাশীচন্দ্র ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।†

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে শম্ভুচন্দ্র পুনর্ব্বার রামগঙ্গার বিরুদ্ধে

* In June 1824 intelligence was received that Sumbhoo Thakur, brother of the Raja, whose claim to succeed had been rejected by the Sudder Dewauny Adalut, had set up the standard of rebellion in the Chittagong Hill Tracts, and prohibited the Joomea cultivators from paying revenue to Government. A reward of Rs. 5000 was offered for his apprehension, his praperty, both in Hill and Plain Tipperah, was ordered to be confiscated; and if caught, he was to be summarily tried by martial law.

Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. Page 276.

† মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

অস্ত্রধারণ করেন। বারংবার যুদ্ধ করিয়া সুবা ধনঞ্জয়ের বাহু বলে শম্ভুচন্দ্র পরাজিত হন।

চরমাবস্থায় মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য যুবরাজ কাশী-চন্দ্রের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার সমর্পণ করেন।

মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের একমাত্র পত্নী চন্দ্রতারা মহাদেবীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। সেই বালক কৃষ্ণ কিশোর আখ্যা প্রাপ্ত হন। রামগঙ্গা কৃষ্ণকিশোরকে বড়ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। রামগঙ্গার জীবিতা-বস্থায় মহারাণী চন্দ্রতারা দেবী মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ম্মল ছিল। তিনি পারস্য ভাষা এবং ভূমিপরিমাণ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনি শস্ত্র ও মল্লযুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। মহারাজ রামগঙ্গা বৃন্দাবনে একটী কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে রাসবিহারী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বামুটীয়া পরগণা দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় গুরু ও গুরুপত্নীর নামানুসারে ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, আগর-তলায় স্থাপন করেন।

১২৩৬ ত্রিপুরাব্দের ২৯ কার্ত্তিক (১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ নবেম্বর) রজনী যোগে,—চন্দ্রগ্রহণ সময় মস্তকে দীক্ষাগুরুর পদ এবং

বক্ষে শালগ্রাম চক্র ধারণ করিয়া ধর্ম্ম পরায়ণ মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য পরলোক গমন করেন।

মহারাজ রামগঙ্গার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করেন। এই ঘটনার ৪ মাস অন্তে ১২৩৭ ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুণ মাসে (১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে) তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া রীতিমত সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঠাকুর শম্ভুচন্দ্র এই সময় ত্রিপুরা পর্ব্বত অধিকার নিমিত্ত এক আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করেন। বার্ষিক ২৫০০০ টাকা রাজস্ব স্বীকার পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশ বন্দোবস্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তিনি গবর্ণর জেনেরল নিকট আবেদন করেন। কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বত একটি স্বাতন্ত্র্য রাজ্য বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন।*

বুদ্ধিমান নরপতি মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য বিবেচনা

* মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত কলহ করিয়া (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজবংশীয় অন্য এক ব্যাক্তি পার্ব্বত্য ত্রিপুরা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করেন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশ চাকলে রোশনাবাদের একাংশ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাগজাত আলোচনা করিয়া বলেন যে, পার্ব্বত্য প্রদেশ কখনই বন্দোবস্তী মহাল চাকলে রোশনাবাদের একাংশ নহে।

করিলেন যে, এবম্প্রকার আত্মকলহই রাজ্যনাশের কারণ। এইজন্য তিনি ঠাকুর শম্ভুচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি ও সদ্ভাব সংস্থাপন করিলেন। এবং তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য মাসিক পঞ্চশত মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিলেন। ঠাকুর শম্ভুচন্দ্র তাহা প্রাপ্ত হইয়া কুমিল্লা নগরে শান্তভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ কাশীচন্দ্র একজন বিলাসী নরপতি ছিলেন। ব্রহ্ম যুদ্ধের সময়ে অনেকগুলি মণিপুরী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যুবক কাশীচন্দ্র মণিপুরী রমণীগণের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথমতঃ মণিপুরের রাজকন্যা কুটিলাক্ষীকে বিবাহ করেন। তদনন্তর মণিপুরের সাধারণ বংশীয় আরও তিনটী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার আরও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পত্নী ও উপপত্নী ছিল। মহারাণী কুটিলাক্ষীর গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কাশীচন্দ্রের অভিষেক কালে তিনি রামগঙ্গার পুত্র কৃষ্ণকিশোরকে যুবরাজের পদে ও কৃষ্ণচন্দ্রকে বড়ঠাকুরের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

কোন বিশেষ কারণে মহারাজ কাশীচন্দ্র ফরাসী দেশীয় এক কোরজোন সাহেবকে চাকলে রোশনাবাদের ম্যানেজা-

রের পদে নিযুক্ত করেন।* এই সময় হইতে ত্রিপুর রাজ সরকারে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত আরম্ভ হয়।

পারিবারিক কোন অকথ্য কারণে মহারাজ কাশীচন্দ্রের সহিত যুবরাজ কৃষ্ণকিশোরের মনোমালিন্য হইলে তিনি আগরতলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদয়পুরে গমন করেন। তথায় অল্পকাল বাস করিয়া জ্বররোগে (১২৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২৩শে পৌষ) মহারাজ কাশীচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। অপরিমিত মদ্যপানই তাঁহার অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ।

মহারাজ রামগঙ্গার শাসনকালে চাকলে রোসনাবাদের অধিকারিত্ব লইয়া অনেকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, মহারাজ রামগঙ্গা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার অধিকাংশ পরিশোধ করিয়া যান, অবশিষ্ট মহারাজ কাশীচন্দ্র পরিশোধ করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কাশীচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর ১২৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২৯ পৌষ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ১২৪০ ত্রিপুরাব্দের

* এফ্ কোরজনের পুত্রগণের অট্টালিকা চন্দননগর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বৈশাখ মাসে (১৮৩০ খৃঃ ১০ মে)তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ মাজেষ্ট্রেট টমসন সাহেব* গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে আগরতলায় উপনীত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যকে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক প্রদত্ত সনন্দ † ও খেলাত প্রদান করেন। মহারাজ তৎকালে ৬৩।০ আনা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা গবর্ণমেণ্টকে "নজর" প্রদান করিয়াছিলেন।‡ মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তৎকালে আড়াই বৎসর বয়স্ক স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ঈশানচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য আসামের রাজকন্যা রত্নমালা এবং মণিপুরের রাজা মারজিতের কন্যা চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী ও

* ইনি ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর সার রিভার টমসনের পিতা।

† সনন্দ খানা পারসী ভাষায় লিখিত, তাহার ইংরেজি অনুবাদ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে। এই সনন্দ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ্চের লিখিত।

‡ নজরের মুদ্রার তালিকা টমসন সাহেবের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২১ মে তারিখের চিঠি হইতে উদ্ধৃত হইল।

১টী স্বর্ণ মোহর	১৯৲
২টী স্বর্ণ মোহর (রাজার নিজ টাকশালে মুদ্রিত) ...	২৮।০
১৬টী রৌপ্য মুদ্রা	১৬৲
	৬৩।০

বিধুকলাকে ক্রমে ক্রমে বিবাহ করেন। তদ্ভিন্ন মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের ত্রিপুরা ও মণিপুরী জাতীয় অনেকগুলি পত্নী ও উপপত্নী ছিল। পরম ভাগ্যবতী রাণী সুদক্ষিণার গর্ভে যুবরাজ ঈশানচন্দ্র, এবং কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র ও বীরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। অখিলেশ্বরীর গর্ভে কুমার নীলকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। তদ্ব্যতীত চক্রধ্বজ, মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, সুরেশ কৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র নামে তাহার আরও ৫টী পুত্র এবং ১৫টী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

অল্পকাল মধ্যেই বৃদ্ধ উজির দুর্গামণির সহিত মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কলহ করিতে উদ্যত হইলেন। অপব্যয়ী নরপতি সর্ব্বদাই বৃদ্ধ উজিরকে টাকার জন্য উৎপীড়ন করিতেন। পুত্রশোকগ্রস্ত বৃদ্ধ উজির বিবেচনা করিলেন যে, পুরুষানুক্রমের সঞ্চিত সমস্ত অর্থদান করিয়াও এই অপব্যয়ী নরপতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত ধন সম্পত্তি গোপনে স্বীয় তহসীল কাছারী শিঙ্গারবিল নামক স্থানে প্রেরণ করেন। অবশেষে ১২৪৩ ত্রিপুরাব্দে একদা রজনী যোগে পলায়ন পূর্ব্বক আগরতলা পরিত্যাগ করিয়া সেই শিঙ্গারবিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কমিসনর সাহেব পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্রিটীস রাজ্যের একাংশ বলিয়া তাহা খাসদখল করিবার

জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। মহারাজ ও তাঁহার কলিকাতাস্থ এজেণ্ট বিগনেল্ সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড অক্‌লেণ্ড বাহাদুর কমিসনারের রিপোর্ট ও তাহার উত্তর এবং তৎসঙ্গীয় অন্যান্য কাগজ পর্য্যালোচনা করিয়া পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, স্বাধীন রাজ্য অবধারণ পূর্ব্বক কমিসনর সাহেবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন।*

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; শস্ত্র বিদ্যা ও মল্ল যুদ্ধে সুনিপুণ ছিলেন, তন্ত্র শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ঘোর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বিলাসী নরপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার পাচিকা (মণিপুরী ব্রাহ্মণ কন্যা) পূর্ণকলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের জীবনী ব্যাঘ্র শীকার, ব্যাঘ্রের বিবাহ, কোঁড়া শীকার প্রভৃতি ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। ইতিহাস লেখকের উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা তাহার জীবনে দেখা যায় না। কুকিদিগের অত্যাচার ও জমি-

* The Raja has an independent Hill territory; that your. propositions for its resumption are totally inadmissible.

Government letter to the Comissioner of Chittagong. Dated the 27th December, 1838.

দারি সংক্রান্ত ঘটনাবলী যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। শীকারের সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়া তিনি আগরতলার নিকটবর্ত্তী এক জলাভূমিতে "নূতন হাবেলী" নামক নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই স্থানে রাজপাঠ স্থাপন করেন। কৃষ্ণকিশোর তাহার দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্রকে বড়ঠাকুরী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অন্তঃপুর পত্নী উপপত্নীতে পূর্ণ করিয়া, চাকলে রোশনাবাদ ঋণজালে বদ্ধ করিয়া ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের ২রা বৈশাখ রজনী যোগে, বজ্রাঘাতে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য প্রাণত্যাগ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ ঈশানচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের ২০ মাঘে (১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী) মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্রের অভিষেক কালে গবর্ণমেণ্ট ১২৫টী স্বর্ণ মুদ্রা "নজর" প্রদান করিবার জন্য আদেশ করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১১১টী স্বর্ণমুদ্রা নজর গৃহীত হয়। প্রথমতঃ ত্রিপুরেশ্বরগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার মানসে নজর স্বরূপ কয়টী স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের অভিষেক কালেও ৬৩।০ টাকা মূল্যের কয়েকটী স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার ১৯ বৎসর অন্তে সেই ৬৩।০ টাকা ১১১ থান মোহরে পরিণত

হয়। ইহার ২০ বৎসর অন্তে কিরূপ হইয়াছে তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। অভিষেককালে মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজাসনে উপবেশন করিয়া মহারাজ ঈশানচন্দ্রকে ১১ লক্ষ টাকার ঋণভার মস্তকে বহন করিতে হইল। তিনি তাঁহার পিতামহী মহারাণী চন্দ্রতারা দেবীর জনৈক দাসীর গর্ভজাত বলরাম "হাজারিকে" দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার অর্পণ করেন। তাঁহার যত্নে মহারাজ ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বলরাম ও তাহার ভ্রাতা শ্রীদামের দুর্ব্ব্যবহারে ত্রিপুরাবাসীগণ অল্পকাল মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্বসাধারণের পরামর্শানুসারে পরীক্ষিৎ ও কীর্ত্তি নামক দুইজন দুর্দ্দান্ত পর্ব্বতবাসি ত্রিপুরা-সরদার কতকগুলি ত্রিপুরা ও কুকি সংগ্রহ করিয়া ১২৫৯ ত্রিপুরাব্দের ১২ই চৈত্র গভীর রজনীতে বলরামের বাটী আক্রমণ করে। বলরাম পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন; শ্রীদাম, কীর্ত্তির হস্তে নিহত হন। মহারাজ ঈশানচন্দ্র বলরামের শত্রুগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র কীর্ত্তির প্রাণবধ করিলেন। কোন অকথ্য কারণে বলরামের প্রতি যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রের কিঞ্চিৎ

অতিরিক্ত অনুগ্রহ ছিল। সেই অনুগ্রহের বলে বলরাম কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মহারাজ ঈশানচন্দ্র তাঁহার বাধা জন্মাইতেন। দুষ্ট বলরাম এইজন্য মহারাজ ঈশান চন্দ্রের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া, তিনি প্রিয় সুহৃদ রাম-মাণিক্য বর্ম্মণ, কাপ্তান সর্দ্দার খাঁ ও ছোবান খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন সৈনিকের সহিত দলবদ্ধ হইয়া, গোপনে মহা-রাজ ঈশানচন্দ্রকে হত্যা করিয়া, যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে পরামর্শ করেন। মহারাজ জনৈক বিশ্বস্ত অনুচর মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া, কার্য্য কালে চক্রান্তকারীদিগকে ধৃত করণার্থে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হই-লেন। যথা সময় কাপ্তান সরদার খাঁ মহারাজকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইলে মহারাজ তাহাকে ধৃত করিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তদনন্তর বলরাম ও রাম-মাণিক্যকে এই ষড়যন্ত্রিদলের নেতা জানিয়া তাহাদিগকেও নির্ব্বাসিত করেন। তৎকালে ব্রজমোহন ঠাকুরের হস্তে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার সমর্পিত হইল।

কিছুকাল ত্রিপুরাবাসীকে জ্বালাতন করিয়া প্রজাপীড়ক ও অপরিমিত মদ্যপ্যায়ী যুবরাজ উপেন্দ্রচন্দ্র ১২৬১ ত্রিপুরাব্দের বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের প্রথম পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মে নাই। দ্বিতীয়-পত্নী মুক্তাবলী দেবীর গর্ভে

১২৬১ ত্রিপুরাব্দের পৌষমাসে জ্যেষ্ঠ কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার চতুর্থ পত্নী জাতীশ্বরী দেবীর গর্ভে ১২৬৬ ত্রিপুরাব্দের ১৩ মাঘ দ্বিতীয় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তদনন্তর তৃতীয় পত্নী চন্দ্রেশ্বরী দেবীর গর্ভে এক কন্যা ও জাতীশ্বরী দেবীর গর্ভে তৃতীয় কুমার রোহিনীচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

ব্রজমোহন ঠাকুর ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া পদে পদে অপমানিত হইতে লাগিলেন। এক এক সময় চাকলে রোশনাবাদ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য বিক্রীত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা নিবাসী খ্যাতনামা বাবু (পশ্চাৎ রাজা) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আগরতলায় উপস্থিত হইয়া অল্পকাল মধ্যে মহারাজকে অঋণী করিবেন প্রকাশ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করিতে উদ্যত হইলে অন্যান্য অমাত্যবর্গের পরামর্শে মহারাজের গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিলেন। গুরুর প্রতি মহারাজের অচলা ভক্তি ছিল। তিনি কদাচ গুরুর আজ্ঞা অবহেলন করিতেন না। এইজন্য দক্ষিণারঞ্জনের নিয়োগপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া করযোড়ে বলিলেন "প্রভো! আমি চাকলে রোশনাবাদ রক্ষার উপায় দেখিতেছি না।

নিরুপায় হইয়া আমার রাজ্য ও জমিদারির ভার আপনার চরণে সমর্পণ করিলাম, আপনি রক্ষা করুন।" ১২৬৫ ত্রিপুরাব্দের ১৬ আষাঢ় বিপিনবিহারী ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন। শুভক্ষণে তিনি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

গুরু বিপিনবিহারী বিশেষ লেখা পড়া জানিতেন না, তথাচ তিনি বুদ্ধিবলে ও সুকৌশলে সুন্দররূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বিপিনবিহারী জানিতেন, মহারাজ ঈশানচন্দ্র প্রাণান্তেও তাঁহার বাক্য অবহেলা করিবেন না, তথাপি তিনি নৃপতি কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ অমাত্য ব্রজমোহন ঠাকুর, গোলোকচন্দ্র সিংহ ও গুরুদাস বর্দ্ধনের মত গ্রহণ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। বিপিনবিহারীর সুশাসনে রাজ্য ও জমিদারির আয় বৃদ্ধির সূত্রপাত হইল। তিনি আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া ঋণ পরিশোধ ও ধন সঞ্চয়ের পথ পরিষ্কার করিলেন। বিপিনবিহারীর সমস্ত সংগুণের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ দোষ ছিল; ১—তিনি সামরিক বিভাগের জন্য ব্যয় অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন; ২—আশু লভ্যজনক না হইলে তিনি কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। ৩—তিনি জমি জমা সংক্রান্ত কার্য্য ভালরূপ জানিতেন না, এইজন্য অর্থব্যয় করিয়া যে, সম্পত্তি রক্ষা করিতে হয় ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেন না; এজন্য

তাঁহার শাসনকালে রাজ্য ও জমিদারির সীমান্ত স্থানে স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে।

কোন কোন ত্রিপুর নৃপতির রাণী ও শালা সম্বন্ধি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজ কোষের দুর্নিবার্য্য শত্রু হইয়া থাকেন। রাজ-কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই ইঁহাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হন। কিন্তু বিপিনবিহারীর শাসন কালে এই সকল ব্যক্তির কোন রূপ মুখব্যাদানের অধিকার ছিল না।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "সিপাহি বিদ্রোহ" সময়ে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সৈন্যগণ সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরা পতির নিকট আসিতেছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ঈশানচন্দ্র তাহাদিগকে ত্রিপুরা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটীস রাজ্য দিয়া কাছাড়াভিমুখে প্রস্থান করেন। কয়েকজন বিদ্রোহী সেই আদেশ অবহেলা পূর্ব্বক আগরতলার নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কুমিল্লাস্থ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তথায় তাহাদের ফাঁসী হইয়াছিল। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের ২৫ শে অগ্রহায়ণের ৩২০ নং চিঠী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ত্রিপুরারাজ্যের উত্তর বিভাগে, বিদ্রোহী সৈন্যগণের অনুসন্ধান ও গতিরোধ

জন্য ত্রিপুরসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণকে উপযুক্ত সময়ে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য মহারাজের পক্ষে গোলোকচন্দ্র সিংহ মহাশয় "পলিটীকেল অফিসার" স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন। *

মহারাজ ঈশানচন্দ্র স্বীয় পুত্র ব্রজেন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র কে যুবরাজ ও বরঠাকুরের পদে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করেন। কুমার নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্র ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের অনুকম্পায় সেই সেই পদ লাভের অভিলাষী হইলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে মহারাজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া তাঁহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণ ও অন্যান্য কয়েকটী গুরুতর কার্য্যের পরামর্শ জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে চট্টগ্রামের কমিসনর বক্লেণ্ড সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গ্রেহাম সাহেবকে আগরতলায় প্রেরণ করেন। তিনি মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ আগষ্ট কমিসনর সাহেব নিকট যে সুদীর্ঘ রিপোর্ট করেন

---

* গবর্ণমেণ্ট সন্দেহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে বিদ্রোহীগণের সাহায্যকারী বলিয়া ত্রিপুরারাজ্য দখল ও ত্রিপুরাপতিকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য অনুমতি প্রচার করেন। জজ মেটকাফ্ সাহেব গবর্ণমেণ্টের অমূলক সন্দেহ ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা করেন।

তাঁহার স্থূলমর্ম্ম এইরূপ ঃ—"কুকিদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রান্তভাগে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সৈন্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, মহারাজ তাহাতে সম্মত নহেন। তিনি তাঁহার নিজ সৈন্য উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রস্তুত আছেন। নিবিড় অরণ্যে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ কুকিদিগের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবে না, আগামী শীত ঋতুতে মহারাজ তাঁহার অধীনস্থ বৃহৎ একদল কুকি সেনা দুরন্ত কুকিদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন, আমার বিশ্বাস মহারাজ সরল ভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন। এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।"

"যু্বরাজ এবং বরঠাকুর নিযুক্ত সম্বন্ধে আমরা আরও ৩। ৪ বৎসর তাঁহাকে উৎপীড়ন না করি, ইহা মহারাজ প্রকাশ করিলেন; তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল যে, তিনি ঐ কালের পর বর্ত্তমান দাবিদার ঠাকুর নীলকৃষ্ণ ও বীরচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বীয়পুত্র দ্বয়কে ঐ দুইটি পদে নিযুক্ত করিবেন। উক্ত ঠাকুরদ্বয়কে তিনি ঐ দুই পদের অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন। ঠাকুর দ্বয় ঐ দুই পদে নিযুক্ত হইলে গুরু নিশ্চয়ই রাজ্য হইতে তাড়িত হইবেন। স্বীয়পুত্র দ্বয়কে ঐ দুই পদে নিযুক্ত করিয়া গুরুর ক্ষমতা অবিচলিত ভাবে রক্ষা করাই মহারাজের অভিপ্রায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।"

"গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পর্ব্বত ত্রিপুরা (টপোগ্রাফিকেল্ সার্ভে) জরিপ করিবার কারণ মহারাজের সম্মতি প্রদান জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, উক্ত জরিপী কার্য্য, যে প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে এবং ইহাদ্বারা যে মহারাজের কোন ক্ষতির কারণ নাই তাহাও বলা হইয়াছিল, এই প্রস্তাবে মহারাজ সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় এক্ষণ মহারাজের সেই মত নাই, এজন্য আমি তাঁহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারি না। নির্ব্বোধ, অজ্ঞ, অবিনীত গুরু গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সরল ও নির্দ্দোষ কার্য্যকেও তাঁহার ক্ষমতার প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করে।"

তদনন্তর কমিসনর বক্‌লেণ্ড সাহেব কুমিল্লায় মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট বকলাণ্ড সাহেবের মত অনুমোদন করেন। কমিসনর বক্‌লেণ্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ নবেম্বর একখণ্ড রোবকারী ত্রিপুরাপতির নিকট প্রেরণ করেন। এই রোবকারিখানাকে গবর্ণমেণ্টের সহিত ত্রিপুরাপতির সন্ধিপত্র বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরার স্বাধীনতার প্রতি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না; মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে যুবরাজ নিযুক্ত করিবেন ইত্যাদি বিষয় ঐ রোবকারীতে লিখিত আছে। এই রোবকারীর একখণ্ড ইংরেজি অনুবাদ পশ্চাৎ সন্নিবিষ্ট হইবে।

এই সময় জিলা ত্রিপুরার জমিদারগণ ১০০ বিঘার ন্যূনপরিমাণ "অসিদ্ধ" নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠেন। সরাইলের জমিদারের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে গুরু বিপিন বিহারী গোস্বামী চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত "সিদ্ধ" "অসিদ্ধ" নিষ্কর বাজেয়াপ্তের জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তিনি অবস্থানুসারে উন্মত্তবৎ বল প্রয়োগ ও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরম ধার্ম্মিক ঈশানচন্দ্র মাণিক্য গুরুর পদ যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন "প্রভো! এই কার্য্য হইতে বিরত হউন। আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ অনেক নিষ্কর দান করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল নিষ্কর মধ্যে যদি কাহারও সনন্দ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা হরণ করিলে আমাকে ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে।" স্বার্থান্ধ গুরু বলিলেন, "বাবা! তোমার সমস্ত পাপ আমি গ্রহণ করিলাম। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া আমি তোমার আয় প্রায় লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিব।" গুরুর এই বাক্য মহারাজের কিছুমাত্র প্রীতিকর বোধ হইলনা। প্রথমেই বলক্রমে একজন রাজপুরোহিতের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার কর ধার্য্য করিলেন। তাহার বন্দোবস্তী পাট্টাতে মহারাজের মোহর অঙ্কিত করিবার জন্য গুরু সেই পাট্টা লইয়া রাজ সমক্ষে উপস্থিত হইলে, মহারাজ পুনর্ব্বার গুরুকে বলিলেন "প্রভো! এই কার্য্য হইতে বিরত হউন।"

গুরু বলিলেন "বাবা! তাহা হইবে না।" এই কথা বলিয়া গুরু মহারাজের বাক্স খুলিয়া মোহর গ্রহণ করত তাহাতে কালী মাথাইয়া মহারাজের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আমার আজ্ঞা পালন জন্য তোমাকে এই পাট্টায় মোহর করিতে হইবে।" গুরুভক্তি পরায়ণ নৃপতি গুরুর আজ্ঞা পালন জন্য "শ্রীগুরু আজ্ঞা" মোহর তাহাতে অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মভীরু নৃপতির হৃদয় ও হস্ত কম্পিত হইল। ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মহারাজ একখণ্ড চিঠী লিখিতে ইচ্ছা করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন, কিন্তু লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিলেন না, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে ৩৩ বৎসর বয়ক্রমে (১২৭১ ত্রিপুরাব্দে) মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য জীবনান্তকর বাতব্যাধী রোগে আক্রান্ত হইলেন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কয়েক মাস অন্তে তিনি চিরজীবনের জন্য শয্যাশায়ী হইলেন।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে স্বপরিবারে বাস করিবার জন্য একটী নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। সেই অট্টালিকা প্রস্তুত হইলে ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই শ্রাবণ মহারাজ নূতন গৃহে প্রবেশের দিনাবধারণ করিলেন।

একদা মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মহিষীগণ এবং তাঁহার বিমাতা মহারাণী রত্নমালা যুবরাজ এবং বরঠাকুর নিয়োগ

সম্বন্ধে কি করা হইবে, ইহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে মহারাজ বলিলেন, "আমার পুত্রদ্বয় শিশু, আমি শারীরিক নিতান্ত অসুস্থ, এরূপ অবস্থায় আমার পুত্রগণকে ঐ দুইপদে নিযুক্ত করিয়া আমার মৃত্যু হইলে, আমার দুরন্ত ভ্রাতৃগণ তাহাদের প্রাণবধ করিবে। যদি কাহাকেও নিযুক্ত না করি তাহা হইলে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বর আমাকে রোগ মুক্ত করিলে ২।৩ বৎসর পর ব্রজেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে ও নবদ্বীপচন্দ্রকে বড় ঠাকুরী পদে নিযুক্ত করিব।"

নির্দ্দিষ্ট ১৬ই শ্রাবণ পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে মহারাজ ঈশানচন্দ্র নূতন নিকেতনে প্রবেশ করিলেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্ণে (প্রায় ১০ ঘটিকার সময়) অসাধারণ গুরুভক্তি-পরায়ণ প্রজারঞ্জক মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ৩৪ বৎসর বয়ক্রমে লোকান্তর গমন করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর ৪ দিবস অন্তে (৪ আগষ্ট ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ) ত্রিপুরার জজ, মাজেষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবগণ নিকট একখণ্ড রোবকারী উপস্থিত হইল। সেখানা এইরূপ :—



"রোবকারী কাছারি এলাকে রাজগী পর্ব্বত ত্রিপুরা, হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ইতি সন ১২৭২ ত্রিপুরা, তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এপক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত, রাজত্ব ও জমিদারি শাসন বিষয়ী কার্য্য সুচারুমতে নির্ব্বাহ হইতেছে না এবং যে প্রকার ব্যামোহ ৺ইচ্ছাধীন কোন সময় প্রাণ বিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই এমতেই এপক্ষের খান্দানের চিররীতিমতে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ, তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর ও কর্ত্তা নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেমতে হুকুম হইল যে—

যুবরাজী পদে এপক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথমপুত্র শ্রীলশ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্ত্তা পদে দ্বিতীয়পুত্র শ্রীলশ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এবিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিম্বা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনর সাহেব বাহাদুরান ও জেলা ত্রিপুরা ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীলশ্রীযুক্ত জজ সাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত মাজেষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ হয় ইতি।"

মোকাবেলা শ্রীশ্রীসহী। মং শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত
শ্রীগুরুদাস বর্দ্ধন। মোহরের।
পেস্কার।

বীরচন্দ্র ও তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণ প্রচার করিলেন যে, "মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস এই সকল নিয়োগ করিয়াছেন।" কিন্তু জনসাধারণ বলিতে লাগিল "মহারাজের মৃত্যুর পর গুরু বিপিন বিহারী, ঠাকুর ব্রজমোহন, গোলোকচন্দ্র সিংহ ও গুরুদাস বর্দ্ধন প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিগণ পরামর্শ করিয়া বীরচন্দ্র ঠাকুরের যোগে এই রোবকারী সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত মহারাজের পুত্রগণ নাবালক, এই সূত্র অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারি খাস মেনেজমেণ্ট নিতে পারেন; কিম্বা

দুর্দ্দান্ত কুমার নীলকৃষ্ণ আগরতলায় উপস্থিত হইয়া মৃত মহারাজের স্ত্রী, পুত্র ও প্রধান কর্ম্মচারিগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজ্যাধিকার করিতে পারেন, দ্বিবিধ আশঙ্কাই এই রোবকারী সৃষ্টির মূলীভূত কারণ।”

চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ “এই রোবকারী অসত্য” এইরূপ প্রকাশ করিয়া ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সমীপে ত্রিপুরারাজ্যের দাবিদার বলিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিপুরার মাজেষ্ট্রট, চট্টগ্রামের কমিসনর নিকট রিপোর্ট করিলেন। কমিসনর সাহেব বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে,“ত্রিপুরাপতি ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছে, ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকগুলি দাবিদার উপস্থিত; তন্মধ্যে বীরচন্দ্র রাজা এবং ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের নাবালক পুত্রদ্বয় (ব্রজেন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র) যুবরাজ ও বরঠাকুর স্বরূপ এক্ষণ দখলকার আছেন। অতএব আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট একজনকে দখলকার রাজা স্বীকার করিয়া অন্যান্য দাবিদারগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইয়া জমিদারিতে স্বত্ব সাব্যস্থ করিবার জন্য উপদেশ করিলেই চলিতে পারে।”*

কমিসনর সাহেবের রিপোর্টের প্রত্যুত্তরে বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর “ বীরচন্দ্র ঠাকুরকে ত্রিপুরার

---

* *Commissioner's letter to the Secretary to the Government of Bengal. No 359B. Dated 7th August* 1862.

ডিফেক্টো” রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্যান্য দাবিদারকে উচিত পন্থা অবলম্বনার্থে উপদেশ প্রদান করেন।

অল্পকাল মধ্যেই বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ জমিদারির দাবিতে দেওয়ানী আদালতে দুইটী মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য যুবরাজ প্রভৃতি নিয়োগ না করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিবাদী বীরচন্দ্র, গুরু বিপিন বিহারী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীর সহিত চক্রান্ত করিয়া যুবরাজাদি নিযুক্ত হওয়া মিথ্যা প্রচার পূর্ব্বক এই সম্পত্তি অন্যায়রূপে দখল করিয়াছেন। মৃত মহারাজার জীবিত ভ্রাতৃগণ মধ্যে তাহারা জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তাহারাই রাজত্ব ও জমিদারির সত্বাধিকারী বটেন।

নীলকৃষ্ণ অতিরিক্ত এই বলিলেন যে, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের বিবাহিতা পত্নী (ঈশ্বরী) গণের গর্ভজাত সন্তান মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ সুতরাং তিনিই রাজ্য ও জমিদারির অধিকারী। চক্রধ্বজ বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত নহেন।

উভয় মোকদ্দমায় মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ণনাদ্বারা উত্তর প্রদান করিলেন যে, তিনি ঈশানচন্দ্র দ্বারা যুবরাজি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই রাজ্য ও জমিদারির অধিকারী। যুবরাজ প্রভৃতির অভাবে মৃত রাজার নিকট

সম্পর্কিত ব্যক্তিই তাঁহার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, বাদিগণ তদ্রূপ ব্যক্তি নহেন।

মৃত মহারাজার জীবিত ভ্রাতৃগণ মধ্যে প্রকৃত পক্ষে চক্রধ্বজই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। নীলকৃষ্ণ তাঁহাকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের অবৈধপুত্র নির্ণয় করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। কারণ তাহা না হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতে পারেন না, স্বার্থান্ধ নীলকৃষ্ণের এবংবিধ কার্য্য দ্বারা ত্রিপুর রাজবংশের লুক্কায়িত কুৎসা প্রচারের সূত্রপাত হইল। রাজবংশধরগণ যে কার্য্যে লজ্জা বোধ করেন নাই, আমরা তাহাতে লজ্জা বোধ করিতেছি। আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিব না।

ইযুধার্য্য হওয়ার পর তিন পক্ষই অধিকাংশ "ঠাকুর লোক" কে সাক্ষী মান্য করিলেন।

আবুল ফাজেল যাঁহাদিগকে "নারায়ণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর ও অন্যান্য উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অধুনা ঠাকুর লোক বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। ব্রিটীসাধিকারের পূর্ব্বে ইহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু অধুনা ইহারা মহারাজের অনুগ্রহ প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। শুক্র যৎকালে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের ঋণ পরিশোধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি এই সকল ঠাকুর লোকের বৃত্তি

হ্রাস ও অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা গুরুরপ্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। কিন্তু ঈশানচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহারা গুরুর কিছুমাত্র অনিষ্ট কল্পনা করিতে পারেন নাই। যখন উল্লিখিত মোকদ্দমায় "ঠাকুর লোক" দিগের নাম সাক্ষীর ইসিমনবিসী ভুক্ত হইল, তখন তাঁহারা সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বীরচন্দ্রকে বলিলেন, "মহারাজ! হয় আমাদিগকে বিদায় দিন, নচেৎ গুরুকে অবসর করুন; আমরা তাঁহার অত্যাচার আর সহ্য করিতে পারি না।"

তৎকালে মহারাজ বীরচন্দ্র এবম্প্রকার অবস্থায় পতিত ছিলেন যে, তিনি কোন রূপেই "ঠাকুরলোক" দিগকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুকে রাজ্য হইতে তাড়িত করিলে, তিনি চক্রধ্বজ ও নীলকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ভীষণ শত্রু হইয়া দাড়াইতে পারেন। সুতরাং ঘটনা চক্রের আবর্ত্তনে বাধ্য হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৭৩ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভে গুরুকে অবরুদ্ধ করিলেন * এবং

*গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য পূর্ণানন্দ সিংহ ঐ অব্দের ২১ আষাঢ় ও গুরুর ভ্রাতা নবকৃষ্ণ গোস্বামী ৯ ভাদ্র জেলা ত্রিপুরার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকটে দুই খণ্ড দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পূর্ণানন্দের দরখাস্তে জয়েন্ট ম্যাজেষ্ট্রেট মিলেট ১৮৬৩ খৃঃ ৬ই জুলাই ও নবকৃষ্ণের দরখাস্তে ম্যাজেষ্ট্রেট আর, এল, মেঙ্গল সাহেব ঐ অব্দের ২৪ আগষ্ট

"ঠাকুরলোক" দিগের সম্মতিক্রমে রাজ্য ও জমিদারির শাসনভার ব্রজমোহন ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময় ত্রিপুরা পর্ব্বত মধ্যে জমাতিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতির একটী পরাক্রমশালী সম্প্রদায় প্রাচীনকালে দলবদ্ধ থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরের সৈনিককার্য্যনির্ব্বাহ করিত, এইজন্য ইহারা জমাতিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা সেই পরাক্রমশালী জমাতিয়াগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ওয়াথিরায় হাজারি নামক জনৈক কর্ম্মচারীর অত্যাচারে জমাতিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জমাতিয়াদিগকে দমন করিবার জন্য মহারাজ প্রথমতঃ যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। অবশেষে কুকি সৈন্য দ্বারা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা হইয়াছিল। কুকিগণ অপনাদের বিজয় চিহ্ন স্বরূপ নিহত জমাতিয়াদিগের মুণ্ড লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সেই সকল মুণ্ড ভীতি প্রদর্শক বিজয়ী কেতন স্বরূপ সুদীর্ঘ বংশোপরি বিলম্বিত হইয়াছিল। *

যে হুকুম দেন, তাহাতে বিপীন বিহারী ব্রিটীস প্রজা নহেন বলিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে তাঁহারা অসম্মত এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

*এই বীভৎস ঘটনা সম্বন্ধে ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজেষ্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব স্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন।

The heads of this (Jamatyas) were cut off

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র এই সময় মানবলীলা সংবরণ করেন।

ব্রজমোহন ঠাকুর গুরুর অবরোধ হইতে সমস্ত শাসন ভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রধান ঠাকুরগণ তৎকালে "রণ মুখো সিপাহির" ন্যায় নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগদ্বারা স্বীয় অনুকূলে নীলকৃষ্ণ ও চক্রধ্বজের মোকদ্দমায় সাক্ষী দেওয়াইবার জন্য মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর সেই সময় কূর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।* তাঁহাদের এবম্প্রকার ব্যবহার অবগত হইয়া ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজেষ্ট্রেট মেঙ্গল সাহেব জ্বলন্ত ভাষায় স্বীয় রিপোর্টে কমিসনর সাহেবকে তাহা জানাইয়াছিলেন। এই রিপোর্টে তিনি গুরুর শাসন প্রণালীর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তৎকালে গুরুর জন্য কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেন না, কিন্তু এক্ষণ ঠাকুরগণ নিতান্তস্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা তাঁহাদের ভয়ে হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া আছেন। †

---

and are now hanging up *in terrorem* at Agurtollah.

* কৌর্ম্মং সঙ্কোচমস্থায় প্রহারমপিমর্ষয়েৎ।
প্রাপ্তকালস্তু নীতিজ্ঞ উত্তিষ্ঠেৎ ক্রূরসর্পবৎ॥

হিতোপদেশ, বিগ্রহ, ৫১ শ্লোক।

† The Raja is utterly helpless to control his immediate dependants or defend himself in the event of a combined revolt.

তিন পক্ষেই বাচনিক প্রমাণ উপস্থিত হইল। রাজ পরিবারস্থ কয়েকটী মহিলা এবং অল্প কয়েকজন ঠাকুরলোক বাদিগণের উক্তি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অধিকাংশ ঠাকুর লোক ও রাজ কর্ম্মচারী * সেই রোবকারি খানাকে সত্য বলিয়া বীরচন্দ্রের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন এই সময় আদালতে একটী আশ্চর্য্য ঘটনার সংঘটন হইল। মৃত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের বিধবা পত্নীগণের পক্ষে বীরচন্দ্রের মঙ্গলার্থে তাঁহার উক্তি সমর্থন করিয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত করা হইল।

স্থানীয় বিচারপতি, জেলা ত্রিপুরার প্রধান সদর আমিন বাবু জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১১জুন বীরচন্দ্রের যুবরাজী মিথ্যা সাব্যস্ত করিলেন এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ চক্রধ্বজকে কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যর অবৈধপুত্র অবধারণ করিয়া নীলকৃষ্ণের অনুকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। অপরিণামদর্শী নীলকৃষ্ণের আর সহ্য হইল না। তিনি সেই ডিক্রীর বলে অগৌণে ডিক্রীজারি ক্রমে চাকলে রোশনাবাদ ২০ দিবসের জন্য অধিকার করিয়াছিলেন।

বীরচন্দ্র হাইকোর্টে আপীল করিলেন। সেখানেও মহারাজ ঈশানচন্দ্রের পত্নীগণের পক্ষে বীরচন্দ্রের অনুকূলে

*মহারাজ বীরচন্দ্রের নিজের তিনটী ভৃত্য ও মহারাজ ঈশানচন্দ্রের কর্ম্মচারী উল্লেখে আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

আপত্তি উপস্থিত হইল। হাইকোর্ট রাণীগণের দরখাস্তের প্রতি প্রধান সদর আমিনের অবজ্ঞা দর্শনে তাঁহার কার্য্যের প্রতি বিশেষ সন্দিহান হইলেন এবং ইহাতেই নীলকৃষ্ণের অনিষ্টের সূত্রপাত হইল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর চিপ জষ্টিস নরমেন ও জষ্টিস কেম্প, ঈশানচন্দ্রের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র গণের অনুপস্থিতে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে নীলকৃষ্ণ অপেক্ষা বীরচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী উত্তরাধিকারী অবধারণ এবং বীরচন্দ্র ঈশানচন্দ্রের দ্বারা যুবরাজের পদে নিযুক্ত হওয়া সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া ঈশানচন্দ্রের নাবালক পুত্রগণের অভি-ভাবিকা রাণীগণ, বীরচন্দ্র যুবরাজের পদে নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতেছেন না, এমতাবস্থায় এসম্বন্ধে অন্য তদন্ত নিষ্প্রয়োজন; প্রধানত এই হেতুবাদে বীরচন্দ্রের আপিল ডিক্রী ও নীলকৃষ্ণের মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন।

হতভাগ্য চক্রধ্বজ ও হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টও তাঁহাকে মহারাজ কৃষ্ণকিশোরের অবৈধ পুত্র নির্ণয় করিলেন।

গুরুর অবরোধের পর হইতে ব্রজমোহন ঠাকুর ত্রিপুরার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্ট কর্তৃক উক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অকূল সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এক্ষণ তিনি গুরুর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অভিজ্ঞ কর্ণধারের ন্যায় ত্রিপুরার কর্ণধারণ

পূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি ঠাকুরলোকদিগকে কৌশলে হস্তগত করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রায় সাড়েপাঁচ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রণালী অনুসারে রাজা ও প্রজার মঙ্গল সাধন করত রাজ্যের উন্নতি বিধান জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার শাসনে মোকদ্দমা সমূহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও রাজকোষে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদ্বারাও সামরিক বিভাগের সম্পুর্ণ উন্নতি সাধিত হয় নাই।

নীলকৃষ্ণ হাইকোর্টের নিষ্পত্তির অসম্মতিতে প্রিবি কৌন্সেলে আপীল করিলেন। প্রিবি কৌন্সেলে নীলকৃষ্ণ, ঈশান চন্দ্রের জীবিত পুত্রগণকে অবৈধ প্রকাশ করত কেবল ভ্রাতৃ দ্বয়ের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের তর্ক মীমাংসার বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ্চ প্রিবিকৌন্সেল নীলকৃষ্ণের আপিল অগ্রাহ্য করেন। তদনন্তর বীরচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এবার তাঁহার প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যানুসারে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিসনর লর্ড এইচ, ইউলিক, ব্রাউন সাহেব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া খেলাত ও সনন্দ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ত্রিপুর সিংহাসনে স্থাপন

করিলেন। রাজ্যাধিকার কালে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর গবর্ণমেণ্টকে ১২৫টী স্বর্ণ মুদ্রা নজর প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৭৯ ত্রিপুরার ২৭ ফাল্গুন (১৮৭০ খৃঃ ৯ মার্চ্চ) বীরচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

মহারাজ বীরচন্দ্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াও দীর্ঘকাল নীরদমালায় সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় ক্ষীণভাবে কাল যাপন করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রিভি কৌন্সলের বিচারে তাঁহার স্বত্ব নির্ণীত হওয়ার পর, ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি পার্ব্বত্য ত্রিপুরার "ডিজুর" রাজা স্বীকৃত হওয়ার পর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর মেঘমুক্ত ভাস্করের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন। বিষ্ণুশর্ম্মার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধ ফলবতী হইতে চলিল। মহারাজ বীরচন্দ্র শত্রুর পরিবর্ত্তে মিত্র নিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল বিবরণ ক্রমে যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩০ মার্চ্চ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সামন্ত নরপতিদিগের সম্বন্ধে "নজরানা রিজলিউসন" নামক যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন তাহাতে লিখিত আছে যে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, স্বাধীন রাজ্য নহে; অথচ ত্রিপুরা পতির সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সন্ধি বন্ধন নাই। ত্রিপুরেশ্বর গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ কর প্রদান করেন না, কেবল রাজ্যাভিষেক কালে গবর্ণমেণ্টকে "নজর" প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সকল হেতুবাদে গবর্ণমেণ্ট অবধারণ করেন যে, ত্রিপুর নরপতিগণের মৃত্যুর পর, পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ত্রিপুরা রাজ্যের এক বৎসরের উৎপন্নের অর্দ্ধাংশের ও পুত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইলে রাজ্যের এক বৎসরের সমস্ত রাজস্ব "নজর" প্রদান করিতে হইবে।" দীর্ঘ কাল অন্তে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সূচিকার রন্ধ্রে কুঠার প্রবিষ্ঠ করাইলেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর গবর্ণ মেণ্ট হইতে প্রাপ্ত খেলাতের মূল্যের প্রায় ত্রিংশাংশ এবং মহারাজ ঈশানচন্দ্র খেলাতের তুল্য মূল্য এবং মহারাজ বীরচন্দ্র তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক "নজর" প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্রের উত্তর পুরুষগণকে লক্ষ লক্ষ টাকা "নজর" প্রদান করিতে হইবে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ নবেম্বর চট্টগ্রামের কমিসনর ত্রিপুরেশ্বরকে জানাইয়াছিলেন যে "স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না।" ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ফরেণ সেক্রেটারী এচিসন সাহেব ভারতীয় নরপতি বর্গের সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "স্বাধীন ত্রিপুরা ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বাধিকারিগণের অনুগ্রহ প্রদত্ত রাজ্য নহে।" ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ্চ শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রিবি কৌন্সেলের বিচারপতি লিখি-

লেন যে, ত্রিপুরার রাজা যদিও (চাকলে রোশনাবাদের) জমিদারির জন্য ব্রিটীস ইণ্ডিয়ার আইন ও বিচার আদালতের অধীন বটেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ত্রিপুরা পর্ব্বত নামক একটী বৃহৎ রাজ্যের স্বাধীন নরপতি বটেন। কিন্তু ইহার ১বৎসর ১৫ দিবস অন্তে মহারাজ বীরচন্দ্রের অভিষেকের এক বিংশতি দিবসান্তে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, "পার্ব্বত্য ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য নহে"* সুতরাং তাহার অধিপতিগণকে পূর্ব্বোল্লিখিতমত "নজরানা" প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ বীরচন্দ্র তৎকালে ঈশানচন্দ্রের একমাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সর্ব্বনাশ সাধনানুষ্ঠানে ও গীত বাদ্যাদির আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিলেন। সুতরাং উপযুক্তরূপে স্বীয় স্বত্বাধিকার গবর্ণমেণ্টকে দেখাইলেন না।

মহারাজ ঈশানচন্দ্রের যে কয়েকটী কর্ম্মচারী মহারাজ বীরচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গুরু বিপিনবিহারী কিরূপে অবরুদ্ধ হন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ বীরচন্দ্রের অভিষেকের কিঞ্চিদূন ৪ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭৬ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ

* ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই "ট্রিগনমেটিকেল" সারভে দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরারাজ্য জরিপ আরম্ভ করেন। উক্ত জরিপী কার্য্য শেষ হওয়ার পর সম্ভবতঃ ১৮৬৫ কিম্বা ৬৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট" স্বাধীন ত্রিপুরা শব্দ কর্ত্তন করত " পর্ব্বত ত্রিপুরা " লিখিতে আরম্ভ করেন।

মাসে গুরু অবরুদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার প্রায় এক মাস অন্তে গোলোকচন্দ্র সিংহ মানে মানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র ফাল্গুনের ২৭ তারিখে সিংহাসন আরোহণ করেন, চৈত্র মাস আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয়। বৈশাখ মাসে সচিবকুলতিলক ব্রজমোহন ঠাকুর সাহেব পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ হন। দেওয়ান গুরুদাস পদচ্যুত ও রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন। বিশ্বনাথ অবস্থা দর্শনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রিপুরাবাসী সর্ব্বসাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যে দিন, বীরচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করেন সেই দিবস মহারাজ ঈশানচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। মহারাজ ঈশানচন্দ্রের মহিষী ও প্রধান কর্ম্মচারিগণ মহারাজ বীরচন্দ্রের উপকারার্থ যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, ঈশান চন্দ্রের পুত্র বীরচন্দ্রের পর ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁহাদের আশা ষোল কলায় পূর্ণ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন! যে দিন মহারাজ বীরচন্দ্র ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লর্ড ইউলিক ব্রাউন দ্বারা ত্রিপুর সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই দিবস মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা ঈশানচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র একটী গৃহ মধ্যে

অনাহারে অবরুদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রায় এক বৎসর তিন মাস নবদ্বীপচন্দ্র মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা রাজভবনে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই কাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র অপহরণ করেন। নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র "নবদ্বীপচন্দ্র নগর" নামক একটা জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন, মহারাজ বীরচন্দ্র তাহাও বাজেয়াপ্ত করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র বলেন, "নবদ্বীপচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য নবদ্বীপের বিমাতা মহারাণী রাজলক্ষ্মী ও মহারাণী চন্দ্রেশ্বরী তাঁহাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন।" বোধ হয় সেই অপরাধেই অল্পকাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র, মহারাণী চন্দ্রেশ্বরীর "পেয়াইস নামক তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রত্যুপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এইরূপে মহারাজ বীরচন্দ্র স্বীয় দুর্দ্দান্তশত্রু ঈশানচন্দ্রের পুত্র, পত্নী ও ভৃত্যগণকে নির্য্যাতন করিয়া ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই ভাদ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের সহায় বলিয়া, কয়েক জন ঠাকুরলোককেও নির্য্যাতন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ব্রজমোহনকে পদচ্যুত করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র স্বয়ং রাজ্য ও জমিদারির শাসন ভার গ্রহণ করিলেন বলিয়া ঘোষণা পত্রে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু ঈশানচন্দ্রের সময়ের

কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য আগরতলায় একজন সাহেব ও দুই জন বাঙ্গালি নিযুক্ত হইলেন। সাহেব একজন ইংরেজ, তাঁহার নাম ডবলিউ, এফ, কেম্পবল, তিনি ইতিপূর্ব্বে বারংবার চাকলে রোশনাবাদের মেনেজারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কেম্পবল সাহেব নিরীহ ভাল মানুষ ছিলেন। রামমাণিক্য বর্ম্মণ দেওয়ান হইলেন। তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। রাম মাণিক্য নিতান্ত কুটীল নীতিপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাকে ক্ষুদ্র চাণক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। পেস্কার হইলেন, মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র কাশীচন্দ্র দাস। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা বর্ণনা করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ান হইলেন, কুমিল্লা জজ আদালতের উকীল,—কণিকশিষ্য মুন্সী ঈশানচন্দ্র গুপ্ত। নবদ্বীপচন্দ্রকে যুবরাজী না দিয়া সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলে, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছুই করিতে পারিবেন না বলিয়া, মহারাজ বীরচন্দ্রকে পরামর্শ প্রদান করেন। মহারাজ সেই পরামর্শের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রোশনাবাদের দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। এই সকল কর্ম্মচারিগণের শাসনে ত্রিপুরার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল।

কয়েক মাস অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া ব্রজমোহন ঠাকুর

সাহেব কালকবলিত হইলেন। প্রায় এক বৎসর তিন মাস কাল নানা প্রকার যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করিয়া কুমার নবদ্বীপ চন্দ্র ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে স্বীয় মাতাকে লইয়া দীন হীনের বেশে কুমিল্লায় উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র যৎকালে নবদ্বীপের সর্ব্বনাশ সাধন মানসে তাঁহার অমাত্যবর্গকে লইয়া নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতেছিলেন; বেলবেডিয়ার রাজ প্রাসাদে বসিয়া বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তৎকালে পার্ব্বত্যত্রিপুরায় জনৈক পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তের প্রস্তাব, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হওয়ার জন্য যে কেবল ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তের প্রয়োজন হইয়াছিল এমত নহে, ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বদিকস্থ "লুসাই" নামক কুকিজাতির অত্যাচার নিবারণ ও তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কয়েকটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্টের নিযুক্তি তাঁহার অন্যতম।* যদিচ এই কার্য্যে মহারাজ সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করেন নাই, কিন্তু

* Lord Mayo also advocated placing a Political Agent in Hill Tipperah.

Mackenzee's North-East Frontier of Bengal. Page 303.

ইতিহাস লেখক ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট প্রজা সাধারণের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তির প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃক এ, ডবলিউ, বি, পাওয়ার সাহেব প্রথম পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হন। নবদ্বীপচন্দ্র কুমিল্লায় উপস্থিত হইবার অল্প কয়েকদিন পরেই পাওয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময় দেওয়ান ঈশানচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী (আইন) প্রণীত হয়। ইহার পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের লিখিত আইন ছিল না।

নবদ্বীপচন্দ্র কুমিল্লায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে চাকলে রোশনাবাদের দাবিতে দেওয়ানী আদালতে নালীস করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সুতরাং তৎকালে মহারাজ বীরচন্দ্রকে পুনর্ব্বার ঠাকুর লোকদিগকে হস্তগত করিবার প্রয়োজন হইল। পক্ষান্তরে দেওয়ান রামমাণিক্য ও পেস্কার কাশীচন্দ্রের মধ্যে স্বার্থ সাধন লইয়া বিষম কলহ উপস্থিত হইল। মহারাজ বীরচন্দ্রের অভিষেকের পর ঠাকুরগণকে নির্য্যাতন জন্য কাশীচন্দ্র অগ্রণী হইয়াছিলেন। এক্ষণ রামমাণিক্য সেই ঠাকুরলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া কাশী-

চন্দ্রকে নির্য্যাতন করিবার জন্য বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। কাশীচন্দ্র যারপর নাই লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইলেন; কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া পদচ্যুত হইলেন না। ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের শীত ঋতুতে পুনর্ব্বার ঠাকুর লোকেরা প্রকাশ্য ভাবে ভাগাভাগীতে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নাজির দীনবন্ধু মন্ত্রী হইলেন, গৌরচন্দ্র ঠাকুর আপীল আদালতের বিচার ও বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন। পার্ব্বতীচরণ ঠাকুর মাজেষ্ট্রেট ও তোষাখানার অধ্যক্ষ হইলেন। কিন্তু পাহাড় আদালতের অর্থাৎ পার্ব্বতীয় প্রজাগণের বিচার কার্য্য ঠাকুর পার্ব্বতীচরণ ও সুবা জগমোহন নির্ব্বাহ করিতেন। আনন্দকিশোর ঠাকুর দেওয়ানী আদালতের প্রথম বিচারক ও রাজকীয় ধনাগারের অধ্যক্ষ হইলেন। দেওয়ান রাম মাণিক্য ও পেস্কার কাশীচন্দ্র মন্ত্রীর অধীনে রহিলেন। কেম্পবল চাকলে রোশনাবদের মেনেজার হইয়া কুমিল্লায় গমন করিলেন।

প্রধান ঠাকুরগণকে নামতঃ কয়েকটী কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল বটে, কিন্তু সমস্ত কার্য্যের মূল সূত্র মহারাজের হস্তেই রহিল। অথচ কার্য্যের প্রতি মহারাজের উপযুক্ত দৃষ্টি রহিল না। তৎকালে সঙ্গীত, চিত্র ও অন্যান্য বিলাসিতায় মহারাজ সম্পূর্ণ নিমগ্ন রহিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ্ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সেই সময় ক্রমে ক্রমে আগর-

তলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।* অযোধ্যার অধিপতি ওয়াজিদ-আলীর অধঃপতনের পর এইরূপ সঙ্গীত সমিতি ভারতের অন্য কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

চিত্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত কয়েকজন ইংরেজ ও বাঙ্গালি অধিক বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই সকল ও অন্যান্য বিলাসিতার কার্য্যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল।

মহারাজ বীরচন্দ্র যৎকালে নানাপ্রকার বিলাসিতায় নিমগ্ন ছিলেন। বীন, রবাব, সারদ, পাখোয়াজ প্রভৃতি যন্ত্র নিনাদে ও গায়কগণের রাগ রাগিণীর আলাপে যৎকালে তাঁহার বিলাসভবন প্রমোদিত হইতেছিল, ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট

---

* সুরবীন বাদক	...	নিশার হুসন।
রবাব, বীন ইত্যাদি বাদক	...	কাশেমআলি খাঁ।
এছরাজ বাদক	...	হাইদর খাঁ।
সেতার বাদক	...	নবীনচাঁদ গোস্বামী।
বেহালা বাদক	...	হরিদাস।
পাখোয়াজ বাদক	{	কেশবচন্দ্র মিত্র। পঞ্চানন মিত্র, রামকুমার বসাক।
সারদ বাদক		* * *
গায়ক	..	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, যদুনাথ ভট্ট এবং আরও কতকগুলি গায়ক ও বাদক মিলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের নাম আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

সেই সময় বাঙ্গালার পূর্ব্বসীমান্তে চিরশান্তি স্থাপন জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা সেই বিবরণ সংক্ষেপে যথাস্থানে বর্ণনা করিব। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে কাছাড় ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম হইতে কুকিদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য দুইটী বৃহৎ সেনাদল প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্ণয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই সদভিপ্রায় যে পূর্ব্বপ্রান্তে চিরশান্তি স্থাপন জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা ইতিহাস লেখক অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যখনই কুকিদিগের দ্বারা কোনরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে তখনই ত্রিপুরেশ্বরগণ "ইহারা আমার প্রজা নহে।" কিম্বা "আমার শত্রু (উদাহরণ স্বরূপ যথা শম্ভুচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, মধুচরণ, নীলকৃষ্ণ প্রভৃতি) কুকিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য এই কাণ্ড করিয়াছেন। এবম্প্রকার অমূলক কিম্বা আংশিক সমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমারেখা প্রদর্শন করিবার সময় উপস্থিত হইলে বিশেষ আগ্রহের সহিত টেপাই নালার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।*

* The Raja of Tipperah indeed claims Supremacy over all the villages west of the Tipai,

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তান পেম্বারটন টেপাই নালাকে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং কাছাড়ের ত্রিসীমা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যসীমা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমরা তাহার বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারি; কিন্তু যে দিন হইতে কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণ কাণ্ডজ্ঞান হীন হইয়া আত্মকলহে রত হইয়াছেন, সে দিন হইতে মনোহারিণী "লাইছাবি" গণ * ত্রিপুর রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, সেইদিন হইতে তাঁহাদের বলবীর্য্য অসিত পক্ষীয় ইন্দুর ন্যায় ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। দুর্ব্বল ও বিলাসী নরপতির রাজ্যসীমা জগতে চিরকালই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে ও এচিসন সাহেবের "সনন্দ সংগ্রহ" গ্রন্থের সহিত বাঙ্গালা ও ব্রহ্মার যে মানচিত্র † প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই মানচিত্রে "স্বাধীন ত্রিপুরা" রাজ্যের আয়তন যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,

but practically his authority was never acknowledged east of the Chatterchoora Range.

Letter from J. W. Edgar Esq. Civil officer with Cachar column of the Lushai expeditionary force. To the Commissioner of Dacca Division, dated 3rd April 1872.

* লাইছাবি—মণিপুরী অবিবাহিতা যুবতী।

† Map of the acquisitions of British Territory in Bengal and the Burmese Provinces. 1862.

অধুনা তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত ও লুসাই প্রদেশ পরিমাপ করিয়া সীমারেখা নির্ণয় জন্য পলিটিকেল এজেণ্ট পাওয়ার সাহেব অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাহার রিপোর্ট অনুসারে হিচক ও জাম্পূই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লঙ্গাই নদী ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্ণীত হইয়াছে। ফলতঃ ত্রিপুরাপতিকে সীমান্ত রক্ষায় অক্ষম জানিয়াই * ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব সীমারেখা সঙ্কুচিত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব প্রান্ত-বাসী মানববৃন্দের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কারণ যদি দুর্দ্দান্ত লুসাইদিগের বসতিস্থান ত্রিপুর রাজ্যসীমার অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে মহারাজ কখনই তাহাদিগকে সুশাসনে রাখিতে পারিতেন না। সুতরাং সেই দুর্দ্দান্ত কুকিগণ তাহাদের চির অভ্যস্থ নরহত্যা, গৃহদাহ, লুটপাট প্রভৃতি কার্য্য অবাধে নির্ব্বাহ করিত। মহারাজ বীরচন্দ্র দৃঢ়রূপে রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় পত্নী, পুত্র, শ্যালক প্রভৃতি প্রিয়দর্শন আত্মীয়বর্গকে সামান্য জমায় যে

* The Lieutenant Governor agrees with all the officers whose opinions he has had, that we cannot expect the Raja of Tipperah to organise an efficient frontier defence.

Mackenzie's North-East Frontier of Bengal Page 482.

সমস্ত তালুক ক্রমে ক্রমে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব * প্রায় তৃতীয়াংশ খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত কুকিদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিবার জন্য যেরূপ সৈন্যের প্রয়োজন ছিল, তাহার জন্য মহারাজা বাহাদুরকে অন্ততঃ বার্ষিক যেই পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হইত, মহারাজ তাহা করিবেন দূরে থাকুক, যে সামান্য কয়েকটী গারদ তিনি সীমান্ত প্রদেশে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সর্ব্বদা তাহাও উপযুক্ত রূপে রক্ষা করিতেছেন না। মহারাজ আগরতলায় বসিয়া আমোদ প্রমোদে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতেছেন আর তাঁহার সীমান্ত রক্ষক সৈন্যগণ সময় সময় বেতনাভাবে প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় নিবিড় অরণ্যে বসিয়া ফল মূল ভক্ষণে জীবন যাপন করিতেছে। †

পলিটিকেল এজেণ্ট আগরতলায় উপনীত হইবার অল্প-কাল পরে তাঁহার উপদেশ অনুসারে বিচারাদালত গঠিত হইয়াছিল। তাহা পুর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন

* Land Revenue.

† In most cases the Political Agent found the sepoy's pay in arrears and no ammunition provided for their muskets.

Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. pp. 320-321.

কাল হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারি সংক্রান্ত বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মহারাজ স্বয়ং করিতেন। ১২৮২ ত্রিপুরার আষাঢ় মাস হইতে ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার জন্য মহা-রাজ "খাসআপীল আদালত" নামে একটি বিচারালয় সংস্থাপন করেন। এই বিচারাদালত কোন কোন অংশে প্রিভিকৌন্সেলের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। মঞ্জুরী দানের ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য, ছত্র-মাণিক্যের বংশধর রাজা মুকুন্দরাম রায় ও (দ্বিতীয়) ব্রজ-মোহন ঠাকুরকে খাস আপীল আদালতের বিচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন।

রাজধানীতে বসিয়া কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করিতে পারেন না। প্রাচীনকালে জনৈক রাজকর্ম্মচারী কিছুকালের জন্য কৈলাসহরে বাস করিয়া, সময় সময় উত্তর ভাগের কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণ কৈলাসহর উপবিভাগ সৃষ্টি করিয়া মহারাজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তকে তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। আইন বহির্ভূত প্রদেশের ডিপুটী কমিশনরগণ যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিয়া থাকেন, দুর্গাপ্রসাদ বাবু সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই দুর্গাপ্রসাদ বাবু সুশাসন দ্বারা কৈলাসহর বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়া, তথায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

এই সময় আগরতলায় নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ঋ বৃদ্ধি হইতে চলিল। ভাগাভাগীতে ঠাকুর লোক-দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, মহারাজ স্বস্ব প্রধান কতক-গুলি নায়ক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গায়ক, বাদক ও রাজদরবারের অন্য চাটুকারবর্গও মহারাজের অতিরিক্ত অনু-গ্রহ লাভ করিয়া, রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুনায়ক ও বিলাসিতার ব্যয়ই বিশৃঙ্খলা ও ঋণ বৃদ্ধির মূল কারণ। এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য একটি ভাল লোক নিযুক্ত করিবার কারণ পলিটিকেল এজেণ্ট মহারাজকে অনুরোধ করেন। চাকলার মেনেজার কেম্পবল সাহেব কুমিল্লার সব রেজেষ্টার বাবু নীলমণি দাস কে সেই কার্য্যের সম্পুর্ণ উপযুক্ত বলিয়া, মহারাজ সমীপে প্রকাশ করিলেন। মহারাজ গবর্ণমেণ্ট সমীপে বাবু নীলমণি দাসের সার্ব্বিস পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৩ খৃঃ অঃ ২৭ আগষ্টের অনুমতি দ্বারা ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দের ভাদ্র মাসে নীলমণি দাস সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা যুক্ত দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন।

নীলমণি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলে মন্ত্রীর প্রয়োজন রহিল না। সুতরাং অনুপযুক্ত মন্ত্রী দীনবন্ধু সদর মেজেষ্ট্রেটের পদে অবনতি প্রাপ্ত হইলেন। নীলমণি দাস কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, ব্রিটীস অনুকরণে আবকারী (মাদক দ্রব্য

সংক্রান্ত) বিভাগ ও ষ্টাম্প স্মৃষ্টি, দলীল রেজেষ্টারির নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারি সংক্রান্ত আইন সংশোধন এবং তমাদি আইন প্রণয়ন করেন। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশকে উত্তর বিভাগের ন্যায় উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে "উদয়পুর" বিভাগ সৃষ্টি করিয়া, বাবু উদয়চন্দ্র সেন কে তাহার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উদয়পুর বর্ষাকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এজন্য সোনামূড়া নামক স্থানে সদর ষ্টেসন স্থাপন করা হইল। ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দের বর্ষাকালে মহারাজ বীরচন্দ্র ঢাকায় যাইয়া, গবর্ণরজেনেরল লর্ড নর্থব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন নরপতি রাজ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। দর্শন কালে যদিচ গবর্ণরজেনেরল বাহাদুর মহারাজের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিদর্শন প্রদান না করায়, জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বাবু নীলমণি দাস সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া, আয়বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের পন্থা পরিষ্কার করিয়াছিলেন। এমন সময় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র চাকলে রোশনাবাদের দাবিতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের নামে ত্রিপুরার দেওয়ানী আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। (১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ ৩৫ নং মকদ্দমা) সুতরাং নীলমণি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন।

কুমার নবদ্বীপচন্দ্র স্বীয় আবেদন পত্রে বলিলেন যে,

তাহার পিতা মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্রকে যুবরাজী পদে নিযুক্ত না করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্র মতে তিনিই স্বর্গীয় মহারাজ এবং কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী।

মহারাজ বীরচন্দ্র এক সুদীর্ঘ বর্ণনা দাখিল করিয়া অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বাহুল্য বিবেচনায় আমরা সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম। তাঁহার তিনটী আপত্তিই উল্লেখ যোগ্য যথা ১—এবম্প্রকার মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার ব্রিটীস আদালতের নাই। ২—বাদী দাসীর গর্ভজাত সন্তান।* সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রানুসারে তিনি ঈশানচন্দ্রের ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন না। ৩—মহারাজ ঈশানচন্দ্র, বীর-চন্দ্রকে যুবরাজী পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং রাজ-বংশের চিরপ্রচলিত প্রথামতে যুবরাজই রাজ্যাধিকারী বটেন।

* এবার মহারাজ বীরচন্দ্র, নীলকৃষ্ণের প্রদর্শিত কুপথ অবলম্বন করিলেন। তাহার পাল্টা স্বরূপ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র প্রমাণ উপস্থিত করিলেন যে, "মহারাজ বীরচন্দ্রের মাতা দাসী স্বরূপ রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটী সন্তান হওয়ার পর তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।" চক্রধ্বজের মোকদ্দমায় হাইকোর্টের মান্যবর জজগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাজা ইচ্ছা করিলে সন্তানের জন্মের পর তাঁহাকে বিধিসিদ্ধ করিতে পারেন। W. R. Vol. I. p. 194. এই সম্বন্ধে ইতিহাস লেখকের মত অন্যরূপ তাহা যথা স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

নবদ্বীপচন্দ্রের অনুকূলে ১৪টী সাক্ষী মাত্র উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে মহারাজ ঈশানচন্দ্রের অন্তিমকালের চিকিৎসক দুইজন, এবং ঈশানচন্দ্র ও বীরচন্দ্রের "সভাপণ্ডিত" ত্রিপুরা-জেলার সর্ব্বপ্রধান স্মার্ত্ত, পণ্ডিত রামদুলাল বিদ্যাভূষণের জবানবন্দী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা উভয় পক্ষের মানিত এবং সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মহারাজ বীরচন্দ্রের বেতনভোগী ছিলেন। তাঁহারা সরল ভাবে আদালতে প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র বীর-চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করেন নাই। মহারাজ বীর চন্দ্রের অনুকূলে প্রায় ত্রিশজন সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রধান ঠাকুরগণ পূর্ব্বে নীলকৃষ্ণের ও চক্র-ধ্বজের মোকদ্দমায় বীরচন্দ্রের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ছিলেন। তাঁহারা দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যে নবদ্বীপের মাতা দাসী ছিলেন এবং ঈশানচন্দ্র, বীরচন্দ্রকে যুবরাজী পদে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।"*

---

* দুর্গামণি যুবরাজের মোকদ্দমায় অধিকাংশ ঠাকুর লোক তাঁহার অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এজন্য সাময়িক নরপতি মহারাজ রামগঙ্গা তাঁহাদিগকে সপরিবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। (*Mackenzie's N. E. Frontier of Bengal. p. 274.*) দুই বৎসর অন্তে দুর্গামণি রাজদণ্ড ধারণ করত তাঁহাদের শৃঙ্খল ছেদন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস কোন ঠাকুর সাময়িক নরপতির

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। ফাউল সাহেবের দ্বারা এইরূপ অবধারিত হয় যে, এই মোকদ্দামার বিচার করিবার অধিকার ব্রিটীস আদালতের আছে। নবদ্বীপচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং শাস্ত্রানুসারে তিনি তাঁহার পিতার ত্যজ্য সম্পত্তির অধিকারী; কিন্তু বীরচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র দ্বারা যুবরাজী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কুলাচারানুসারে তিনিই রাজ্যাধিকারী বটেন।

তদনন্তর হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দমার আপীল হইল। হাইকোর্টের জজগণ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট তারিখের নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখিলেন। দেওয়ান নীলমণি দাস হাইকোর্টের হুকুম শ্রবণ করিয়া হর্ষচিত্তে কলিকাতা হইতে আগরতলায় উপনীত হইলেন।

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেনা। স্বাধীন ত্রিপুরার আদালত সমূহে যখন রাজসরকারের বিরুদ্ধেকোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন বিচারক ঠাকুরগণের বিবেকশক্তি কোন কোন সময়ে কূর্ম্মের হস্তপদের ন্যায় সংকুচিত হইয়া থাকে। (*Bengal Administration Report.* 1888-89.) সামান্য কোন বিষয় সম্পত্তির জন্য বিরোধ উপস্থিত হইলে যখন ঠাকুরগণ এরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়া থাকেন, সেস্থলে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে যে, তাঁহারা কি করিবেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের কার্ত্তিক মাসে ব্রিটীস দণ্ডবিধির অনুকরণে দেওয়ান নীলমণি জনৈক নরহন্তাকে ফাঁসী দ্বারা প্রাণদণ্ড করেন। ইহার পূর্ব্বে ফাঁসী দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই।

এই সময় নীলমণি বাবুর যত্নে ত্রিপুরা রাজ্যে উকিল-দিগের পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।*

বাবু নীলমণি দাস কর্ম্মঠ এবং কার্য্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন না, এজন্য অধীনস্থ সুচতুর ও বুদ্ধিমান সুপারেণ্টেডেণ্ট (অধুনা দেওয়ান) বাবু রাজমোহন মিত্র এবং অন্য একজন কর্ম্মচারী হইতে গোপনে পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের শীত ঋতুতে বাবু নীলমণি দাস চাকলে রোশনাবাদের দক্ষিণ বিভাগ পরিদর্শন জন্য গমন করেন। এই সুযোগে তাঁহার শত্রু দীনবন্ধু তাঁহার বিরুদ্ধে এক দল গঠন করেন। ইঁহাদের পরামর্শে মহারাজ বীরচন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্যের একজন প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেওয়ান (নিলমণি দাস) কে অবমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। সরলচিত্ত নীলমণি এই অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। অল্পকাল মধ্যে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

* ১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের ২৭ আষাঢ়ের রোবকারী।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর পুনর্ব্বার গরুর পরিবর্ত্তে অজা দ্বারা হল কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দীনবন্ধু পুনর্ব্বার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন (১২৮৬ ত্রিপুরাব্দের শেষ ভাগে)।

এই সময় শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া "দিল্লীর দরবারে" "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ করেন। তৎকালে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সামন্ত নরপতিবর্গের ন্যায়, ত্রিপুরা পতিকেও একটি পতাকা (বেনার) দান করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরার মহারাজকে (১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে) "মহারাজ" উপাধি দান করেন। যে ত্রিপুর নরপতিগণ নরমান কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পূর্ব্ব হইতে "মহারাজ" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, মুসলমান সম্রাটগণ যাঁহাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন; ভারতে ব্রিটীস সাম্রাজ্য সংস্থাপন হইতে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোবকারী সমূহে ব্রিটীস কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাদিগকে "মহারাজ" কিম্বা "মহারাজ বাহাদুর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মহারাজ বংশীয় মহারাজকে গবর্ণমেণ্ট "মহারাজ" উপাধি দান করিলেন ইহা নিতান্ত বিস্ময়জনক।

১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে যুবরাজ রাধাকিশোর খাস আপীল আদা-

লতের জনৈক বিচারপতি নিযুক্ত হন। সুবিখ্যাত মন্ত্রী ব্রজ মোহন ঠাকুরের পুত্র বিজ্ঞবর ধনঞ্জয় ঠাকুর উদয়পুর বিভাগের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ বিজ্ঞবর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সহকারী মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া দীনবন্ধুকে "প্রধান মন্ত্রী" উপাধি প্রদান করিলেন। দীনবন্ধু প্রতিভাশালী ছিলেন না, কিন্তু দীর্ঘকাল মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুরের দরবারে উপস্থিত থাকিয়া কূটনীতিতে কিয়ৎ পরিমাণ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। * সুতরাং তিনি রাজদরবারে আত্ম প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য একটী দল সৃষ্টি করিলেন। মহারাজের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী মহাদেবী, † ও উক্ত মহিষীর ভ্রাতা ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ এবং কুমারগণের শিক্ষক রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মন্ত্রী দীনবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক হইলেন। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া দীনবন্ধু ক্রমে ক্রমে দীনবন্ধুনগর, তারানগর প্রভৃতি কতকগুলি বৃহৎ আবাদি তালুক ও প্রচুর

* এই দীনবন্ধু কিছুকাল গোপনে কুমার নবদ্বীপের পক্ষ ছিলেন। পুনর্ব্বার মহারাজ বীরচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন করত নবদ্বীপের মর্ম্মান্তিক শত্রুর ন্যায়, তাঁহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক বীরচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

† মহারাণী ভানুমতী দেবী যে, স্বীয় স্বামীর উপর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বেলবেডিয়ার নামক রাজ প্রাসাদেও ঘোষিত হইয়াছিল।

Bengal Administration Report 1882-83.

আয় বিশিষ্ট বনকর লাট কামথানা প্রভৃতি মহাল অল্প জমায় ইজারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরধ্বজও ঐরূপ অল্প জমায় বনকর থোয়াই প্রভৃতি ইজারা ও কতক তালুক গ্রহণ করিলেন। এই উপায় দ্বারা দীনবন্ধু ও নরধ্বজ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাবর্গ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান হইলেন। মহারাণী ভানুমতী বিশালগড় পরগণা ও আগরতলা পরগণার কিয়দংশ অল্প জমায় তালুক গ্রহণ করত রাজ পরিবারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালিনী হইয়াছিলেন। রাধারমণ এবম্প্রকার ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি সামান্য লোভ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিপুর রাজদরবারে অসাধারণ আধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক মহারাজের প্রাইবেট সেক্রেটারী হইলেন। এইরূপে ঘোষ বংশধর রাধারমণ দ্বারা বর্ত্তমান ষড়যন্ত্রকারী দলের বীজ রোপিত হইল।

এই দলের প্রভাবে মহারাণী রাজেশ্বরীর গর্ভজাত, (যুবরাজ রাধাকিশোরের অনুজ)—মহারাজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কুমার দেবেন্দ্র ও নৃপেন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া—চতুর্থ কুমার (ভানুমতীর জ্যেষ্ঠপুত্র) সমরেন্দ্রচন্দ্রকে মহারাজ বীরচন্দ্র "বরঠাকুর" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন। (১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ)

এই ক্ষমতাশালী দলের কৌশলে বিজ্ঞবর শম্ভুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ ক্ষমতা প্রচার কিম্বা আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে চিঠী পত্র লেখা পড়ার কার্য্য লইয়া, তিনি প্রধানত সময় কর্ত্তন করিতেন। তদ্ব্যতীত কদাচিৎ কোন সময় বিচার ও বন্দোবস্তের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে "পাহাড় আদালত" নামক বিচারালয় এবালিস হইয়া যায়।

প্রাচীনকাল হইতে অন্যান্য পার্ব্বত্য রাজ্যের ন্যায় ত্রিপুরারাজ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। যদিচ কোন সময়ে কোন ক্রীতদাসী গৃহিণী পদবী লাভ করতঃ পরম সুখে জীবন যাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তাহাদের জীবন চিরকষ্টময় হইয়াছে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এই জঘন্য প্রথা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত থাকার সংবাদ অবগত হইয়া তাহা উঠাইয়া দিতে যত্নবান হন। গবর্ণমেণ্টের উপদেশে বাধ্য হইয়া মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দের ১৭ আষাঢ় ঘোষণাপত্র প্রচার পূর্ব্বক এই প্রথা রহিত করেন।

১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে গবর্ণমেণ্ট আগরতলায় পলিটিকেল এজেণ্টের পদ এবালিশ করেন। তৎপরিবর্ত্তে জেলা ত্রিপুরার মেজেষ্ট্রেট "একস্‌ওফিসিউ" পলিটিকেল এজেণ্ট হইলেন। তাঁহার অধীনে ডিপুটী মেজেষ্ট্রেট বাবু উমাকান্ত দাসকে

আগরতলায় এসিষ্টাণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

১২৮৯ ত্রিপুরাব্দে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র পুনর্ব্বার এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এবার তিনি সেই রোবকারির বলে * চাকলে রোশনাবাদে ভাবী অধিকারিত্ব সংস্থাপন ও ভরণ পোষণের জন্য বৃত্তি † পাওয়ার প্রার্থনা করিলেন।। ত্রিপুরার জজ টাওয়ার সাহেব (১৮৮১ খ্রীঃ ২৪ জানুয়ারি) তাঁহার বৃত্তি মাসিক ৬০০৲ টাকা অবধারণ করেন। বাদী, বিবাদী উভয় পক্ষ হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ৭০ বৎসর অন্তে ব্রিটিশ বিচারাদালতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই মোকদ্দমায় তাঁহারা অবধারণ করিলেন যে, "ত্রিপুরাধিপতি একজন স্বাধীন নরপতি, তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমা বিচার করিবার আমাদের অধিকার নাই।" এই কথাটা শুনিতে বড়ই মধুর। গবর্ণমেণ্টের "নজরানা রিজলিউসন" প্রচারের পরেও কলিকাতা হাইকোর্টের মান্যবর বিচারপতিগণ পার্ব্বত্য ত্রিপুরাকে "স্বাধীন ত্রিপুরা" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সম্রাট স্বরূপে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতের এবম্প্রকার বিচার সম্পূর্ণ মূল্য হীন হইলেও হাইকোর্টের এই নিষ্পত্তি যে, কতকগুলি উপায়হীনের হৃদয়ে ছুরিকার ন্যায় চিরকালের তরে বিদ্ধ হইয়াছিল,

* ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।　　† Maintinance.

তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। দুর্গামণি যুবরাজ বনামে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের নামীয় মোকদ্দমায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানি আদালতের বিচারকগণ অতি সুন্দর নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন।* চাকলে রোশনাবাদ কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্য কোন নরপতির স্বার্জ্জিত সম্পত্তি নহে। ইহা কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরদিগের অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি। বংশের মধ্যে এক ব্যক্তি মেনেজার স্বরূপ ইহার অধিকারী (রাজা) হইয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তির প্রতি ত্রিপুর নৃপতিগণের সর্ব্বদাই ঔদাসিন্য দৃষ্ট হয়। কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে ভিক্ষুক শ্রেণীতে পরিগণিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নরপতিগণ সর্ব্বদাই স্বীয় পরিবারবর্গ ও শালা সম্বন্ধীর ভরণ পোষণ লইয়াই ব্যস্ত আছেন। কিন্তু চাকলে রোশনাবাদ কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্য বিভক্ত হইলে

---

* Respondent should hold the zemindary subject to the usual charge for maintionance of members of the family, and other established disbursements.

Extract from the Decision of Suder Dewanny Adawlut. Dated 24th March, 1809. Ramganga Deo. Appillent *Vs.* Doorgamonee Jubraj. Respdt.

যাহারা এক একটী প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা কেহই উপযুক্তরূপে অন্নবস্ত্র পাইতেছেন না। অর্থাভাবে তাঁহাদের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, কন্যার বিবাহ দেওয়া অসাধ্য হইয়াছে। প্রাচীন কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কৃষ্ণকিশোর ও ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে আমরা এই অন্যায় অত্যাচার আংশিক ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্ত্তমান মহারাজের সময়ে এই অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্য সময় সময় লোমহর্ষণ নাটকের অভিনয় হইতে দেখা গিয়াছে। অন্যায় অত্যাচারে উৎপীড়িত রাজবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি * দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নররুধিরে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়াছেন। প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট রাজবংশজদিগের বীরত্ব প্রকাশের পন্থা রুদ্ধ ও অত্যাচার নিবারণ করিয়া প্রজাবর্গের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কল্যাণ মাণিক্যের বংশধরগণ যে, তাঁহাদের ন্যায়-সঙ্গত বৃত্তি সাময়িক নরপতি হইতে আদায় করিয়া লইবেন, সেই পন্থাও হাইকোর্টের উল্লিখিত নিষ্পত্তি পত্র দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণ

* ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে ঠাকুর নীলকৃষ্ণ, শম্ভুচন্দ্র, রামকান্ত, ভগবানচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, মধুচন্দ্র প্রভৃতির নাম আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাঁহারা কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? আমরা ভরসা করি. সম্রাট স্বরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই ইহার প্রতীকার করিবেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে যদি আত্মসর্ত্তের সময়ে সম্রাটত্ব ঘোষণা করিয়া, উপায় হীনের বেলায় অন্ধত্ব অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই কলঙ্ক চিরকাল ইতিহাস পটে ঘোষিত হইবে।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেক্রেটারী পিকক সাহেবের যত্নে কুমার নবদ্বীপচন্দ্র, মহারাজ হইতে সামান্য বৃত্তি (মাসিক ৫২৫ টাকা) প্রাপ্ত হইতেছেন। সুতরাং এস্থলে তিনি আমাদের লক্ষ্য নহেন। রাজবংশীয় অন্যান্য ব্যক্তির অবস্থা প্রকৃত পক্ষেই শোচনীয়। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ও বিদ্যা শিক্ষার কোন রূপ সুবন্দোবস্ত না করেন, তাহা হইলে ইঁহাদের দ্বারা দস্যু তস্কর প্রভৃতির শ্রেণী বৃদ্ধি হওয়া বিচিত্র নহে।

কুমার নবদ্বীপচন্দ্রের দ্বিতীয় মোকদ্দমা প্রথম আদালতে নিষ্পত্তি হইলে, মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর এক অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তৎসাহায্যে ষড়যন্ত্রকারিদলের পূর্ণ বিকাশ হইয়া উঠিল। "১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে. তদানীন্তন পলিটিকেল এজেণ্ট বোল্টন সাহেব ষড়যন্ত্রকারীদলের প্রাধান্য এবং তাহার বিষময় ফলের কথা অতি কঠোর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।" কিন্তু

বক্ষ্যমান ঘটনা দ্বারা ষড়যন্ত্রকারিদলের ক্ষমতা ও অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইল। অর্থনাশের স্রোত শতমুখী গঙ্গার ন্যায় প্রবলাকার ধারণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল। অসভ্য ত্রিপুরাজাতির জলাচরণ রূপ ভীষণ সমাজ বিপ্লব তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া, রাজকোষের অর্থনাশ, পদে পদে রাজ পদের অবমাননা, * নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ এবং ষড়যন্ত্রকারিদল ও তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বগণের উন্নতি ও স্বার্থসিদ্ধির পন্থা পরিষ্কৃত হইল। ত্রিপুররাজকুল চন্দ্রবংশীয় হউক আর নাই হউক, ত্রিপুরাবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ অতি আদরের সহিত তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাবাসী আর্য্যগণ স্মরণাতীত কাল হইতে রাজবংশটীকে অতি যত্নের সহিত যথাসম্ভব সমাজ অঙ্কে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্নবান ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্য ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া

* In consequence of a movement for raising the status of certain persons, and amongst others the Maharaja, as Hindus, which was set on foot about the end of the year 1880-81, the Maharaja lost much of the respect of his people, and was also put to considerable expense.

Bengal Administartion Report. 1882-83.

কলাপ সর্ব্বদা সম্পাদন করিতেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন স্বার্থপর কুচক্রিব্যক্তি পর্ব্বতবাসী সমস্ত ত্রিপুরাজাতিকে ক্ষত্রিয়-বংশজ বলিয়া প্রচার ও রাজপরিবারভুক্ত করত, তাহাদের স্পৃষ্ট জল হিন্দুসমাজে চালাইবার জন্য মহারাজকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। তাহাদের পরামর্শে মহারাজ এরূপ প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, রাজপরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তি ও দূর-দর্শী দুই একজন অমাত্য এই দুরূহ কার্য্য হইতে মহারাজকে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হন। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমাজ বিপ্লবের সূচনা দর্শনে কলিকাতা গমন করেন। ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ সকলেই মহারাজের অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি মহারাজকে এইরূপ পরামর্শ প্রদান করেন যে, বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিতগণকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদিগকে পার্ব্বত্য জাতির স্পৃষ্ট জল পান করাইলেই মহারাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। মহারাজ এই কুপরামর্শকে সৎপরামর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বিক্রমপুর নিবাসী কতকগুলি অর্থগৃধ্নু পণ্ডিত ও চাকরিপ্রার্থী "উমেদওয়ার" রাজধানীতে উপনীত হইয়া ১২৯১ ত্রিপুরাব্দের ২০ মাঘ রজনীতে চতুর্দ্দশ দেবতার বাটীতে বসিয়া ত্রিপুরাজাতির স্পৃষ্টজল সহ কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিলেন। শ্রেণীবিভাগ ক্রমে সেই সকল পণ্ডিতগণ

৪। ৫। ৬ শত টাকা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইলেন। জলপায়িদলের নেতৃগণ প্রত্যেকে সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। উমেদওয়ারদিগের স্থান করিবার জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইল। * মহম্মদের শিষ্যগণ যেরূপ ধর্ম্ম প্রচারার্থ এক হস্তে কোরাণ অন্য হস্তে তরবারি লইয়া কিছুকাল জগতে বিচরণ করিয়াছিলেন, জলপায়িদলের নেতৃবর্গ সেইরূপ এক হস্তে ত্রিপুরাজাতির স্পৃষ্টজল এবং (ক্ষমতার অভাবে) অন্য হস্তে অর্দ্ধচন্দ্র লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ত্রিপুরাবাসী যে সকল হিন্দু রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি লোক চাকরির মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া জলপান করিলেন, অধিকাংশের ভাগ্যেই অর্দ্ধচন্দ্র লাভ হইল। তাঁহাদের স্থল, সেই সকল জলপায়ী উমেদওয়ারগণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। † দেবসেবা ও ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল "নগদি-বৃত্তি"

---

* এই সময় কৈলাসহরের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বিক্রমপুর নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত আগরতলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন।

† All officers who did not join in the movement were removed from the Maharaja's service and thier places filled by those who support it.

Bengal Administration Report. 1883-84.

(বার্ষিক কিম্বা মাসিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা) প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ বন্ধ করিয়া যে মহারাজ নিরস্ত হইয়াছিলেন এমত নহে. তিনি স্বয়ং "ভূবনেশ্বর" নামক এক শিবদেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বার্ষিক যে ৬০৲ টাকা "নগদি বৃত্তি' প্রদান করিয়াছিলেন, সেই দেবতার সেবাইতগণ ত্রিপুরাজাতির স্পৃষ্টজল পান করে নাই বলিয়া এই অপরাধে দেবতার বৃত্তি বন্ধ হইল। প্রস্তরময় ভুবনেশ্বরের বাক্য উচ্চারণ শক্তি থাকিলে, তিনি অবশ্যই মহারাজ বাহাদুরকে দত্তাপহারী বলিতেন। অত্যাচার উভয় পক্ষেই সমভাবে চলিতেছিল, মহারাজ যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বানাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাহাদের শূকর, মোরগ, ছাগী প্রভৃতি আহার বন্ধ করিয়া উপবীত ধারণ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন, স্নুতরাং তাহাদের আহারের যে নিতান্ত কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে যে সকল ত্রিপুরাবাসী চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেব পরিবারবর্গের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল। নগদিবৃত্তি বন্ধ হওয়ায় কতকগুলি মূক দেবতার আহার বন্ধ ও ব্রাহ্মণ পরিবার নিতান্ত কষ্টে পতিত হইলেন। মহারাজ স্বীয় জমিদারির অন্তর্গত স্থানবাসী হিন্দুদিগের প্রতি বল ও আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ বোধহয় রোমসম্রাট নিরো

কিম্বা খোরা তৈমুরের* ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতা থাকিলে মহারাজ বীরচন্দ্র তৎকালে ত্রিপুরাবাসী লক্ষ্য লক্ষ্য হিন্দুর মুণ্ড ছেদন করত আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ ব্রিটীস সিংহের আশ্রিত এবং আগরতলায় বসিয়া ব্রিটীস পলিটিকেল এজেণ্ট ও এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট ব্রিটীস প্রজাকে রক্ষা করিতেছিলেন। মহারাজের ভীষণ অত্যাচারে বাধ্য হইয়া ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইলেন। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নওয়াখালী, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টবাসী সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ ত্রিপুরার হিন্দু সমাজের সহায় হইলেন। তাঁহারা যদিও আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুগণের ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভীষণ সমাজ যুদ্ধে মহারাজকে বিশেষরূপে পরাজিত করিলেন। বাঙ্গালা দেশে এইরূপ সমাজ বিপ্লব বোধহয় কখনও সংঘটিত হয় নাই। ত্রিপুরাবাসী হিন্দুগণ এই সমাজ বিপ্লবে আপনাদের জাতীয়ভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কতকগুলি অর্থপিশাচ ব্যতীত ঢাকা নিবাসী অপর হিন্দুসাধারণ তাঁহাদের প্রধান সহায় ছিলেন। রাজকোষ অর্থশূন্য করিয়া, ত্রিপুরারাজ্যকে ঋণজালে বদ্ধ করিয়া, ৭ বৎসর অন্তে এই সমাজ বিপ্লব পরবর্ত্তী মন্ত্রী বাবু মহিনীমোহন বর্দ্ধনের কার্য্য কৌশলে

* তৈমুর লেং। লেং, (লেংরা) অর্থ খোড়া।

নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নূরনগর নিবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের প্রতি মহারাজের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না।

ভীষণ সমাজবিপ্লবানলে উৎসাহরূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক,—পূর্ণমাত্রায় আত্মস্বার্থ উদ্ধার করিয়া,—রাজ ভাণ্ডার শূন্য করিয়া,—আত্মভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া—১২৯২ ত্রিপুরাব্দের বর্ষাকালে দীনবন্ধু প্রেতপুরে গমন করিলেন। এই সময়ে মহারাজের প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবী পরলোক গমন করেন। মহারাজ তাঁহার শোকে কিছুকাল নিতান্ত কাতর ছিলেন। শীতকালে মহারাজ বালিশিরার পাহাড় ফিলনি মিউর কোম্পানীকে মকররী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন।* সেই টাকা দ্বারা মহারাণী ভানুমতীর পারলৌকিক কার্য্য সম্পাদন জন্য মহারাজ বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতৃগণও মহারাজের সহিত গমন করেন।

* যেরূপ একরার লিখিয়া দিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ফিলনি মিউর কোম্পানী হইতে নজরানার টাকা গ্রহণ করেন, কোনও বিবেচক ব্যক্তি এইরূপ একরার লিখিয়া দিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পত্নী বিয়োগ শোকে মহারাজ নিতান্ত অধীর ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অমাত্যগণ তৎকালে কি করিতেছিলেন, অসাধারণ নীতিশাস্ত্রবিৎ বিষ্ণু শর্ম্মা এবম্প্রকার মন্ত্রিবর্গকে রাজার প্রকৃত শত্রু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মহারাজের অনুপস্থিত কালে রাজ্য ও জমিদারির শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মহারাজ একটী সভা গঠন করিয়াছিলেন। যুবরাজ রাধাকিশোর তাহার সভাপতি ও অন্য ৪ ব্যক্তি তাহার সভ্য ছিলেন। যুবরাজ প্রায় ৪মাস বিশেষ দক্ষতার সহিত অবাধে রাজ্য ও জমিদারি শাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।*

মহারাজ বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণ কাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে, তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, ষড়যন্ত্রকারিদল তাঁহাদের ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে যত্নবান হইলেন। কিন্তু পলিটিকেল এজেণ্ট ও এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট এবং অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলেই বিখ্যাত মন্ত্রী ঠাকুর ব্রজমোহনের পুত্র ঠাকুর ধনঞ্জয় কে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার জন্য মহারাজকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। ধনঞ্জয় উদয়পুর বিভাগের শাসন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ও বিশেষ কার্য্যক্ষম বলিয়া যে কেবল প্রজাবর্গের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এমত নহে, ইংরেজ রাজ পুরুষ ও অপর

* The arrangement worked well.

Bengal Administration Report. 1882-83.

ভদ্র সাধারণেরও শ্রদ্ধা, প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। * পলিটিকেল এজেন্টের অনুরোধ রক্ষার্থে নামত দীনবন্ধুর ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র, ঠাকুর ধনঞ্জয় দেবকে প্রধান মন্ত্রীর

* উদয়পুর বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহার যত্নে "ডাইনবলি" নামক লোমহর্ষণ নরহত্যা কাণ্ড রহিত হয়। ঠাকুর ধনঞ্জয়ের এই কীর্ত্তি ইতিহাস লেখক অনন্তকাল ঘোষণা করিবেন। পাঞ্জিহাম রায় নামক জনৈক রিয়াং সরদারের বাড়ীতে (গ্রামে) কপিরায় নামক এক ব্যক্তি বাস করিত, সাধারণতঃ তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করিয়া কপিরায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। প্রাচীন সংস্কার অনুসারে সেই গ্রামের কালাহারিয়াং প্রভৃতি কতকগুলি লোক গরিব কপিরায়কে ডাইন বলিয়া স্থির করিল। তাহারা কপিরায়ের স্ত্রী খিচিমাকে বলিল, "তোমার স্বামী ডাইন হইয়াছে, অতএব তাহাকে বধ করা উচিত।" খিচিমা বলিল, "সে ডাইন হইয়া থাকিলে তাহাকে বধ করিতে পার।" তদনন্তর ১২৯১ ত্রিপুরাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদা দিবা দুই প্রহরের সময় পর্ব্বত মধ্যস্থিত নিবিড় অরণ্যে কালী পূজা উপলক্ষে হতভাগ্য কপিরায়কে বলিদান করা হয়। প্রায় ১০ মাস অন্তে ঠাকুর ধনঞ্জয় এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ অবগত হন। তদনন্তর তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত ইহার তথ্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কালাহা রিয়াং প্রভৃতি ৯জন,—"ডাইন বলি" নামক নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি—কে বিচারার্থে সদরে প্রেরণ করেন, সেসনের বিচারে তাঁহাদের কারাদণ্ড হইয়াছিল।

পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্রকারিদলের চক্রান্তে তিনি কিছুমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার মন্ত্রণাশক্তি পরিচালন ক্ষমতার প্রতিরোধ জন্য ৭ জন মেম্বর দ্বারা একটী সভা গঠিত হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতা প্রাইবেট সেক্রেটারী, মহারাজের সেক্রেটারী হইলেন। সেক্রেটারীর দল পদে পদে মন্ত্রীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। জলাচরণ উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থপিশাচগণ নানা প্রকার উপায়ে লুট পাট করিতে লাগিল। ঋণজালে রাজ সংসার ডুবু ডুবু হইয়াছিল, তথাপি ঋণ করিয়া অর্থ যোগাইবার জন্য মহারাজ মন্ত্রীকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময় মহারাজ বাহাদুর (৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে,) স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী, মহারাণী ভানুমতীর কনিষ্ঠা ভগিনীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই বালিকা "মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবী" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইলেন।

ঠাকুর ধনঞ্জয় তিন বৎসর কাল মহারাজের ও ষড়যন্ত্রকারীদলের উৎপীড়নে নানা প্রকার অপমান ও কষ্ট ভোগ করিলেন। এই সকল বিশৃঙ্খলা দর্শনে গবর্ণমেণ্টের রোষ উদ্দীপ্ত হইল। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়া কিছু দিনের জন্য মহারাজ বাহাদুর "গা ঢাকা" দিতে মনস্থ করিলেন। ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের আরম্ভে ঢাকা বিভাগের স্কুল আসিষ্টাণ্ট

ইনস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেনকে মহারাজ মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করিলেন।*

প্রকৃত পক্ষে বাবু দীননাথ সেন তিন মাসের অধিক আগরতলায় ছিলেন না। এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি বনকরের আয় ৬০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করেন। সংসার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র ভাবে গঠন করিয়া তিনি সুশৃঙ্খলতার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অল্পকাল কার্য্য করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দীর্ঘকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে মাসিক ৮০০৲ শতের অধিক বেতন রাজসরকার হইতে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন; সুতরাং তিনি রাজকীয় কার্য্য উপলক্ষে ঢাকায় গমন করিয়া, প্রায় তিন মাস অন্তে স্বীয় পদত্যাগ পত্র মহারাজ সমীপে প্রেরণ করেন।

* তৎকালে সার রিভার্স টমসন বলিয়াছিলেন :—

If the Maharaja of Hill Tipperah—a State of ancient and distinguished lineage—cannot see his way to an effective reduction of the personal and other expenses at the capital, the Lieutenant Governor anticipates very little from the exertions of any minister, however energetic and earnest in the way of real reform.

Calcutta Gazette. 22nd September, 1886.

তদনন্তর মহারাজ পুনর্ব্বার মন্ত্রী অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। "তুমি সকলের নিকাশ গ্রহণ করিবে তোমার নিকাশ গৃহিত হইবেনা" এবম্প্রকার অঙ্গীকৃত হইয়া মহারাজ কুমিল্লার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বি এলকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করেন।

১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের ১০ অগ্রহায়ণ বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় দুইবৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় লুট পাটের প্রশস্ত উপায় "বরাতী" প্রথা বন্ধ করিবার জন্য অতিবাহিত হয়। তাঁহার কৌশলজনক কার্য্য দ্বারা সমাজ বিপ্লবের ভীষণ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সময়েই "চিফ জষ্টিসের" পদ সৃষ্টি হইয়া যুবরাজ খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। (১২৯৬ ত্রিপুরাব্দের মাঘ মাসে।) আপীলের সুযোগ্য ও সুধীর বিচারক উজীর-বংশধর ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেব খাস আপীল আদালতের জজের পদে নিযুক্ত এবং আপীল ও সেসন আদালতের বিচারকার্য্যভার ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী ঠাকুর ধনঞ্জয়ের হস্তে স্থায়ীরূপে ন্যস্ত হইয়াছিল।

মোহিনী বাবু প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন, কর্ম্মচারিবর্গের বিদায় সম্বন্ধীয় আইন, ও নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ক বিধান প্রভৃতি কয়েকখণ্ড আইন প্রণয়ন করেন।

তিনি মহারাজের প্রিয়পাত্রদিগের ইজারা মহালের খাজানা উপযুক্ত রূপে বৃদ্ধি ও বাকী আদায় করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হন। তাঁহার কার্য্য কালে রাজ্যের আয় অল্পবৃদ্ধি হইয়াছিল। যুবরাজ বাহাদুরের যত্ন ও উৎসাহে মোহিনী বাবু পার্ব্বত্য জুমীয়া প্রজা বর্গের উন্নতি বিধান জন্য বাঙ্গলায় প্রচলিত প্রথামতে কৃষিকার্য্য শিক্ষার্থে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বত্য প্রজাদিগের বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক চির প্রচলিত তৈথং (বা তৈথন) প্রথা রহিতের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। তিনি ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ব্বসীমা প্রসারিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময় ষড়যন্ত্রকারিদলের ও তাহার অন্যান্য শত্রুগণের চক্রান্তে তিনি আগরতলা পরিত্যাগ করেন এবং কুমিল্লা হইতে স্বীয় পদ ত্যাগ পত্র মহারাজ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১২৯৮ ত্রিপুরাব্দের অগ্রহায়ণ।)

১২৯৮ সনের ১১ পৌষ মহারাজ বীরচন্দ্র রাজ্য ও জমিদারি শাসন জন্য একটি মন্ত্রী সভা গঠন করেন। সেই সভা রাজস্ব ও ব্যয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মহারাজের শ্যালক ঠাকুর নরধ্বজ সিংহ, দুর্য্যোধনের সহচর কর্ণ সদৃশ মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রিয় সহচর ও সেক্রেটারি বাবু রাধারমণ ঘোষ, সুযোগ্য দেওয়ান দুর্গাপ্রসাদ গুপ্ত ও অনুগৃহীত দেওয়ান হরিচরণ নন্দী এই মন্ত্রী সভার সভ্য হইলেন।

সর্ব্বসাধারণে ইহাকে একটি প্রহসন বিবেচনা করিল। কোন কোন ব্যক্তি উপহাস করিয়া ইহাকে "চারিইয়ারিদল" বলিত। এই সভা রাজকীয় যে অনুমতি পত্র দ্বারা গঠিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল যে, যুবরাজ ও বড় ঠাকুর ইহার কার্য্য কলাপ পরিদর্শন পূর্ব্বক রাজসমক্ষে রিপোর্ট করিবেন। প্রকৃত পক্ষে সেই সভার কার্য্য কলাপ পরিদর্শনের ক্ষমতা যুবরাজ ও বড়ঠাকুরের ছিল কিনা তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে। মাসাধিক কাল অতীত হইতে না হইতে "ইয়ার" চতুষ্টয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। নরধ্বজ ভগ্নধ্বজ হইয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট বাবু উমাকান্ত দাস ইহা নিবারণ জন্য যত্নবান হইলেন। চরণ সেনাপতি নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী নিছন্দবতীর সহমরণ উপলক্ষে উমাকান্ত বাবু সতীদাহ নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান হন। মোহিনী বাবু উমাকান্ত বাবুর মতানুমোদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর "চারিইয়ারি" দলের প্রভুত্বকালে ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের ৮ জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা মহারাজ সতীদাহ নিবারণ করেন।*

* The Maharaja has, in accordance with advice given to him, prohibited by a duly promulgated

"চারিইয়ারি" দলের শাসন কালে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্যের আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৯৮৪২ টাকা কমিয়াগেল। গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, ত্রিপুরার মহারাজকে বারংবার সদুপদেশ প্রদান করিয়াও কোন ফল লাভ হইতেছে না। রাজ্যের বিশৃঙ্খলতার ও আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য মহারাজ কিছুই করিতেছেন না, অগত্যা গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্য্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দের শরৎকালে পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিয়ার সাহেব আগরতলায় উপনীত হন। তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার ৫ বৎসরের জন্য মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন বলিয়া লিখিয়াদেন। * পশ্চাৎ উপযুক্ত মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ নিবারণ করেন এবং মহারাজের প্রার্থনা অনুসারে এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট বাবু উমাকান্ত দাসকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করেন।

---

order the practice of *Suttee* which formerly was permitted.

Bengal Administration Report. 1888-89.

* পশ্চাৎ রাজপক্ষ হইতে এরূপ প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, মহারাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পলিটিকেল এজেণ্ট এরূপ লেখাইয়া লইয়াছিলেন।

উমাকান্ত বাবুকে ত্রিপুরা রাজকার্য্যে "মোতায়েন" করিয়া, গবর্ণমেণ্ট এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্টের পদ "এবালিস" করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহা অনুধাবন করিলেন না যে, কালক্রমে উমাকান্ত বাবুর অবস্থা নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিবে। একমুণ্ডদ্বারা দুই দেবতার পূজা করা বড়ই কষ্টকর।

১৩০০ ত্রিপুরাব্দের ৪ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে) রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর মন্ত্রী স্বরূপে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। কূর্ম্মনীতি পরায়ণ মহারাজ বীরচন্দ্র, উমাকান্ত বাবুর নিয়োগ পত্রে তাঁহাকে প্রায় সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র ৫টী বিষয়ে মহারাজের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল।*

* নিম্নলিখিত ৫টী বিষয়ে মহারাজের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে। ১—অপরাধীর প্রাণদণ্ড, ২—মকররি জমায় কোন তালুক প্রদান, ৩—২০০৲ টাকার উর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও অবসর, ৪—৫০ টাকার উর্দ্ধ বৃত্তিপ্রাপ্ত ঠাকুরলোকদিগের বৃত্তি বহাল ও বাজেয়াপ্ত, ৫—রাজপরিবার সংক্রান্ত বিষয়। তৃতীয় বিষয়টি বোধ হয়, কেবল ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতৃবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। বাবু দীননাথ সেনের নিয়োগ কালেও এইরূপ ১০০ টাকার উর্দ্ধবেতনের কর্ম্মচারি বহাল ও বাজেয়াপ্তের অধিকার মহারাজ স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ও নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

Calcutta Gazette. 22nd September. 1886.

রাজ্য ও জমিদারি শাসন সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা দূরকরিয়া বাবু উমাকান্ত উন্নতির পন্থা পরিষ্কার করিলেন। তিনি মহারাজের প্রাপ্য বাকী আদায় করিয়া মহাজন ও ও নানা প্রকার প্রাপকের প্রাপ্য দেনা প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিশোধ করিয়াছিলেন। মহারাজের প্রিয় ও সুচতুর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বেতন প্রায়ই ফাজিল লইয়া যাইতেন, অপর সাধারণ কর্ম্মচারিগণের বেতন দীর্ঘকাল বাকী পড়িয়া থাকিত, তাঁহারা অনাথ শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতেন। উমাকান্ত বাবু এই সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া, কর্ম্মচারীগণকে নিয়মিত রূপে মাসিক বেতন প্রদান করিতে লাগিলেন। সৈন্য বিভাগে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। উমাকান্ত বাবু সৈন্য বিভাগ হইতে অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে অবসর ও স্থানান্তরিত করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম করিয়াছিলেন। ১৩০০ ত্রিপুরাব্দের শাসন বিবরণী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে সামরিক বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৪ জন সৈন্য ছিল।*

উমাকান্ত বাবুর শাসনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী-

* ২৪৫ জন পদাতি সৈন্য, ৫ জন বিগ্‌লবাদক, অবশিষ্ট হুদ্দাদার (অফিসার)। পুলিস বিভাগে ২৬৪ জন সৈন্য ও হুদ্দাদার ছিল। সুতরাং সামরিক ও পুলিস বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৫৮ জন লোক দেখা যাইতেছে।

বর্গের চিরস্থায়ী আশঙ্কাযুক্তভাব বিদূরিত হইয়াছিল। বিবিধ সদ্‌গুণ মণ্ডিত যুবরাজ রাধাকিশোর বাহাদুর বিচার বিভাগের উন্নতি বিধান করত ন্যায় বিচারের পন্থা পরিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজদরবার কিম্বা রাজদরবার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের মোকদ্দমায় বিচারকগণের বিবেক-শক্তি প্রায়ই কূর্ম্মের হস্ত পদের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইত। * উমাকান্ত বাবুর শাসনকালে সেই দোষের লেশ মাত্র ছিলনা।

পূর্ব্ব হইতে আগরতলায় একটী সামান্য রকমের ইংরেজি-বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। যুবরাজ বাহাদুরের উৎসাহ ও সাহায্যে উমাকান্ত বাবুর দ্বারা সেই বিদ্যালয়টী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট এণ্ট্রেন্সস্কুলে পরিণত হইয়াছিল এবং অসভ্য ত্রিপুরা, কুকি, হালামদিগকে বঙ্গভাষায় শিক্ষা দান জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন ও যত্ন করা হইয়াছিল।

মহারাজের জমিদারীর শাসন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ

* Justice is said to be fairly administered when the cases are between subjects and subjects; but when the state or any one having influence in the Durbar, is one of the parties, the presiding officers of the court are said occasionally to appear to lose nerve.

Bengal Administration Report. 1888-89.

জন্য উমাকান্ত বাবু ইহাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। প্রতি বিভাগে এক এক জন সব-মেনেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময় বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার চার্লস ইলিয়ট সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে মহারাজ স্বীয় জমিদারি জরীপ ও জমাবন্দী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করেন।

উমাকান্ত বাবু প্রায় আড়াই বৎসর মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম একবৎসর কাল তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত অবাধে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; অবশিষ্ট ১॥০ বৎসর কাল মহারাজ ও তাঁহার স্নেহপালিত ষড়যন্ত্রকারিদলের সহিত নিয়ত কলহ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র যখন যে মন্ত্রী (প্রধান কর্ম্মচারী) নিযুক্ত করিয়াছেন, তখনই তাহাকে মুক্ত হস্তে ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহিত করিয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারিগণও শিশির সমাগমে বীর্য্যহীন বিষধরের ন্যায় তৎকালে জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছেন। * তদনন্তর যখন মন্ত্রীর ন্যায়সঙ্গত কার্য্যে মহারাজের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসোচিত কার্য্য

* উমাকান্ত বাবু যৎকালে কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সেই সময় ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতা রাজ কার্য্য হইতে কিরূপে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত উমাকান্ত বাবুর প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে দ্রষ্টব্য। *Administration of the State of Tipperah,* 1300 *T. E. page 9.*

বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই তাঁহার প্রতি মহারাজের বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে। তখন ষড়যন্ত্রকারিদল গ্রীষ্ম সমাগমে উত্তেজিত কাল-ভুজঙ্গের ন্যায় ফণাবিস্তার পূর্ব্বক মন্ত্রীকে দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বাবু উমাকান্তকে পদচ্যুত করিবার জন্য চিরন্তন পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সময় ষড়যন্ত্রকারিগণ যে ঘৃণিত ও ভীষণউপায় দ্বারা আপনাদের দলবৃদ্ধি ও উমাকান্ত বাবুকে পদচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার গূঢ়তত্ত্ব ইতিহাসে উল্লেখ করিতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। মনুষ্য স্বার্থসাধনজন্য যে কতদূর নারকীয় ভাব অবলম্বন করিতে পারে ২। ১ জন ষড়যন্ত্রকারী তাহার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

উমাকান্ত বাবু যৎকালে রাজ্যের উন্নতি সাধন জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন, মহারাজ সেই সময় তাঁহাকে ত্রিপুরারাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য কিরূপ কূটনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বক্ষ্যমান ঘটনা দ্বারা তাহা সামান্যভাবে প্রদর্শিত হইল।

ষড়যন্ত্রকারিগণের পরামর্শে মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, "জরিপ ও জমাবন্দী" কার্য্যে মহারাজের পক্ষে উপযুক্ত তদ্বির চালাইবার জন্য চাকলে রোশনাবাদের একজন বিশেষ উপযুক্ত "সাহেব" ম্যেনেজার নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এই

রূপে কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক মহারাজ বীরচন্দ্র সার চার্লস ইলিয়টের বিশেষ পরিচিত (পেনসিয়ান প্রাপ্ত সিবিলিয়ান) মেকমিন সাহেবকে চাকলে রোশনাবাদের মেনেজারের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।* বাঙ্গালি চাকর উঠাইবার জন্য সাহেব চাকর নিযুক্ত করা হইল। মেকমিনের নিয়োগ পাকা হইলে মহারাজ বলিলেন, আর অধিক বেতনে দুইজন কর্ম্মচারী রাখা নিষ্প্রয়োজন, যুবরাজ ও বড় ঠাকুর রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন সুতরাং মন্ত্রী রাখা হইবেনা। এই সকল হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক মহারাজ বাবু উমাকান্তকে পদচ্যুত করিয়া অন্যব্যক্তিকে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য অনুমতি করিলেন। উমাকান্ত বাবু সেই আদেশ প্রাপ্তমাত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন, এবং মহারাজকে জানাইলেন যে, "গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে আমি কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারিনা।" গবর্ণমেণ্ট উমাকান্ত বাবুর রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া মহারাজের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট উমাকান্ত বাবুকে জানাইলেন, যে, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কুমিল্লায় উপনীত হইয়া যথা-কর্ত্তব্য অবধারণ

* Mr Mc'Minn has been appointed to have charge of the Zemindaris and to superintend the survey on the Maharaja's behalf.

Calcutta Gazette. 4th October 1893.

করিবেন। উমাকান্ত বাবু গবর্ণমেণ্টের হুকুমের বলে "স্বাধীন ত্রিপুরা" শাসন করিতে লাগিলেন। "স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর" মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বেগতিক দেখিয়া পুনর্ব্বার উমাকান্ত বাবুকে লিখিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ সাপক্ষে আপনাকে মন্ত্রিত্ব কার্য্যে স্থির রাখা গেল।' ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কুমিল্লায় উপস্থিত হন। মহারাজ, যুবরাজ, বড় ঠাকুর ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয় এবং ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতৃবর্গকে লইয়া তৎপুর্ব্বেই কুমিল্লায় উপনীত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে উমাকান্ত বাবুকে পদচ্যুত করিয়া মহারাজ যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তদনন্তর মহারাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে বিবিধ প্রকার কাকুতি মিনতি করিলে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আদেশ করিলেন যে, উমাকান্ত বাবুকে উঠাইয়া লইবেন, কিন্তু চট্টগ্রামের কমিসনর কুমিল্লায় উপস্থিত হইলে মহারাজ স্বয়ং কিম্বা (তিনি অপারগ হইলে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ) যুবরাজ ও বড়ঠাকুর তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কমিসনর সাহেব যখন যে বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিবেন, মহারাজ তাহাই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন। তদতিরিক্ত মহারাজ গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রতিবৎসর (রাজ্য শাসন সংক্রান্ত) "বার্ষিক নিকাশ"* প্রদান করিবেন।

* *Annual Administrution Report.*

এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বারা আমাদের গবর্ণমেণ্ট ও ত্রিপুরেশ্বর যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের কোন২ নরপতি কিম্বা পার্ব্বত্য সরদার হইতে এবম্প্রকার অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার জন্য ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। "স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর" অদ্য বিনা-মূল্যে ব্রিটীস সিংহের-চরণে সেই "স্বাধীনতা" স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উপহার অর্পণ করিতেছেন, ইহা অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের সুখের বিষয়। আর মহারাজ বীরচন্দ্র অবশ্যই আগরলতার রাজান্তঃপুরে যাইয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন, যে তিনি উমাকান্ত বাবুকে বরখাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ইহা অবশ্যই তাঁহার পক্ষে হর্ষের বিষয় বটে।

মহারাজ বীরচন্দ্র পূর্ব্বোক্তরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এইরূপ আদেশ করিলেন যে, উমাকান্ত বাবুর কার্য্যকালের দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া তিনি মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিবেন। তদনুসারে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করত ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের আশ্বিন মাসে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থায়ি কার্য্য "ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটিতে" তাঁহাকে আলিপুরে প্রেরণ করিলেন। *

---

* In Hill Tipperah the Minister Rai Umakanta Das Bahadoor was permitted to retire

মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুরের মনঃপ্রীতির আর একটী কারণ এই হইয়াছিল যে, এক্ষণ তিনি পূর্ব্বের ন্যায় "স্বাধীন" নরপতি হইলেন। আগরতলায় পলিটীকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে "পাইওনিয়র" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল যে:— "সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও শাসন হইতে উন্মুক্ততা যদি রাজন্যবর্গকে সুখ প্রদান করে এবং সমকক্ষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনের কারণ হয়, তাহাহইলে পর্ব্বত-ত্রিপুরার রাজা নিশ্চয়ই ভারত-বর্ষীয় নৃপতিমণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ও সর্ব্বপ্রধান। যিনি তিনসহস্র বর্গমাইল রাজ্যের অধিপতি, যাঁহার আদেশই জীবন মরণের একমাত্র ব্যবস্থা, যিনি কাহাকেও কর দেন না, যিনি স্বেচ্ছানুরূপ সংগ্রাম ঘোষণা অথবা করনির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম, যিনি ব্রিটিস কর্ম্মচারীর অনুশাসনের অধীন নহেন, যাঁহার রাজ্য বিদেশীয়গণের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিম্বা যাঁহার কার্য্য কলাপ সংবাদপত্র দ্বারা

---

during the year, he had thoroughly reorganized the finance of State and relieved it of its embarrassments. His attempts, however to bring the administration of the State into accord with advanced ideas led to complications, and his positions became untenable.

Calcutta Gazette. 4th October, 1893.

সমালোচিত হয় না, এবম্প্রকার গর্ব্বীত স্বাধীনতার উপর একমাত্র এই নরপতিই দণ্ডায়মান বটেন।” *

সম্রাট স্বরূপে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরার সামন্ত নরপতির যে সকল ক্ষমতা বিলোপ করা উচিত বোধ করিয়াছিলেন, তাহা সাধন পূর্ব্বক আগরতলা হইতে পলিটিকেল এজেণ্ট উঠাইয়া লইলেন। ত্রিপুরারাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হইয়া, ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখা নির্ণয় করত, সীমান্ত প্রদেশ প্রকৃষ্ট রূপে সুরক্ষিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট আগরতলায় পলিটিকেল এজেণ্টের পদ এবালিস করিলেন, কিন্তু ত্রিপুরাপতি কিম্বা তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের হস্ত হইতে উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য জনৈক রাজকর্ম্মচারী আগরতলা সর্ব্বদা উপস্থিত রখা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্যছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পল তৎকালে পলিটিকেল এজেণ্ট উঠাইয়া আগরতলায় এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন, তৎকালে আসামের চিফ কমিসনার সাহেব ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। † গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত

* *Pioneer, 4th May* 1870. (*see also Mackenzie's North-East Frontier of Bengal. page* 561.)

† *Mackenzie's North-East Frontier of Bengal page 320.*

হওয়ায় সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, প্রজা রক্ষার জন্য একজন এসিষ্টেন্ট পলিটিকেল এজেন্ট আগরতলায় রাখার যে প্রয়োজন ছিল, সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। মহারাজ কুমিল্লায় যাইয়া কমিসনর সাহেব নিকট স্বীয় কার্য্যকলাপের নিকাস দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কোন ব্রিটিস প্রজা তাঁহা দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, সেই প্রজা "এক্স অফিসিও" পলিটিকেল এজেন্ট নিকট কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হইয়া কি সেই ঘটনা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে? কখনই নহে। এবম্প্রকার ও অন্যান্য বহুবিধ কারণে আগরতলায় জনৈক এসিষ্টেন্ট পলিটিকেল এজেন্ট রাখা সম্রাট স্বরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ইতিহাস লেখক বিবেচনা করেন।

উমাকান্ত বাবু প্রস্থান করিলেন। ষড়যন্ত্রকারিদল তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসনের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজস্ব, বিচার, পুলিস, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিভাগের ভার যুবরাজ বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্যয়, সামরিক ও পলিটিকেল বিভাগ ইত্যাদি বড়ঠাকুর বাহাদুরের হস্তে রক্ষিত হইল। (!!!) রাজা মুকুন্দরাম রায় সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। যুবরাজ বাহাদুরের হস্তে যে সমস্ত বিভাগের কার্য্য অর্পিত হইল, সেই সকল বিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী বহুকাল হইতে কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ

করত বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিলেন, এবম্প্রকার প্রায় ৩০।৩২ জন কে বিদায় করত তাঁহাদের স্থান ষড়যন্ত্রকারিগণের আত্মীয় ও অনুগতব্যক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইল। ষড়যন্ত্রকারিদলের নেতা কোন কার্য্যের দায়িত্ব স্পর্শ করিলেন না, অথচ নিঃশঙ্ক ও নিষ্কণ্টক হইয়া স্বীয় আধিপত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রায় তিন বৎসর হইল উমাকান্ত বাবু কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কাল মধ্যে যে, রাজ্যের কোনরূপ উন্নতি কিম্বা মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা দৃষ্ট হয় না। বরং এই কাল মধ্যে ত্রিপুরারাজ্যের প্রজা ও ত্রিপুরাবাসী ব্রিটিস প্রজা যে উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মহারাজ তাহার প্রিয়পাত্রবর্গকে অল্প জমায় তালুক ও ইজারা প্রদান করত রাজ্যের আয় খর্ব্ব করিয়াছেন।* পক্ষান্তরে দরিদ্র প্রজাবৃন্দের রক্ত শোষণ

* মহারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্য স্বীয় মহিষী কুটিলাক্ষী দেবীকে চাকলেরোশনাবাদ মধ্যে একটি তালুক প্রদান করেন। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য তাহা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন। সেই মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিগণ ১৮৩৭ খৃঃ অঃ ৪ঠা মে অবধারণ করিয়াছেন যে, কোন রাজা এই জমিদারির অন্তর্গত কোন ভূমি পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে তালুক দিতে পারিবেনা :—At present it is deemed proper to establish this

করত রাজস্ব ও শুল্ক বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। বিচার বিভাগে বিচারের নাম করিয়া কিরূপ অবিচার হইতেছে, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান উকীল বাবু নবকুমার সেন এবং মণিপুরী ও অন্যান্য প্রজাবর্গের গবর্ণমেণ্ট ও পলিটিকেল এজেণ্ট সমীপে দাখিলি আবেদনপত্র তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুবরাজ বাহাদুরের হস্তে যে সমস্ত বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল বিভাগের কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে অধিকাংশ দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছে। যে যুবরাজ বাহাদুর, মহারাজ বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে প্রায় ৪ মাস কাল রাজ্যশাসন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; যিনি কেবল বিচার বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়া সেই বিভাগের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধন করত †

custom, that no Raja has the power to grant talookas out of the lands of the said Zemindary এই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী, ভাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রের (রাজ্য ও জমিদারিস্থিত) তালুকগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, আবার সেই মহারাজ বাহাদুরই কল্পতরুর ন্যায় স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, শালা সম্বন্ধি প্রভৃতিকে তালুক প্রদান করত অসাধারণ দাতৃত্বগুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

† The Jubraj, as presiding officer of the Chief Court of justice, is said to have done much

রাজ্যের অন্যান্য মঙ্গল ও উন্নতি জনক কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছেন এবং যাঁহার গুণরাশি অল্পকাল মধ্যে জন সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই যুবরাজ বাহাদুর এক্ষণ কেন কলঙ্কের ভাগী হইতেছেন, প্রকৃত পক্ষে বোধ হয়, যুবরাজ বাহাদুর স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। উপযুক্ত ও ক্ষমতাশালী মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া রাজপুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করা একটি "প্রহসন" বা "ছায়াবাজী" মাত্র। ইহা দ্বারা ষড়যন্ত্রকারিদলের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া অদৃষ্টরূপে হস্তসঞ্চালন করত তাঁহারা অদ্ভুত নাটকের অপূর্ব্ব অভিনয় করিতেছেন। মহারাজ ষড়যন্ত্রকারিদলের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করতঃ সুখে অধঃপাতে যাইতেছেন, পুত্র তাহাকে কিরূপে নিবারণ করিবে।

to improve the condition of the Subordinate Courts and of the Jails.

Bengal Administration Report. 1888-89.

The Chief Judge of the Khash Appellate Court is the Jubraj Bahadoor, who as usual took an intelligent interest in the general administration of justice.

Report on the Administration of the State of Tipperah. 1300 T. E.

মহারাজ বীরচন্দ্রের বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন ষষ্টিবৎসর হইবে। ঈশ্বরী বা মহারাণী উপাধি প্রাপ্তা তাঁহার তিন পত্নী। তন্মধ্যে যুবরাজ বাহাদুরের জননী মহারাণী রাজেশ্বরী মহাদেবী ও বড়-ঠাকুরের মাতা মহারাণী ভানুমতি মহাদেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। মহারাণী মনোমোহিনী মহাদেবী এক্ষণ জীবিত আছেন। তদ্ব্যতীত উপাধি অপ্রাপ্তা তাঁহার আর যে সকল পত্নী আছেন, আমরা তাহার সংখ্যা লিখিতে অক্ষম। আমাদের জ্ঞাত মতে মহারাজের ৯টি পুত্র ও ১৬টি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আকৃতি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, মুখশ্রী অনেকটা বাঙ্গালির ন্যায়, চক্ষু সুন্দর, নাসিকা উন্নত।

মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। উভয় গ্রন্থই গীতিকাব্য। তাঁহার গীতির অনেকগুলি “বর্জ্জি” বুলিতে রচিত, সেগুলি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ণকবি গণের অনুকরণে লিখিত, অনুকরণ হইলেও তাহাদের ভাব সরল, মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতি কবিতাই প্রেমের কাকলীপূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের ছায়া পাতে সমুজ্জল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সুন্দর

কবিতা কুসুমের সৌরভ আগরতলার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কদাচিত কাহাকেও আকুলিত করিয়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় কবি সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।

মহারাজ উর্দ্দু ও মণিপুরী ভাষায় মাতৃ ভাষায় ন্যায় আলাপ করিতে পারেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা সামান্য রূপ অবগত আছেন। তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার; সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পানাদি দোষ বর্জ্জিত, বুদ্ধিমান, কুটনীতি-পরায়ণ ও অত্যন্ত বাক্‌পটু। তাঁহার বাক্যন্যাস শক্তি এইরূপ প্রবল যে তৎপ্রতি ভীষণ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, সেই ভাব পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি স্বীয় কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম হইলেও তাঁহার ক্রোধ সংবরণ শক্তি এত অসাধারণ যে, তাহা সহজে কেহ উপলব্ধিকরিতে পারেন না। তাহার হৃদয় দৌর্ব্বল্যই বারংবার মন্ত্রী পরিবর্ত্তন ও ষড়যন্ত্র কারিদলের অন্যায় প্রাধান্যের কারণ।

মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও কোন কোন বিষয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। যদি মহারাজের যত্নে এই সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইত, তাহ

হইলে অদ্য আমরা তাঁহাকে ইদানীন্তন ভারতীয় নরপতি মণ্ডলীর মুকুটমণি বলিয়া ইতিহাসে বর্ণনা করিতাম। প্রকৃত পক্ষে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের যত্নে ও কোন কোন মন্ত্রী বা প্রধান কর্ম্মচারীর চেষ্টায় এই সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই মহারাজের কার্য্য কলাপ তাহার প্রতিরোধক হইয়াছে। * প্রজার নিঃশঙ্কভাব ও রাজার প্রতি প্রজার ঐকান্তিক বিশ্বাসই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। কিন্তু ত্রিপুরারাজ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত হইয়াছে। †

মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র, ত্রিপুরার ভাবি-নরপতি যুবরাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন চত্বারিংশ বৎসর। তিনি শান্ত, সুশীল, দয়ালু, ও

* This very unsatisfactory state of affairs is due almost entirely to the want of firmness on the part of the Maharaja.

Calcutta Gazette, 22nd September 1886.

† Sir Rivers Thompson fears that that sense of absolute security, which is essential for the growth of a people's welfare and prosperity, does not exist in Hill Tipperh.

Calcutta Gazette, 22nd Septmber 1886

বিদ্যানুরাগী।* প্রকৃতি তাঁহাকে গুণরাশিতে মণ্ডিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজ ঈশানচন্দ্রের একমাত্র জীবিত পুত্র কুমার নবদ্বীপচন্দ্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুমার রাধাকিশোরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কালে, মহারাজ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ক্রমেই সেই স্নেহের হ্রাস দেখা যাইতেছে। মহারাজ প্রথমতঃ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী ভানুমতী দেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমার সমরেন্দ্র ও তাঁহার অনুজের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়াছেন। তদনন্তর তাহা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া তৃতীয় মহিষী মনোমোহিনী দেবীর গর্ভজাতপুত্র জ্যোতিরিন্দ্র নাথকে ও অভিষিক্ত করিয়াছে। যে পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া মহারাজ পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে পুত্র তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যের একমাত্র অধিকারী, সেই পুত্রের প্রতি মহারাজের অবজ্ঞা নিতান্ত বিস্ময়জনক। কুমার সমরেন্দ্রের বিদেশভ্রমণ জন্য মহারাজ

---

* The hope that the excellent example of the Joobraj would induce many of the Thakurs to apply themselves to study has not been fulfilled. The prince continues to take an intelligent interest in education and in the abministration of the State.

Bengal Administration Report. 1876-77.

বারংবার অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু যুবরাজের মানসিক উন্নতি সাধন জন্য বিদেশ ভ্রমণার্থে তাঁহাকে প্রেরণ করিবার কারণ যখনই ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুরোধ করিয়াছেন, তখনই মহারাজ স্বীয় দৈন্যদশা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। * আমরা দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি, যে ইহার অভ্যন্তরে কূটনীতির উপাসক মহারাজ বাহাদুরের একটি কূট অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইতিহাস লেখক তাহার যবনিকা উত্তোলন করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু

* It is to be regretted that the education even of the Jubraj, the heir to the Guddi, has been neglected. His younger brother the Barathakur, visited Calcutta at the time of the international exhibition, and is said to have profitted much by what he saw and heard. The Jubraj has, however, never been allowed an opportunity of leaving Agurtola. The Maharaja has frequently been advised to let his eldest son see something of the world, but, as in every thing else pecuniary embarrassments are pleaded as an obstacle to the measure. In view of the liberty conceded to the younger brother, such explanation is scarcely intelligible.

Bengal Administration Report 1883-84.

আমরা ত্রিপুরারাজ্যে "বিজয় বসন্তের" অভিনয় দর্শন না করিলেই সুখী হইব।

বীরবংশ প্রসূত যুন পণ্ডিত জেরুম বলিয়াছেন "সত্য বলিবে, যদি সত্যবাক্য প্রকাশ দ্বারা অপ্রীতির কারণ উদ্ভব হয়, হউক, তথাপি সত্য গোপন করিবে না" * আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানুসরণ করিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের ইতিহাস শেষ করিলাম। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর জীবিত নরপতি বলিয়া তৎসম্বন্ধে কতগুলি বিষয় আপাতত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। উপযুক্ত সময়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব। কিম্বা ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক তাহা সম্পাদন করিবেন।

* If an offence come out of the truth, better is it that offence come, than the truth be concealed.
Jerome.

রাজমালা।



তৃতীয় ভাগ।

রাজমালা।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

কাছাড়ের বিলুপ্ত রাজবংশ।

ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কাছাড়ের নির্ব্বাণ প্রাপ্ত রাজবংশ ও ত্রিপুরার রাজবংশ একমূল হইতে উদ্ভূত। রাজমালার মতে মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৃক্‌পতি উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে কাছাড়ের রাজদণ্ডধারণ করেন। মতান্তরে—কামরূপের পূর্ব্বাংশে কা—বংশীয়গণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। পর্ব্বতবাসী মানবগণ দ্বারা সেই রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির জ্যেষ্ঠপুত্র কাছাড় রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা, সেই নরপতির কনিষ্ঠপুত্র ত্রিপুরা রাজবংশের আদি পিতা। সুতরাং ইহা, সর্ব্ববাদীসম্মত যে, কাছাড়ের নির্ব্বাণপ্রাপ্ত রাজবংশ ও ত্রিপুররাজবংশ এক পিতার সন্তান। কিন্তু ঐতিহাসিকতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যৎকালে কাছাড়রাজ-

বংশের এক সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রস্তুত করেন; সেই সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের কল্পনা অশ্বের বল্গা উন্মোচন করিয়া পূর্ণচক্রের ঘোড়দৌড় করিয়াছেন। রাজমালা লেখক যযাতি পুত্র দ্রুহ্য হইতে ত্রিপুরারবংশাবলী অঙ্কিত করিয়াছেন; আর কাছাড়ের ব্রাহ্মণগণ তৃতীয় পাণ্ডব ভীম ও হিড়িম্বা রাক্ষসীকে কাছাড় রাজবংশের আদি পিতা মাতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বারণাবতের নিকটবর্ত্তী * হিড়িম্ব রাক্ষসের বসতি স্থানকে বঙ্গদেশে পূর্ব্বপ্রান্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক কাছাড়কে হিড়িম্ব রাজ্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এবম্প্রকার বর্ণনা সম্বন্ধে নিতান্তই কবিকল্পনা বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারি।

আধুনিক নাগাপর্ব্বত জেলারমধ্যে কাছাড় রাজবংশের দুইটী প্রাচীন রাজধানী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা—দিমাপুর ও মাইবাং। দিমাপুর নগরীর প্রাচীন অট্টালিকা সমূহের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। পার্ব্বত্য মানবদিগের উৎপীড়নে ইহাঁরা সেই সকল প্রাচীন রাজধানী

---

*বর্ত্তমান বরাণসীর পশ্চিমদিকে বারণাবত নগরী অবস্থিত ছিল হিড়িম্বারবন আধুনিক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত।

পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কাছাড়পতিগণের মাইবাং অবস্থান কালে একটী নিতান্ত ঘৃণাজনক কার্য্য দ্বারা, কাছাড় ও জয়ন্তীয়া রাজবংশ মধ্যে একটী লোমহর্ষণ কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। জয়ন্তীয়া পতির ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর কলুষিত প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করেন। সেই পাপিষ্ঠ ও পাপীয়সীর আশ্রয়দাতা বলিয়া জয়ন্তীয়া-রাজ কাছাড়পতির প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়ন্তীয়া পতির ভ্রাতা স্বীয় প্রণয়িনী ও সহচর বর্গের সহিত দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রবাদ অনুসারে জয়ন্তীয়াপতির ভ্রাতা ও তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রী অঙ্গমীনাগা সরদারগণের আদি পিতা মাতা। তাঁহাদের অনুচরবর্গ ও অন্যান্য নাগাজাতীর সংযোগে পরাক্রমশালী অঙ্গমী নাগাদিগের উৎপত্তি। প্রবল সংগ্রামে কাছাড়পতি পরাজিত হন; জয়ন্তীয়া রাজ দ্বারা মাইবাং নগরী বিনষ্ট হয়। কাছাড়পতি বর্ত্তমান কাছাড় প্রদেশে উপনীত হইয়া কশপুরে রাজপাট স্থাপন করেন।

যদিচ আমরা কাছাড় রাজবংশের বংশাবলীর সত্যতা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করিতে পারিনা, তথাপি এস্থানে সেই বংশাবলী প্রকাশ করিলাম। কারণ বংশাবলী প্রণেতাগণ কয়েকজন বিখ্যাত নরপতির নাম বংশাবলী মধ্যে সন্নিবিষ্ট

করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সকল নাম বিশুদ্ধ ভাবে ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই।

বংশাবলী

১। ভীম (পাণ্ডুপুত্র)
২। ঘটোৎকচ।
৩। মেঘবর্ণ।
৪। মেঘবল।
৫। তাম্রধ্বজ।

এই নরপতি ১৩৮৮ সংবতে জীবিত ছিলেন, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

৬। কেতুধ্বজ।
৭। বিশ্বকীর্ত্তিধ্বজ।
৮। বিশ্রনানধ্বজ।
৯। তালধ্বজ।
১০। বেতালধ্বজ।
১১। বিশ্বাসনধ্বজ।
১২। উন্মত্তধ্বজ।
১৩। কুলিশধ্বজ।
১৪। রুদ্রধ্বজ।
১৫। কৌণ্ডিল্যধ্বজ।
১৬। শক্রজিতধ্বজ।
১৭। পরিরুদ্রধ্বজ।
১৮। ভাস্করধ্বজ।
১৯। প্রভাকর ধ্বজ।
২০। বিষ্ণুধ্বজ।
২১। হিরণ্যধ্বজ।
২২। ভদ্রসেন ধ্বজ।

* Fisher's History of the Cachar Raj family

২৩। শুক্লধ্বজ।	৩২। গুণধ্বজ।
২৪। ঈশান ধ্বজ।	৩৩। শূরসেন ধ্বজ
২৫। গুণকীর্ত্তিধ্বজ।	৩৪। রিপুদ্রবধ্বজ
২৬। পিঙ্গলধ্বজ।	৩৫। বলভদ্রধ্বজ।
২৭। উপেন্দ্রধ্বজ।	৩৬। চন্দ্রশেখর ধ্বজ।
২৮। নলধ্বজ †	৩৭। মুকুটধ্বজ।
২৯। পদ্মধ্বজ।	৩৮। স্কন্দধ্বজ।
৩০। পিকধ্বজ।	৩৯। দ্বিজেশধ্বজ।
৩১। বৃষধ্বজ।	৪০। গণেন্দ্রধ্বজ।

† নলধ্বজ নৃপতি মণিপুর জয় করিয়াছিলেন। মণিপুর পতি ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে মণিপুরের রাজদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন।

১। মহারাজ নলধ্বজ স্বীয় বিজয়বৃত্তান্ত চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বংশদ্বারা যে বিজয় স্তম্ভ মণিপুর নগরে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে।

২। মণিপুরিদিগকে ব্রহ্মাদিগের ন্যায় অর্দ্ধমস্তক মুণ্ডন ও কেশবন্ধন করিতে হইবে।

৩। দ্বাদশ হস্তের উচ্চ কোন গৃহ মণিপুরীগণ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না।

৪১। মহেশ্বরধ্বজ।
৪২। ভানুধ্বজ।
৪৩। মহাকালধ্বজ।
৪৪। কমলধ্বজ।
৪৫। জ্ঞানধীরধ্বজ
৪৬ ভূপেন্দ্রধ্বজ
৪৭। ভানুধ্বজ।
৪৮। ইন্দুধ্বজ।
৪৯। অর্কধ্বজ।
৫০। প্রতাপনারায়ণ।
৫১। রুদ্রনারায়ণ।
৫২। বলবন্তনারায়ণ।
৫৩। নির্ভয় নারায়ণ।

ইনি একজন বিখ্যাত নরপতি। প্রবাদ অনুসারে তিনি কুলদেবতা রণচণ্ডী হইতে এক তরবারি লাভ করিয়াছিলেন।*

৫৪। উদয় নারায়ণ।
৫৫। বীরনারায়ণ।
৫৬। মদন নারায়ণ।
৫৭। চিত্রধ্বজ।
৫৮। বিন্দুধ্বজ।
৫৯ কেতুধ্বজ।
৬০। শঙ্খধ্বজ।
৬১। ললিতধ্বজ।
৬২। সিংহধ্বজ।
৬৩। হেমধ্বজ।
৬৪। শিখণ্ডীচন্দ্র।
৬৫। কুমুদচন্দ্র।
৬৬। প্রচুতরচন্দ্র।
৬৭। উদিতচন্দ্র।
৬৮। প্রভাকরচন্দ্র।
৬৯। কর্পূরচন্দ্র

* একদা স্বপ্নে নির্ভয়নারায়ণ শুনিলেন, যেন জগজ্জননী

৭০। গিরীচন্দ্র।
৭১। ধীরচন্দ্র।
৭২। শূরজীতচন্দ্র।
৭৩। শক্রজীতচন্দ্র
৭৪। বালপ্রতাপ।
৭৫। প্রকাশচন্দ্র
৭৬। বিক্রমচন্দ্র।
৭৭। আদীত্যচন্দ্র।

বলিলেন, "বৎস! কল্য নদীতে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" পর দিবস রাজা একাকী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দর্শন করিলেন; একটী বিষধর জলকেলী করিতেছে। নির্ভয় নারায়ণ সর্পকে রণচণ্ডী জ্ঞানে তাঁহার লাঙ্গুলে হস্তার্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একখানি তরবারী রাজার হস্তে উঠিল। নরপতি সেই তরবারী লইয়া গৃহে গমন করিলেন। সেই দিবস রজনীযোগে দেবী পুনর্ব্বার নির্ভয় নারায়ণকে বলিলেন "বৎস! সর্পের লাঙ্গুলে ধরিয়া অন্যায় করিয়াছ, যাহা হউক এই তরবারী যত্নের সহিত রক্ষা করিও, ইহার কৃপায় তোমার বংশধরগণ নির্ব্বিঘ্নে কাছাড় রাজ্যে উপভোগ করিবে।" কাছারপতিগণ ভক্তির সহিত সর্ব্বদা এই তরবারিকে "রণচণ্ডী" জ্ঞানে পূজা করিতেন। প্রবাদ আছে, যে দিবস গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, সেই দিবস এইতরবারী রাজ প্রাসাদ হইতে অপহৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় রণচণ্ডী নামে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার সহিত কাছাড়ের ঐতিহাসিক তত্ত্বের কোন সংস্রব নাই। গ্রন্থকার অকৃতজ্ঞ ভাবে স্কটের "আন অফ গার্ষ্টেন" বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন।

৭৮। বীরচন্দ্র।

৭৯। পুণ্ডরীকাক্ষ।

৮০। ভূপালধ্বজ।

৮১। প্রবলচন্দ্র।

৮২। পুরন্দরচন্দ্র।

৮৩। ত্রিলোচনচন্দ্র

৮৪। দীপচন্দ্র।

৮৫। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র

৮৬। নীলচন্দ্র।

৮৭। মকরধ্বজ।

৮৮। নরকুলচন্দ্র।

৮৯। নবচন্দ্র।

৯০। কিশোরচন্দ্র।

৯১। মনচন্দ্র।

৯২। বীরদর্পচন্দ্র।

৯৩। নির্ভয়চন্দ্র।

৯৪। মেঘবলচন্দ্র।

৯৫। বাহুবলচন্দ্র।

৯৬। সুরেন্দ্রচন্দ্রধ্বজ।

৯৭। শিখিধ্বজ।

৯৮। উদয়াদিত্যচন্দ্র।

৯৯। ময়ূরধ্বজচন্দ্র।

১০০। গরুড়ধ্বজ।

১০১। মকরধ্বজ। *

১০২। তাম্রধ্বজচন্দ্র। †

* মণিপুর পতি ব্রহ্মসৈন্য দ্বারা রাজচ্যুত হইয়া কাছাড়-পতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজ মকরধ্বজ স্বীয় সৈন্য দ্বারা ব্রহ্মসৈন্য দূরীকৃত করিয়া মণিপুর পতিকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করেন।

† মহারাজ তাম্রধ্বজ জয়ন্তীয়াপতির সহিত প্রীতিসম্বন্ধে

১০৩। শূরদর্প নারায়ণ।
ইনি আসামপতির সাহায্যে জয়ন্তীয়া বিনষ্ট করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যুদ্বারা তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ বিফল হইয়াছিল।

১০৪। ধর্ম্মধ্বজচন্দ্র।

১০৫। কীর্ত্তিচন্দ্র।

১০৬। রামচন্দ্র।
ইহার শাসনকালে ত্রিপুরাপতি কাছাড় জয় করিয়াছিলেন।

১০৭। হরিচন্দ্র। } ভ্রাতা
১০৮। লক্ষ্মীচন্দ্র }

১০৯। কৃষ্ণচন্দ্র।

১১০। গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ।

আবদ্ধ ছিলেন, জয়ন্তীয়ারাজ একখানি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ নৌকা প্রস্তুত পূর্ব্বক তদারোহণে কশপুরে গমন করেন। তিনি মহারাজ তাম্রধ্বজকে বলিলেন, বন্ধো! আমি এই নৌকা আপনার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছি, আসুন আমরা উভয়ে একবার ইহাতে আরোহণ করি। সরলচিত্ত তাম্রধ্বজ সেই নৌকায় আরোহণ করিলে কপট মিত্র জয়ন্তীয়া পতি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া বড়বক্রের প্রবল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। কাছাড় পতির সৈন্যগণ আশ্চর্য্যঘটনা দর্শনে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইল। তাম্রধ্বজ হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। জয়ন্তীয়াপতি স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কাছাড়পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তাম্রধ্বজের পত্নী রাণী চন্দ্রপ্রভাবতী জয়ন্তীয়া রাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও সমস্ত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক আসামের অধিপতি

রাজা হরিচন্দ্র নারায়ণের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র, কনিষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি ৪০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইরানবাসী জনৈক মোগল কতগুলি দুষ্ট লোক সংগ্রহ করত কাছাড় রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এব্যক্তি কশপুর নগর অধিকার করিলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোয়াবাড়ী নামক স্থানে পলায়ন করেন। বিজয়োন্মত্ত মোগল কাণ্ডজ্ঞান হীন হইয়া বন্দরপুরস্থিত কোম্পানীর গারদ আক্রমণ করিলেন। শ্রীহট্টের ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কল্যাণ সিংহ সুবেদারকে একদল সৈন্যের সহিত সেই মোগলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সুবাদার কল্যাণ সিংহ তাহাকে পরাজিত ও বন্দীকৃত করিয়াছিলেন।

স্বর্গদেবের * নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। স্বর্গদেব দুইজন সেনাপতিকে দুইদল সৈন্যের সহিত জয়ন্তীয়া নগরে প্রেরণ করেন। তাঁহারা জয়ন্তীয়া পতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কাছাড়পতিকে মুক্ত করিয়া উভয়কে লইয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করিলেন। স্বর্গদেব নানা প্রকার খেলাত প্রদান পূর্ব্বক কাছাড়পতিকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করেন এবং জয়ন্তীয়া পতির প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন।

---

* আহম বংশীয় আসামপতিগণ ইন্দ্রবংশজ বলিয়া সকলেই "স্বর্গদেব" উপাধি ধারণ করিতেন

কিছুকাল অন্তে সুবাদার কল্যাণ সিংহ কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতগুলি পদচ্যুত ও পেন্সিয়ান প্রাপ্ত সিপাই সংগ্রহ করিয়া হাইলাকান্দী নামক স্থানে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই সংবাদ শ্রীহট্টের মেজেষ্ট্রটকে জানাইলেন। মেজেষ্ট্রট সাহেব তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কোম্পানীর সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সুবাদার কল্যাণ সিংহ পলায়ন করিলেন। কল্যাণ সিংহ জয়ন্তীয়া রাজ্যে উপনীত হইলে তথাকার অধিপতি তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রজনীযোগে কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বিবিধ স্থান ভ্রমণ করত কল্যাণ সিংহ অবশেষে কুমিল্লা নগরে উপস্থিত হয়, তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুরপতি মধুচন্দ্র স্বীয় অনুজ চৌরজিত ও মারজিত দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইয়া কাছাড়পতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চশত সৈন্য দ্বারা মধুচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সংগ্রামক্ষেত্রে মধুচন্দ্র হত হইলেন। কিয়ৎকালান্তে মারজিত কাছাড় পতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার একটী মনোহর অশ্ব ছিল। কাছাড় পতির ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র তাহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন মারজিত অশ্ব বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না, গোবিন্দচন্দ্র তাহা বলক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন করেন, তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না, এজন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ, মণিপুরের রাজকুমার গম্ভীর সিংহকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন ১৮১৮খৃষ্টাব্দে মণিপুরপতি রাজা মারজিত কাছাড় আক্রমণ করেন। সেনাপতি গম্ভীর সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভ্রাতৃপক্ষ অবলম্বন করেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র প্রাণভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই কিন্তু ব্রহ্মযুদ্ধের সূচনা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণাপত্রে লিখিত আছে যে, "কাছাড় নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটি ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত, ব্রহ্ম-সৈন্য এই রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছেন।" কলিকাতার রাজপ্রাসাদে বসিয়া যে দিবস লর্ড আমার্হাষ্ট উল্লিখিত ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তৎপর দিবস অর্থাৎ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ্চ গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট স্কট সাহেব বদরপুরে

বসিয়া কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং ও স্বীয় উত্তরাধিকারিগণের জন্য কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বহিঃশত্রু হইতে চিরকাল কাছাড়রাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। উক্ত সন্ধিপত্রের চতুর্থ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে কাছাড়পতি কোম্পানিকে বার্ষিক দশসহস্র টাকা কর প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে রাজা গোবিন্দচন্দ্র নির্ব্বিবাদে কাছাড় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি মণিপুরী (সম্ভবতঃ মারজিতের অনুচর) একদা রজনীযোগে রাজপ্রাসাদে তস্করের ন্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের উপাংশুহত্যা সম্পাদান করে। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, এজন্য গবর্ণমেণ্ট কাছাড়রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু তৎকালে বর্ত্তমান কাছাড় জেলার তৃতীয়াংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উত্তর কাছাড় সেই সময় তুলারাম সেনাপতির অধীন ছিল। তুলারামের পিতা কাঁচাদিন কাছাড়পতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের জনৈক সেবক (খানসামা) ছিলেন। কাঁচাদিন পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন ভারপ্রাপ্ত হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কৌশলক্রমে বিদ্রোহী শাসন কর্ত্তাকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার

শিরশ্ছেদ করিলেন। তুলারাম স্বীয় পিতার হত্যাকাণ্ড দর্শনে গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের দারুণ শত্রু হইয়া দাড়াইলেন এবং পর্ব্বতবাসী নাগা কুকিদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ বৎসর ব্যাপী কলহের পর ১৭৫১ শকাব্দে (১৮২৯ খৃঃ অঃ) রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ তুলারামকে ২২২৪ বর্গমাইল ভূমির জায়গীরদার বলিয়া স্বীকার করেন। তুলারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় নকুলরাম ও ব্রজনাথ প্রায় দশবৎসর পৈত্রিক রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ শকাব্দে (১৮৫৩ খৃঃ অঃ) নকুলরাম দিশোমা নাগাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়া নিহত হন। এই সামান্য অপরাধে গবর্ণমেণ্ট তুলারামের বংশধরদিগকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি প্রদান পূর্ব্বক তুলারামের রাজ্যটী গ্রাস করিয়াছিলেন। অধুনা কাছাড় জেলার পরিমাণ ৪২০০ বর্গমাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মণিপুরী বা মিতাই রাজবংশাবলী।

১। পাখংবা।	৩। তনথিঙ্গং।
২। থৈ।	৪। কোয়েনিং গোয়েলবা।

৫। পুনসিবা।

৬। কন্নুথংবা।

৭। নন্নুথম্বা।

৮। নন্নুপম্বা।

৯। সম্নুয়েবং।

১০। কোলথৌবা।

১১। নন্নুথিং অং।

১২। থোন্তেকাছা।

১৩। কোরলেহা।

১৪। জারবা।

১৫। আয়বা।

১৬। নিংলৌচেং।

১৭। ইপল লালথৌবা

১৮। জংলাওকৈপাম্বা।

১৯। এরংবা।

২০। নৈলেয়ম্বা।

২১। লোতিয়াংবা।

২২। জোনয়ইরেলবা।

২৩। ইউরেলথবা।

২৪। থাউলথবা।

২৫। চিতংলথবা।

২৬। থিংবৈছেনথবা।

২৭। পুরলথবা।

২৮। থোম্বা।

২৯। মৈরম্বা।

৩০। থংবিললথবা।

৩১। খোংয়ম্বা।

৩২। থেলছবা।

৩৩। লেইজলবা।

৩৪। পুনসেবা।

৩৫। নিংথৌখোম্বা।

৩৬। কেয়ম্বা।

৩৭। কোইরেম্বা।

৩৮। লমচিংমনবা।

৩৯। নোনাগিয়েল থোম্বা।

৪০। কপোম্বা।

৪১। তনংচোম্বা।

৪২। চলুম্বা।

৪৩। মৈয়াংঙম্বা।

৪৪। খকেম্বা।

৪৫। খুলচোম্বা।

৪৬। পথোম্বা।

৪৭। চেরাইরংবা।

৪৮। পামহেইবা
(করিম নওাজ)

৪৯। খখিলালথৌবা।
(ওগতসা)

৫০। নিংথৌথম্বা (ভরতসা)

৫১। মরম্বা (গৌরীশ্যাম)

৫২। চিং থংখম্বা।
(জয়সিংহ)

৫৩। মধুচন্দ্র।

৫৪। চৌরাজিৎ

৫৫। মারজিৎ

৫৬। গম্ভীর সিং
*

৫৭। নরসিংহ (সেনাপতি)

৫৮। দেবেন্দ্রসিংহ।
*

৫৯। চন্দ্রকীর্ত্তি।
(গম্ভীরের পুত্র)

৬০। সুরচন্দ্র।

৬১। কুলচন্দ্র।
*

৬২। চূড়াচাঁদ।
(নরসিংহের বংশধর।)

মণিপুরের ইতিহাস।

ত্রিপুরারাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বকোণে এবং কাছাড় জেলার পূর্ব্বদিগে মণিপুর রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের প্রকৃত

নাম মিতাই-লেইপাক। মিতাই অর্থ মিশ্রজাতি; লেইপাক অর্থ মাটি, ভূমি। ইহার যৌগিক অর্থ মিশ্রজাতির বাস ভূমি। শ্রীহট্ট নিবাসী অধিকারী ব্রাহ্মণগণ ইহাকে "মণিপুর" আখ্যা দান করিয়াছেন। মহাভারতের ভৌগোলিক তত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলে তাঁহারা কখনই এই কুকার্য্য করিতেন না, এজন্যই আমরা ইহাকে জাল-মণিপুর বলিয়াথাকি। *

মিতাইলেইপাক পর্ব্বত মধ্যস্থিত একটী সুন্দর ভূন। পুরাকালে সেই ভূন "লগ্‌তাক্" হ্রদ মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। সেই হ্রদের মধ্য দিয়া "ইম্ফালতুরেল" ও অন্যান্য নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই সকল নদী প্রবাহিত কর্দ্দম রাশিদ্বারা

* আমাদিগের বিবেচনায় মিতাইলেইপাকের সহিত মহাভারতের কোন সংশ্রব নাই। মহাভারতে বর্ণিত মণিপুর প্রাচীন কলিঙ্গের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত নগরী। অর্জ্জুনের গন্তব্যপথাবলম্বনে আমরা এইসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। বিষ্ণু পুরাণের অনুবাদক পণ্ডিত এইচ্, এইচ্, উইলসন সাহেবও এইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন। (Wilson's Vishnu Puran. Vol. IV. page 160.) ডাক্তর জন উইলসন সাহেব ও মণিপুর কলিঙ্গের অন্তর্গত লিখিয়াছেন। (John Willson's Indian Cast Vol. I. p. 249.) কনিংহাম সাহেবের মতে মহাকোশলের (বা দক্ষিণকোসলের) প্রাচীন রাজধানী মণিপুর নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতোক্ত মণিপুর সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরী, সুতরাং আমরা কনিংহামের মতানুমোদন করিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গঠিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে নদী প্রবাহিত কর্দ্দমদ্বারা সেই সকল ক্ষুদ্র দ্বীপ সংযুক্ত হইয়া চারিটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দ্বীপ গঠিত হয় যথা, মৈয়াং খোমান, আঙম, এবং লোয়াং। কামরূপের প্রবল উন্নতির সময় নির্ব্বাসন দণ্ডের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে এই সকল দ্বীপে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ক্রমে ঐ সকল নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ নাগা কুকি প্রভৃতি জাতীয় রমণীগণের সংযোগে এক ভিন্ন জাতীয় মানবের সৃষ্টি করিল। * ইহারাই মিতাই (মণিপুরী বা মেখলী) দিগের পিতৃপুরুষ। † ক্রমে চারিটি দ্বীপ সংযুক্ত

† পেম্বার্টন সাহেব বলেন যে, মিতাইগণ তাতার জাতীয়। মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিকেল এজেণ্ট মেকৃকলক সাহেব ও ডাক্তার ব্রাউন বলেন যে, মণিপুর দূনের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত বাসী অনার্য্য জাতি হইতে মণিপুরিগণের উৎপত্তি। বর্ত্তমান রাজবংশটী যে নাগা জাতি হইতে উদ্ভূত এইরূপ অনুমান যুক্তি সঙ্গত বটে, কারণ রাজ্যাভিষেক কালে অদ্যাপি রাজা ও রাণী উভয়েই নাগা বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। McCulloch's Munnipore. p. 4, and Brown' Munnipore. p. 27.)

* অদ্যাপি বাঙ্গালি হিন্দুগণ মণিপুরে মিশ্রজাতির সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ মিতাই রমণীর পাণি গ্রহণ করিলে তাহার গর্ভজাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন কিন্তু সেই সন্তানের মাতার জাতি পরিবর্ত্তন হয় না। উক্ত রমণী বিধবা হইলে কিম্বা ব্রাহ্মণ স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা

হইয়া "মিতাই লেইপাক" হ্রদ গঠিত হইয়াছে। এই হ্রদটি ক্রমে উত্তর হইতে দক্ষিণদিগে ঢালু হইয়াগিয়াছে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে অদ্যাপি লগ্‌তাক্ সরোবরের কিয়দংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মণিপুর হ্রদ সমুদ্র বক্ষ হইতে প্রায় ১৬৮৭ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার আকৃতি বাদামী। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩৬ মাইল। পূর্ব্ব পশ্চিমে পরিসর ২০ মাইল। পরিমাণ ফল ৬৫০ বর্গমাইল। ইহাই প্রকৃত মিতাই লেইপাক বা মণিপুর রাজ্য। ব্রহ্মাযুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মণিপুরপতি যে সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছিলেন ক্রমে তদ্দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছেন। এজন্যই অধুনা মণিপুর রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রায় ৭০০০ বর্গমাইল হইয়াছে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৭৫ হাজার। রাজস্ব প্রায় বিংশতি সহস্র মুদ্রা। এই রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী, সৈন্য ও সাধারণ ভৃত্যগণ সকলেই বেতনের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মণিপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে ত্রিপুরার ন্যায় বন্যহস্তী

হইলে পুনর্ব্বার যে জাতীয় স্বামী গ্রহণ করিবে সেই স্বামীর ঔরস জাত সন্তানগণ সেই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক রমণীর গর্ভেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিবিধ জাতি উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার মৃগ, বরাহ এবং ব্যাঘ্র এই অরণ্যে দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে অশ্ব, মহিষ ও গবয়ই প্রধান। মণিপুরী ঘোড়া (বা পণি) সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু অশ্ববংশের ক্রমেই অবনতি হইতেছে। মণিপুরে শৃগাল নাই এবং পক্ষী সমূহের মধ্যে অস্মদ্দেশীয় কবি-কুল-প্রিয় বসন্তের সহচর কোকিলের নিতান্ত অভাব।

মিতাই (মণিপুরিগণ) মধ্যমাকার, সবলশরীর, সমর প্রিয় কিন্তু অপরিণামদর্শী, অহঙ্কারী এবং পরজাতি বিদ্বেষ্টা। শেষোক্ত গুণটি তাহারা তাহাদের ইষ্টদেবতা গোস্বামী মহাশয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।* বাহ্যাকৃতিতে ইহাদিগকে শান্ত প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়; প্রকৃত পক্ষে ইহারা সেরূপ নহে। মিতাইগণ বাঙ্গালিদিগের ন্যায় গো মহিষাদি দ্বারা হাল চাস করিয়া থাকে। মিতাই ভূমিতে ধান্য, কলাই, মুগ, খেসারি, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিথং ও নিয়েংল নামক স্থানে লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খারকোল এবং নৈতাং নামক গ্রামে রেশমের কারখানা আছে। মিতাইগণ প্রায়ই স্ব স্ব গৃহ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। রমণীগণ নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে সুপটু। কৃষি

* ইহারা মূর্খ অধিকারী ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণ করিবে, কিন্তু মহাপণ্ডিত শাক্ত ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট জলপান করিবে না।

কার্য্যের অধিকাংশ স্ত্রীলোকদ্বারা সম্পাদিত হয়। পুরুষেরা অতি অল্প কার্য্য করিয়া থাকে, অধিকাংশ সময় ইহারা নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকে অতিবাহিত করে। মিতাইগণ নিতান্ত অশ্বপ্রিয়। ইহারা কখন কখন অর্থের অভাব হইলে স্ত্রী বিক্রয় করিয়া অশ্ব ক্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগের দাম্পত্য বন্ধন নিতান্ত শিথিল। প্রয়োজন অনুসারে ইহারা স্ত্রী বন্ধক, বিক্রয় এবং দান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রায় নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে কোন রমণী কানীন সন্তান প্রসব করিলে সেই সন্তানকে "ধর্ম্মপুত্র" বলে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করাহইয়াছে যে, আধুনিক ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে প্রাচীন কালে শ্যানদিগের এক বিস্তৃত রাজ্য ছিল। তাহাদের রাজ্যের নাম পোয়াং। তাহার রাজধানী মাগুয়াং নগরী। ৬৯৯ শকাব্দে (৭৭৭ খৃষ্টাব্দে) পোয়াং পতির ভ্রাতা শ্যামলুং কোন কার্য্য বশতঃ দূত স্বরূপ ত্রিপুররাজ সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাজদূত শ্যামলুং মিতাইভূমির মধ্যদিয়া গমন করেন। তৎকালে উলঙ্গ মিতাইগণ অরণ্যজাত দ্রব্যাদি উপঢৌকন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। শ্যামলুং মিতাইদিগের অবস্থা দর্শনে বলিলেন, পোয়াং রাজ তোমাদের নিকট হইতে কোন রূপ করগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, এক্ষণ হইতে তোমরা

বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই তোমাদের জন্য রাজকর ধার্য্য হইল। একাদশ শতাব্দীপূর্ব্বে পোয়াং রাজের ভ্রাতা শ্যামলুং যাহাদিগকে "বনমানুষ" বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, অস্মদ্দেশীয় অর্ব্বাচীন গোস্বামিগণ তাহাদিগকেই চন্দ্রবংশীয় বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এস্থানে আমরা মিতাই রাজবংশের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি না। মিতাই রাজ বংশের বংশাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত বংশাবলীর শীর্ষদেশে অর্জ্জুন কিম্বা বভ্রুবাহনের নাম দৃষ্ট হইবে না। উক্ত বংশাবলী মতে পাখংবা মণিপুর রাজ বংশের আদি পিতা। মিতাইগণ বলে "গুরুসিদবা" দেব মানবের অধিপতি তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পত্নীর নাম "লাইস্রেনসিদবি" তাঁহাদের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ "সেনামহি," কনিষ্ঠ "পাখংবা"। পাখংবা নাগকুলের ঈশ্বর, কনিষ্ঠ পুত্র পিতার পরম স্নেহভাজন ছিলেন। এজন্য গুরুসিদবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠকে মিতাইভূমির আধিপত্য প্রদান করেন। মিতাইদিগের জাতীয় ইতিহাস, ভাষা এবং সামাজিক প্রাচীন আচার ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে ইহাদিগকে নাগোপাসক অনার্য্য বংশোদ্ভূত কোন জাতি বলিয়া সুন্দর রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। শকাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস অনুসন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। ১৬২৪ শকাব্দে ৪৭ সংখ্যক নরপতি চেরাইরংবা

সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার শাসন কালে সামজুক পতি মিতাই রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাভূত হন। মিতাইগণ সেই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "সামজুকঙবা" (সামজুক বিজয়) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। ১৬৩৬ শকাব্দে চেরাই-রংবার পুত্র পামহেইবা সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি সাধারণতঃ "করিম নওয়াজ" * বা "করিকরিমনওয়াজ" নামে পরিচিত। পামহেইবা ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের সাময়িক। ত্রিপুরেশ্বর যৎকালে মুসলমানদিগের সহিত বিষম সমরে লিপ্ত ছিলেন; সেই সময় পামহেইবা ত্রিপুরার সীমান্তরক্ষক একদল সৈন্য জয় করিয়া "তখলেংঙবা" ("ত্রিপুরা বিজয়ী") উপাধি ধারণ করেন। মিতাইগণ "তখ-লেংঙবা" নামক এক ক্ষুদ্রগ্রন্থে উক্ত বৃত্তান্ত লিখিয়ারাখিয়াছেন।

পামহেইবার শাসন কালে শ্রীহট্ট নিবাসী অধিকারিগণ মিতাইভূমিতে গমন পূর্ব্বক সেই দেশকে মণিপুর, এবং অধিপতিকে বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া প্রচার করেন। তদবধি মিতাইগণ "মণিপুরী" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক হিন্দু শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অধিকারিদিগের কৃপায় ইহারা চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিষ্ণুভাগবত (শ্রীমদ্ভাগবত), চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতা-

* কোন কোন বঙ্গীয় লেখক ইহাকে পারসী "গরিব নওয়াজ" করিয়া ফেলিয়াছেন।

মৃত ইহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। গোস্বামী মহাশয়গণ মিতাই-দিগকে বাঙ্গালিসমাজে স্থাপন করিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। কিন্তু নেড়া নেড়ীর ভাব ইহাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পামহেইবার উত্তর পুরুষ চিংতুং খোম্বার শাসনকালে নবদ্বীপের গোস্বামিগণ মিতাই ভূমিতে গমন পুর্ব্বক রাজবংশীয়দিগকে মন্ত্র শিষ্য করিয়াছিলেন। গোস্বামিগণ তাঁহাকে ভাগ্যচন্দ্র আখ্যা প্রদান করেন। এই সময় হইতে তাঁহাদিগের একটি জাতীয় নাম, আর একটি হিন্দু নাম দৃষ্ট হয়। ভাগ্যচন্দ্রের সময়ে মণিপুরে "রাসক্রীয়া" সৃষ্ট হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মণিপুরিগণ নিতান্ত অপরি-নামদর্শী। এজন্য বারংবার স্বত প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মরাজের সহিত আহাবেলিপ্ত হইয়াছে; চরমে তাহার ফল এই দাঁড়াইল যে, ১৭৪১ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ মণিপুর রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মণিপুরপতি মারজিত পুর্ব্বেই কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ কে রাজ্যচ্যুত করিয়া কাছাড় অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণ স্বরাজ্য চ্যুত হইয়া কাছাড়ে গমন করত স্বীয় ভ্রাতা চৌরজীত, গম্ভীর সিংহ এবং বিশ্বনাথ সিংহের সহিত ভাগাভাগিতে কাছাড় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ শীঘ্রই তাঁহাদের সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ব্রহ্মসৈন্য আসিয়া কাছাড় জয় করিল। গম্ভীর সিংহ

প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কাছাড়পতি গোবিন্দচন্দ্রের ন্যায় বৃটীস্ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৭৪৬ শকাব্দে গবর্ণমেণ্ট প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। গম্ভীর সিংহ পঞ্চশত সহচর সহ শ্রীহট্টে উপনীত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সুশিক্ষিত করিয়া "গম্ভীরসিংহসংসেবী"* নামক সৈন্যদল সৃষ্টি করেন। ক্রমে এইদলের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চদশ শত হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাপ্তান গ্রাণ্ট এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তৎপর কাপ্তান পেম্বার্টন তাঁহার সহচর নিযুক্ত হন। গম্ভীর সিংহ ছায়ার ন্যায় সেই সৈন্যদল লইয়া কাপ্তান গ্রাণ্টে সঙ্গে প্রায় দেড় বৎসরকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কাপ্তান গ্রাণ্ট গম্ভীরসিংহের অসাধারণ সাহস, বল, যুদ্ধ-কৌশল এবং অলৌকিক বীরত্ব প্রভৃতি গুণরাশি দর্শনে বারংবার তাঁহার অনুকূলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। সেই ভীষণ ব্রহ্মসমরের প্রায়-অবসানকালে কাপ্তানগ্রাণ্ট ব্রহ্মরাজ্যের উত্তরদিকস্থ কাইবো পরগণায় উপনীত হইয়া বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক (১৮২৬ খৃঃ অঃ ২৬ জানুয়ারি) টামু হইতে কমিশনর টকার সাহেব নিকট যে রিপোর্ট করেন, তাহার উপসংহারে

* মণিপুরী ও কাছাড়ী জাতি দ্বারা এই সেনাদল গঠিত হয়। মনিপুরবাসী কাছাড়িগণ "কালাছা" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে।

গম্ভীর সিংহের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তদ্‌পাঠে তাঁহাকে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া অনুমিত হয়। * ইহার অল্পকাল পরে (১৮২৬ খৃঃ অঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি) গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রহ্মরাজের যান্দবোনগরে সন্ধি হইয়াছিল। সেই সন্ধি পত্রের দ্বিতীয় প্রকরণের শেষাংশে ইহা লিখিত হইয়াছে যে, "যদি গম্ভীর সিংহ মণিপুরে প্রত্যাবর্ত্তণ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে মণিপুরপতি বলিয়া স্বীকার করিবেন।" †

উক্ত সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে গবর্ণমেণ্ট গম্ভীর সিংহকে মণিপুর সিংহাসনে স্থাপন করেন। গম্ভীর সিংহের সৈন্যদল দুইজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে রক্ষিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই সকল সৈন্যের অস্ত্রাদি যোগাইতেন। ইংরেজ সেনাপতিগণের যত্নে ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মণিপুরে প্রায় পঞ্চ সহস্র সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্ব সীমান্ত বাসী অসভ্যদিগকে দমন করা এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্রহ্মরাজ্যে উপস্থিত রাখিবার জন্য এই সকল সৈন্য প্রস্তুত করা হয়। এই সৈন্যদল "মণিপুর লেবী' নামে ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছে। এই সৈন্যদলই মণিপুরের উন্নতি এবং অবনতির মূল কারণ। এই সৈন্যদলের সাহায্যে মিতাইগণ সপ্ত সহস্র বর্গমাইল ব্যাপী রাজ্যসীমা বিস্তার করিতে

* Wilson's Burmese War. p. 207.

† A collection of Treaties. &c &c. Vol. I. p. 213.

সক্ষম হইয়াছিল। এই সৈন্যদলের সাহায্যে দুর্দ্দান্ত টীকেন্দ্রজিতের নির্দ্দয় সহচর থঙ্গাল জেনারল, কুইণ্টন, গ্রিমউড প্রভৃতি ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে বলিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৭৫২ শকাব্দে মণিপুরিগণ কাছাড়পতি গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণের উপাংশু হত্যা সম্পাদন করে।

ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে মণিপুরের পুর্ব্বদিগস্থ কাইবো পরগণা মণিপুরের রাজদণ্ডের অধীন হয়। ব্রহ্মরাজ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টকে বারংবার অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া উক্ত পরগণা ব্রহ্মরাজকে প্রদান করেন। এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মণিপুরপতিকে বার্ষিক ছয়সহস্র টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। (১৮৩৪ খৃঃ অঃ ২৫ জানুয়ারী।)

১৭৫৬ শকাব্দে গম্ভীরসিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি তৎকালে একবৎসরের শিশু। সেনাপতি নরসিংহ সেই শিশুকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অভিভাবক স্বরূপ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৭ শকাব্দে গবর্ণমেণ্ট "মণিপুর লেবী" নামক সৈন্যদল সম্পূর্ণ ভাবে মণিপুরপতির হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক মণিপুরে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ১৭৬৬ শকাব্দে শিশু নরপতি চন্দ্রকীর্ত্তির জননী স্বীয় উপপতি নবীন সিংহের কুম-

প্রণায় নরসিংহকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইলেন।* একদা সন্ধ্যাকালে রাজপ্রতিনিধি নরসিংহ দেবতা প্রণাম করিতেছিলেন, সেই সময় নবীন সিংহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন, নরসিংহ বাহুমূলে তরবারীর আঘাত ধারণ করিয়া মস্তক রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহচরগণ দ্বারা নবীন সিংহ ধৃত হন। অন্যান্য চক্রান্তকারিগণ এই সংবাদ রাণীকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি দশমবর্ষীয় পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তিকে লইয়া কাছাড়ে পলায়ন করিলেন। নরসিংহ রাজভবনে গমন পূর্ব্বক রাজ্ঞীর কার্য্য কলাপ শ্রবণ করত স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন ও রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। নবীন সিংহের প্রাণদণ্ড হইল। তৎপর ৬ বৎসর কাল সুনিয়ম ও প্রবল বিক্রমে রাজ্য শাসন করিয়া ১৭৭২ শকাব্দে রাজা নরসিংহ পরলোক গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি তিন মাসের অধিক রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। গম্ভীর সিংহের একমাত্র পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে বাহুবলে পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য রাজবংশীয় অনেকেই চেষ্টা করিয়া অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ

* Brown's Munnipure. pp. 66, 67.

অব্দে গবর্ণমেণ্ট মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্টের পদ এবালিস করিতে প্রস্তাব করেন। মণিপুরপতি চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ এই সংবাদ শ্রবণে উক্ত প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, তজ্জন্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮আগষ্ট) এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তৎপর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের মত গ্রহণান্তর ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তির মতানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। ৩৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৮০৭ শকাব্দে চন্দ্রকীর্ত্তি পরলোক গমন করেন। তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহারাজ সুরচন্দ্রের অভিষেক কালে তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যৌবরাজ্যে ও তৎকনিষ্ঠ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায় চতুর্থ ভ্রাতা দুর্দ্দান্ত টীকেন্দ্রজিৎ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে প্রায় ৫ বৎসর গত হইল, দুর্দ্দান্ত টীকেন্দ্রজিৎ নানা প্রকার কৌশলে পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিনউড সাহেবকে বাধ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে টীকেন্দ্রজিতের চক্রান্তে সুরচন্দ্র রাজ্যপরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন যাত্রা করিতে বাধ্য হন। (১৮৯০ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর) টীকেন্দ্রজিৎ কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং যুবরাজ হইলেন। সুরচন্দ্র কলিকাতায় উপনীত হইয়া প্রকৃত অবস্থা গবর্ণর

জেনারল সমীপে জ্ঞাপন করিলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে আসামের শাসন কর্ত্তার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন। পলিটিকেল এজেণ্ট কুলচন্দ্রকে রাজা ও টীকেন্দ্রজিতকে যুবরাজ স্বীকার করিবার জন্য জেদকরিতে লাগিলেন; আসামের চিফ্ কমিসনর সাহেব সেই তালে তাল বাজাইলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া টীকেন্দ্রজিতের কুকার্য্য অনুমোদন করেন (অর্থাৎ কুলচন্দ্রকে মণিপুর পতি বলিয়া স্বীকার করিলেন); কিন্তু টীকেন্দ্রজিৎ এই অন্যায় রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্য চিফ্ কমিসনরের প্রতি আদেশ করিলেন। কুইণ্টন সাহেব সেই আদেশানুসারে কার্য্য করিবার জন্য মণিপুরে গমন করেন। কুইণ্টন সাহেব দরবার গৃহে টীকেন্দ্রজিতকে গ্রেপ্তার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন(!!)। টীকেন্দ্রজিৎ অসুস্থতা বশতঃই হউক কিম্বা অন্য কারণেই হউক, দরবারে অনুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য গোপনে সৈন্য প্রেরিত হইল (!!)। তৎকালে টীকেন্দ্রজিতের অধীনে ৪৪০০পদাতি, ৫০০গোলোন্দাজ ও ৪০০অশ্বারোহী সৈন্যছিল। সুতরাং মুষ্টিমেয় সৈনালইয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ টীকেন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে মণিপুরে পঞ্চশতের অধিক গবর্ণমেণ্টের সৈন্য ছিল না। সমস্ত দিন অনল ক্রিয়ার পর কুইন্টন সাহেব যুদ্ধ স্থগিত করিবার জন্য

আদেশ করেন। তদনন্তর কুইন্টন, গ্রিমউড, কর্ণেল, স্কীন, লেপ্টেনেণ্ট সিমসন ও কসিন্স সাহেব টীকেন্দ্র জিতের সহিত আলাপ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে তাঁহারা যখন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এমনি সাধারণ লোক দ্বারা লেপ্টেনেণ্ট সিমসন ও পলিটিকেল এজেণ্ট গ্রিমউড সাংঘাতিক রূপে আহত হন। সেই মুহূর্ত্তেই গ্রিমউড প্রাণ ত্যাগ করেন। তৎপর নির্দ্দয় থঙ্গাল জেনারলের আদেশানুসারে কুইণ্টন, স্কীন, কসিন্‌স সাহেবকে বলিদান করা হইয়াছিল; * সেই পঞ্চ ইংরেজ রাজ-পুরুষের মুণ্ড একগর্ত্তে সমাহিত করিয়া অপরিণামদর্শী মণিপুরিগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিল।

এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের শ্রুতি গোচর হইলে, দলে দলে ব্রিটীশ সৈন্য মণিপুরে প্রেরিত হইল। নিরস্ত্র সাহেবদিগকে বলিদান করিবার সময় মণিপুরিগণ যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণ তাহাদের সেই বীরত্ব তিরোহিত হইল, এই সকল অপরিণামদর্শী কাপুরুষগণ স্ব স্ব পরিবার বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু যথা সময়ে সকলেই ধৃত হইয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ নিকট

* Mano Mohan Ghose's Appeals of the Manipur Princes. pp. 7, 8.

উপস্থিত হইল। বিচারে কুলচন্দ্র নির্ব্বাসিত. টীকেন্দ্রজিৎ ও থঙ্গাল জেনেরেল ফাঁসিকাষ্টে বিলম্বিত হইলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কুলচন্দ্র, টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ব্যক্তি-গণ স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়াছেন; কিন্তু সুরচন্দ্র ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ কোন পাপে চিরকালের জন্য তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যটী হারাইলেন, গবর্ণমেন্টের এবিচার রহস্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের প্রপৌত্র পঞ্চম বর্ষীয় বালক চূড়াচাঁদকে গবর্ণমেণ্ট মণিপুরের রাজাসনে স্থাপন করিয়াছেন; তিনি বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ মণিপুরের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ইংরেজ রাজপুরুষগণের সুশাসনে মণিপুরের উন্নতি এবং মণিপুরীদিগের চরিত্র সংশোধিত হইবে বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতে পারি।

ক্ষুদ্র ও নগণ্য মণিপুরকে ইংরেজ বাড়াইয়াছিলেন, আবার ইংরেজের দ্বারাই সেই মণিপুরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। চূড়াচাঁদকে মণিপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনুজ্ঞা করিয়াছেন যে, চূড়াচাঁদ ও তাঁহার উত্তর পুরুষগণ "রাজা" উপাধিধারণ করিবেন। মণিপুরের "রাজা" ব্রিটীস অধিকারে আসিলে তাঁহার সম্মানার্থে ১১টি তোপধ্বনি হইবে। রাজার জেষ্ঠ্য পুত্রই রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন। অনপত্যতা নিবন্ধন ব্যতিত রাজার ভ্রাতা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি সেই

পদ প্রাপ্ত হইবেন না। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ভিন্ন কেহই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না। মণিপুরের রাজাকে নিয়মিতরূপে করপ্রদান করিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট পশ্চাৎ সেই করের প্রকার ও পরিমাণ স্থির করিবেন। মণিপুরের শান্তিরক্ষার জন্য ১৩০০ শত ব্রিটীস সৈন্য তথায় থাকিবে।

ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের সুশাসনে অল্পকাল মধ্যে মণিপুরের রাজস্ব আশাতীত রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মচারি ও ভৃত্যবর্গের জায়গীর (চাকরাণ নানকার বা "লাল্লুপ") প্রথা রহিত করিয়া রাজস্ববৃদ্ধির পন্থা পরিষ্কার করিয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের যে লোক সংখ্যা গৃহীত হয়, তদ্দ্বারা মণিপুরের অধিবাসী সংখ্যা কিঞ্চিদূন সওয়া দুই লক্ষ নির্ণীত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীহট্টের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহে এই প্রদেশ "শিলহট্ট"এবং শ্রীহট্ট উভয় আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। শিলহট্ট শব্দ হইতে শিলট, শিলট হইতে ইংরেজি "ছিলেট" নামের উৎপত্তি।

চীনপরিব্রাজক হিয়োন সাঙ বলেন, সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বদিকে শিলহট্ট রাজ্য অবস্থিত। এইরাজ্য সমুদ্র (হ্রদ) তীরবর্ত্তী। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ,

ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে ত্রিপুরাজেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয় এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদে প্রবাহিত কর্দ্দম দ্বারা ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সন্ধিস্থল সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইলে, এই হ্রদ বিশেষ রূপে মানব মণ্ডলির দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল। এজন্যই দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে হিয়োনসাঙ শিলহট্ট রাজ্যটি সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বড়বক্র প্রভৃতি নদী সমূহ এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। নদী প্রবাহে আনীত কর্দ্দম-রাশি দ্বারা সেই হ্রদ ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিলের কান্দি বা উচ্চস্থানস্থিত গ্রাম-গুলি অদ্যাপি বর্ষাকালে সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার প্রায় চতুর্থাংশ বিল, ও নিম্নভূমি ইহার সহিত ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত নিম্নভূমি ও ত্রিপুরা জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত নিম্নভূমি সংযুক্ত করিলে বোধ হয় উল্লিখিত হ্রদের পরিমাণ ফল দুই সহস্র বর্গ মাইল হইতেও অধিক ছিল।

আধুনিক শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুর-রাজছত্রের অধীন ছিল এবং পূর্ব্বাংশ কাছাড়ের অধিকারভুক্ত ছিল। সুতরাং এক্ষণে যে বিস্তৃত প্রদেশকে জেলা শ্রীহট্ট বলা যায়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ প্রাচীন কালে ত্রিপুরা ও কাছাড় নরপতিবৃন্দের দণ্ডাধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে

মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগদ্বারা সেই সেই অংশ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালে শ্রীহট্ট তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১—গৌড় বা শ্রীহট্ট। ২—লাউর ৩—জয়ন্তীয়াপুর। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে গৌড় বা শ্রীহট্টের অধিপতি অধিক বলশালী ছিলেন। কিন্তু সকলকেই ত্রিপুররাজদণ্ডের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইত। ত্রিপুরেশ্বর এই তিনটি রাজ্যের অধিপতিগণকে আপনাদিগের সামন্ত শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতেন। কালবশে মুসলমানগণ বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে উপনীত হইয়া, ত্রিপুরার সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিল। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় প্রবেশ কালে যাঁহারা শ্রীহট্টের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সকল নরপতিগণ আপনাদিগকে চন্দ্রবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দদেব নামক নরপতি শ্রীহট্টের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। * রাজা গোবিন্দদেব বোরাহেনদ্দিস নামক জনৈক মুসলমান পীরকে গোহত্যা অপরাধে অপমানিত করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে

* গোবিন্দদেবের তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইনি নারায়ণদেবের পুত্র, গোকুলদেবের পৌত্র ও খরবাণদেবের প্রপৌত্র। রাজা গোবিন্দদেব ভট্টপাঠক (ভাটপাড়া) গ্রামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শ্রীহট্টনাথ শিব স্থাপন করেন। সেই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ৩৭৫ হল ভূমি ও ২৯৬ খানা বাস্তু দান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ, গোবিন্দদেবকে "যত্নকর" অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা-বিশারদ লিখিয়াছেন। সমস-উদ্দিন ইলিয়স সাহার পুত্র সুলতান সেকেন্দর গোবিন্দদেবের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। কিন্তু যাদুবিদ্যার প্রভাবে গোবিন্দদেব প্রথমবার সেকেন্দরকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয়বার সেকেন্দর সাহাজালাল নামক "দরবেশের" সাহায্যে গোবিন্দদেবকে জয় করিয়া শ্রীহট্ট অধিকার করেন। গোবিন্দদেব রাজ্যচ্যুত হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু গোবিন্দদেবের পুত্র ঈশানদেবের তাম্রশাসন পাঠে অনুমতি হয় যে, পিতার মৃত্যুর পর, তিনি শ্রীহট্টের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। † সুতরাং মুসলমানদিগের শ্রীহট্ট অধিকারের সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল দৃষ্ট হইতেছে। সুবিখ্যাত মুর পরিব্রাজক ইবন বতোতা ১২৭৩-৭৪ শকাব্দে কামরূপের পার্ব্বত্য প্রদেশে (শ্রীহট্টে) গমন করত পীর সাহ জালালকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গণনা অনুসারে ১২৭৩-১৩০৬ শকাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট অধিক

† ঈশানদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, রাজা ঈশানদেব একটি উচ্চশীর্ষ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসূদন মূর্ত্তি স্থাপন করেন। সেই দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ২ হল ভূমি দান করা হইয়াছিল।

করেন। কিন্তু দৃঢ়ভাবে তথায় রাজদণ্ড সংস্থাপন করিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার মানসে আসাম ও ত্রিপুরা-পতিগণ বারংবার শ্রীহট্ট প্রদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে বিরত হন নাই। লাউরপতিগণ অবশেষে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করত মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইবার সময়েও জয়ন্তীয়াপতিগণ আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট প্রদেশ হইতে ভারতের সর্ব্বত্র দাস, দাসী ও খোজা প্রেরিত হইত। বিনীস দেশীয় বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্ক পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত,* আইন আকবরী † ও তজক-জাহাংগিরী গ্রন্থে খোজা ব্যবসায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আবুল ফজল বলেন, খোজাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, যথা—ছান্দলী, বাদামী ও কাফুরী। শৈশবে যাহাদের উপস্থ ও মুষ্ক আমূল ছেদিত হয়, তাহাদিগকে ছান্দলী বা আতলছি বলে। কেবলমাত্র যাহাদের মুষ্ক ছেদিত হয় তাহাদের নাম বাদামী এবং যাহাদের উপস্থ মাত্র ছেদন

* Wright's Marco Polo. p. 280.,
Yule's Marco Polo. Vol. 11. p. 79.

† ব্লকমান প্রকাশিত মূল আইন আকবরী ৩৮৯ পৃষ্ঠা।

করা হয় তাহাদিগকে কাফুরী বলে। সম্রাট জাহাংগীর ঘোষণা পত্র দ্বারা বালকদিগের মুষ্ক ও উপস্থ ছেদন করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধআজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু দাসদাসীক্রয় বিক্রয়ের প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল. ২৫। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও শ্রীহট্ট প্রদেশে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় হইত, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় দাসত্ব প্রথা পাশ্চাত্য দাসত্ব প্রথার ন্যায় ভীষণ ছিল না। কারণ আমাদের দাস দাসীগণ পরিবারের লোক বলিয়া গণ্য হইত। যাহা হউক এই প্রথাও ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট দ্বারা তিরোহিত হইয়াছে।

আবুল ফজল বলেনঃ—

শ্রীহট্ট সকার পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এখানে সোমতারা (কমলা লেবু) নামক সুবর্ণ, সুমিষ্ট ও সুখাদ্য ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং চোবচিনী নামক ঔষধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। "বিহঙ্গরাজ" পক্ষী এই সরকারে পাওয়া যায়।

এই সরকারে সৈন্যসংখ্যা—১১০০ অশ্বারোহী, ১৯০টি হস্তী এবং ৪২৯২০ পদাতি। রাজস্ব ১৬৭০৩২ টাকা ১৮ দাম।* ৮টি মহাল যথা।

১। প্রতাপগড় ও পঞ্চখণ্ড। রাজস্ব ৩৭০০০০ দাম। দুইটি স্বতন্ত্র পরগণা। প্রতাপগড়ের পরিমাণ ১৩১॥০ বর্গ মাইল।

* দাম, আধুনিক ডবল পয়সার ন্যায় একপ্রকার তাম্র মুদ্রা। ৪০ দামে সেরসাহি এক টাকা। তুড়র মল্লের ওয়াশীল তোমরজমা সেরসাহের রাজস্ব হিসাবের নকল মাত্র।

পঞ্চখণ্ডের অন্তর্গত দীঘির পার গ্রামবাসী বৈদিকব্রাহ্মণকুলেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব হয়।

২। বানিয়াচুং। রাজস্ব ১৬৭২০৮০ দাম। এই বৃহৎ মহাল অধুনা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যে অংশ "বানিয়াচুং" নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ ৫৩৫ বর্গ মাইল। এই মহাল লাউরের রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। লাউরের যে হিন্দু নরপতি মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করেন তাঁহার পৌত্র আবিদরেজা লাউর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহালের অন্তর্গত কসবা-বানিয়াচুং নামক গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গ্রামের আধুনিক লোক সংখ্যা প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র। নদীয়ার অন্তর্গত শান্তিপুর ব্যতীত বাঙ্গালায় অন্য কোন গ্রামের লোক সংখ্যা এতাধিক নহে।

৩। জয়ন্তীয়া। রাজস্ব ২৭২০০ দাম। জয়ন্তীয়া রাজ্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা তোড়রমল্ল যে কিরূপে ইহাকে একটি মহাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ডাক্তর বকনন লিখিয়াছেন যে, বিস্তৃত আধিপত্য ও ক্ষমতা অনুসারে জয়ন্তীয়াপতি রাজা * উপাধি ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বটেন। মুসলমানগণ জয়ন্তীয়ারাজের প্রতি অত্যাচার করিতে

* এস্থলে রাজা অর্থ King বুঝিতে হইবে।

ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা কখনও জয়ন্তীয়ার স্বাধীনতারত্ন হরণ করিতে সক্ষম হন নাই। চড়াপুঞ্জির এসিষ্টাণ্ট কমিসনর মৃত হেরি ইংলিশ সাহেবের যত্নে জয়ন্তীয়া রাজবংশ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তীয়া রাজ্য ব্রিটনীয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হইয়াছে। * জয়ন্তীয়াপতিগণ খসবংশ সম্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য বংশজ করিয়া লইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তন্ত্রে জয়ন্তীপুর একটি পীঠস্থান বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এক সময় এই জয়ন্তীয়ারাজ্য উত্তর দক্ষিণে ৮০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪০ মাইল পরিসর ছিল। জয়ন্তীয়াপতি রাজেন্দ্র সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট ৩৮৫০ বর্গ-মাইল বিস্তৃত একটি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

* In 1832, four subjects of the British Government were seized by Chutter Sing, the Raja of Goba, one of the petty chieftains dependant on Jynteeah, to whom the order was conveyed from the heir apparent (the present Raja) by the chief of Nurtung ; they were carried to a temple within the boundaries of Goba, where three were barbarously immolated at the shrine of Kali ; the fourth providentially effected his escape into the British territories, and gave intimation of the horrible sacrifice which had been accomplished.

(Mackenzie's North East Frontiers of Bengal. P.210.)

৪। বাজিয়া ব্যাজু। রাজস্ব ৮০৪০৮০ দাম। অধুনা একটি ক্ষুদ্র মহাল, পরিমাণ ৪॥ বর্গ মাইল।

৫। হাবিলশ্রীহট্ট। রাজস্ব ২২৯০৭১৭ দাম। আধুনিক কসবা-শ্রীহট্ট ও তদন্তর্গত মহাল। পীর সাহাজালালের সমাধি মন্দির শ্রীহট্টনগরে একটি কীর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সেই সাহাজালাল এবং আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সাহাজালাল এক ব্যক্তি কিনা তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে। ৯১১ হিঃ অব্দের (১৪২৭ শকাব্দের) একটি মসজিদের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যাঁহার সমাধি মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই পীর সেখ জালাল আরবের অন্তর্গত কনয়া নামক স্থানে জন্ম-গ্রহণ করেন। কিন্তু মূর পরিব্রাজক ইবন বতোতা যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তাব্রিজ দেশ জাত। খানবালিক (পিকিন) নিবাসী পীর বোরাহেন-উদ্দিনকে উপহার প্রদান

এই নরবলির অপরাধেই জয়ন্তীয়ারাজ ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা রাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি সত্য হইলে জয়ন্তীয়া পতির উপযুক্ত দণ্ডই হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস লেখকের পিতৃস্বসাপতি বাবু রামশরণদত্ত চড়াপুঞ্জির এসিষ্টেণ্ট কমিসনর হেরি ইংলিস সাহেবের আফিসে সেরেস্তাদার ও পিতৃব্য বাবু কালীনাথ সিংহ তাহার অধীনে "জেইলার" ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা যেরূপ অবগত হইয়াছি তদ্দ্বারা এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সন্দিহান রহিয়াছি।

জন্য পীর জালাল উদ্দিন, ইবন বতোতাকে একটি খিলকা প্রদান করিরাছিলেন। যদিচ শ্রীহট্টের সাহাজালাল বিখ্যাত মুসলমান পীরদিগের তালিকাভুক্ত নহেন; তথাপি শ্রীহট্ট প্রদেশে তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ও সম্মান রহিয়াছে। তথায় তিনি "তিনলাখ পীরের" শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। *

৬। সতরখণ্ডল। রাজস্ব ৩৯০৪৭২ দাম। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সরাইল পরগণার কিয়দংশ অদ্যাপি সতরখণ্ডল নামে পরিচিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নগর এই অংশ মধ্যে অবস্থিত। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গতসর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরগণা সরাইলের কিয়দংশ তৎকালে শ্রীহট্টের মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের অধিকারভুক্ত ও অবশিষ্টাংশ ত্রিপুরেশ্বরদিগের করতলস্থ ছিল। শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমেং সমগ্র সরাইল ও ময়মনসিংহের অন্তর্গত জোয়ানসাহি পরগণা

---

* পারসিভাষায় সাহাজালালের একখানা ইতিহাস আছে। শ্রীহট্ট নিবাসী মৌলবি নছরউল্লা সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা (মুসলমানী) ভাষায় "তওারিখে জালালি" নামক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ৫পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,

"সাহাজালাল নামে ছিল চারিজন অলি।
জারজে লকব আছে জানিবে সকলি।"

"প্রথম সাহাজালাল বোথারা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় সাহাজালাল তাব্রিজ দেশবাসী ছিলেন। তৃতীয় সাহাজালাল কোরেসি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম

অধিকার করেন। মুরশিদ কুলিখাঁর শাসন কালে সরাইল (সতরখণ্ডল সহ) ও জোয়ানসাহি শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়াবতের "নাউরা" সেরেস্তার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

৭। লাউর। রাজস্ব ২৪৬২০২ দাম। লাউর নগরী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই নগর খস পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত। খস পর্ব্বতের কিয়দংশ ও আধুনিক সুনামগঞ্জ উপবিভাগের অধিকাংশ এবং হবিগঞ্জ উপবিভাগের কিয়দংশ লাউর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। লাউরের অধিপতিগণ ব্রাহ্মণ বংশজ ছিলেন। লাউরের রাজা গোবিন্দ দেব একজন বিখ্যাত নরপতি। তিনি মুসলমানদিগের সহিত অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তদন্তে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করত আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম এবং রাজার পরিবর্ত্তে "রেজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি এই রেজাবংশ বানিয়াচুং গ্রামে বাস করিতেছেন। কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহাদের

মহাম্মদ, পিতামহের নাম এব্রাহিম. ইনিই শ্রীহট্ট জয় করেন। চতুর্থসাহাজালাল গঞ্জেরয়াবাসী ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইবন বাতোতা দ্বিতীয় সাহাজালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যাঁহার সমাধি মন্দির শ্রীহট্ট নগরীর গৌরব স্তম্ভ স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, "তওারিখে জালালি" লেখক কনয়া নিবাসী সেই সাহাজালের উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় কনয়া ও কোরেসি অভিন্ন নগরী।

প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আধুনিক লাউর পরগণার পরিমাণ ১০৯ বর্গ মাইল।

৮। হরিনগর রাজস্ব ১০১৮৫৭ দাম। অধুনা ক্ষুদ্র একটি পরগণা, পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল।

মোগল শাসনকালে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ পশ্চিমে ময়মনসিংহের অধীন নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত অধিকাংশ ভূমি এবং জোয়ানসাহি পরগণা; দক্ষিণদিকে ত্রিপুরার অন্তর্গত সরাইল, বেজোরা, তরপ, প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণা অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্টের সীমারেখা বদরপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

১৬৪৪ শকাব্দে (১৭২২ খৃ অঃ) নবাব মুরশিদকূলি খাঁ "জমা কমালে তুমারি" নামক যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন তাহাতে সুবে বাঙ্গালা ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত হইয়াছে। তম্মধ্যে চাকলে শিলহট ১৪৮টী মহাল ও পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহার রাজস্ব ৫৩১৪৫৫ টাকা লিখিত হইয়াছে। ইহার সতরবৎসর অন্তে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) নবাব সুজাউদ্দিন "জমা তুমারি তকছিছি" নামক যে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহাতে শিলহট ফৌজদারির অন্তর্গত কেবল মাত্র ৩৬টী পরগণা খালিসা ও তাহার রাজস্ব ৭০০১৬ টাকা লিখিত আছে, অবশিষ্ট সমস্তই জায়গীর ও নানা প্রকার বৃত্তিতে বিভক্ত দৃষ্ট হয়।

মোগল সম্রাট আওরংজেবের শাসনকালে মগ ও পর্ত্তুগিজ দস্যু দিগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা করিবার জন্য ঢাকায় "নাওরা" বিভাগ * সংস্থাপিত হয়। উক্ত বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি পরগণা ক্রমে ক্রমে ঢাকার নেজামত সেরেস্তার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। ১১৬৯ বঙ্গাব্দে সরাইল, জোয়ানসাহি ও তরপ নামক তিনটী বৃহৎ পরগণায় চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকার নাওরা বিভাগ ভুক্ত হইয়াছিল। তৎকালে এই তিনটী পরগণার রাজস্ব ১৫৬৭৪০ টাকা শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকার নেজামত সেরেস্তায় দাখিল হইয়াছিল। †

বানিয়ারচুং মহাল যদিচ তৎকালে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হয়নাই কিন্তু বানিয়াচুংয়ের অধিপতি ৪৮ খানা কোষ নৌকা যুদ্ধকালে নবাবের আদেশানুসারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য ছিলেন এবং তাহার রাজস্ব ৬১৯৪১ টাকা নাওরা জায়গীর উল্লেখে বাদ পাইতেন। দীল্লির রাজদরবারে শীতল

* Naval Establishment.

† চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ :—

সরাইল সতরখণ্ডল (অধুনা ত্রিপুরাজেলার অধীন) ১১১০৮৪৲
জোয়ানসাহি (অধুনা ময়মনসিংহের অধীন) ৩৩৮২০৲
তরপ (অধুনা শ্রীহট্টের অধীন) ১৬২১৭ টাকার মধ্যে ১১৮৩৬৲
১৫৬৭৪০৲

পাটী ও মোগা তসর প্রেরণ জন্য (৩১টি মহালের রাজস্ব) ২৮৯৬৪ টাকা। হস্তী ধৃত করার খরচ (এগারশতী প্রভৃতি ১৫ পরগণার রাজস্ব) ২৮৯৮৮ টাকা এবং হস্তীর খোরাকী (৩০টি পরগণার রাজস্ব) ১৮০৪৪ টাকা জায়গীর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুশং ও কাছাড়ের বার্ষিক বৃত্তি ৪৮৪৫ টাকা লিখিত আছে। এইরূপ চাকলে শ্রীহট্টের অধিকাংশ রাজস্ব জায়গীর ও বৃত্তিতে ব্যয়িত হইত।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। সেই সূত্রে শ্রীহট্ট ব্রিটনীয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হইয়াছে। তৎকালে শ্রীহট্ট জেলার পরিমাণ ২৮৬১ বর্গমাইল ছিল। টেকরী সাহেব শ্রীহট্টের প্রথম ইংরেজ শাসন কর্ত্তা। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রবার্ট লেণ্ড্ছে সাহেব জেলা শ্রীহট্টের কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"আমি শ্রীহট্টে উপনীত হইয়া নিয়মানুসারে প্রথমেই সাহা জালালের দরগায় গমন করি। ৫টী স্বর্ণ মোহর দরগায় "নজর" প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় বাস বভনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীহট্টবাসিগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া আমাকে "নজর" প্রদান করেন। সেই নজরের টাকায় আমার টেবল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজস্ব আদায় করাই আমার কার্য্য ছিল। দেওয়ানী কার্য্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতাম। ফৌজদারী

নবাবের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। এখানকার রাজস্ব অধিকাংশ কড়ি দ্বারা আদায় হইয়া থাকে।

"এই জেলায় অতি উত্তম চূণ প্রস্তুত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়। গ্রীক ও আরমানীগণ চূণের ব্যবসায় করিয়া থাকে।

"এক বৎসর মহরমের সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। শান্তিরক্ষার জন্য আমি ৫০ জন সৈন্য লইয়া বিবাদ স্থলে গমন করি আমি মুসলমানদিগকে অনেক বুঝাইলাম, তাহাদের খলিফা উত্তর করিল, অদ্য আমাদের মরিবার এবং মারিবার দিন, এই সময়ে একজন মুসলমান আমাকে আক্রমণ করে, তাহার আঘাতে আমার তরবারী দ্বিখণ্ড হইল কিন্তু আমি শীঘ্র হস্তে পিস্তল দ্বারা খলিফাকে বধ করিলাম এবং আমার সঙ্গীয় সৈন্যগণকে বন্দুক চালাইতে অনুমতি দিলাম, বন্দুকের গুলিতে খলিফার দুই ভাই হত ও অনেকগুলি মুসলমান আহত হইলে তাহারা পলায়ন করিল। আমাদের পক্ষে একজন সৈন্য হত ও ৬ জন আহত হইয়াছিল। আমি এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলাম।

"১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর শ্রীহট্ট জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। তদ্দ্বারা ধান্য ও চাউলের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। রাজস্ব আদায় সুকঠিন হইয়া উঠে। খাজানা মাপের জন্য আমি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করি,

সরকারি গুদামে ধান্য মজুদ রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছুকালের জন্য রাজস্ব আদায় বন্ধ রাখিতে আদেশ করেন। নদীতীরে গুদাম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ধান্য মজুদ রাখা হইল। কিছু কাল অন্তে বৃষ্টি হইয়া নদীর জল ২০ হস্ত বৃদ্ধি হইল। গুদামের সমস্ত ধান্য নদী স্রোতে ভাসিয়া গেল, সহস্রাধিক মনুষ্য ও পশু পক্ষী জল প্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা দর্শনে চাউল প্রেরণ করিবারজন্যগবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলাম। গবর্ণমেণ্ট চাউল পাঠাইলেন বটে কিন্তু ইহার তত্ত্বানুসন্ধান জন্য গবর্ণমেণ্ট অন্য একজন অফিসার প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও তৎসহচর নানা প্রকার পীড়ায় তৎকালে শ্রীহট্টের তৃতীয়াংশ অধিবাসী বিনষ্ট হয়।”

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালীস বাঙ্গালার জমিদারগণ সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। তদনুসারে শ্রীহট্ট জেলার ভূম্যধিকারিগণ সহিতও “দশশালা” বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের মঙ্গল ও উন্নতির প্রধান কারণ এই যে, এই জেলার ভূম্যধিকারিগণ সকলেই রাজকীয় ধনাগারে স্ব স্ব অধিকৃত ভূমির রাজস্ব পরিশোধ করিয়া থাকেন। শ্রীহট্ট জেলায় “মারফতদার” বৃহৎ জমিদার নাই বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। লর্ড কর্ণওয়ালীসের ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩ফেব্রুয়ারির মন্তব্য লিপির মঙ্গলময় ফল শ্রীহট্ট প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইয়াছে। বাঙ্গালার অন্য কোন জেলার

তদ্রূপ হয় নাই। এখানে জমিদার ও তালুকদার এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান, সকলেই গৌরবের সহিত আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম। শ্রীহট্টের ভূম্যধিকারিগণ সাধারণতঃ "মিরাসদার" আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত অনুসারে জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মহালগুলি নিম্নলিখিত আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে।

১। দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালীসের বিধি অনুসারে যে সকল মহাল বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

২। হালাবাদী মুদামী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে সকল নূতন আবাদী মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৩। খাস হালাবাদী। যে সকল হালাবাদী মুদামী মহাল বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া পুনর্ব্বার অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

৪। খাস মুদামী। দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া সাবেক জমায় অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

৫। জৈন্তা মুদামী। জয়ন্তীয়ার রাজার দত্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৬। এলাম মুদামী। গবর্ণমেণ্টের ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের

৩৭১ নং চিঠির মর্ম্মানুসারে ৫ বৎসরের রাজস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক যে সকল মহাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৭। বাজেয়াপ্তি মুদামী মহাল। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, চেরাগী, শিন্নি, রুজিনা, মদ্‌দমাস দরস্‌সফা, তন্‌খামুজরাই, নান্‌কার, খানেবাড়ী, তোপখানা, হুড়মহাল, ইস্কাত, সাকি. খুসবাস ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার নিষ্কর ও জায়গীর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২ আইন মতে বাজেয়াপ্ত হইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে।

২। মেয়াদী বন্দোবস্ত মহাল। এই সকল মহাল এলাম, ওয়েষ্টলেণ্ড, চড়ভরট, বিলভরট, জলকর, নান্‌কার পাটওয়ারী। জৈন্তা-রায়তওয়ারি ও খাস মেয়াদি প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত তন্মধ্যে ওয়েষ্টলেণ্ড সমস্তই চাকর কোম্পানীর সহিত ২৩ এবং ৩০ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত হইয়াছে। এলাম মহাল পূর্ব্ব মালিক সহিত ২০ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

অধুনা শ্রীহট্ট জেলার পরিমাণ ৫৩৮৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। এই জেলা ৫টি মহকুমায় বিভক্ত যথা— সদর, মৌলবি বাজার, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। শ্রীহট্ট জেলা সর্ব্বদা ঢাকা বিভাগের অধীন ছিল। ১৭৯৪ শকাব্দে আসামের চিফ কমিস্নরের অধীন হইয়াছে।

শ্রীহট্টের হিন্দুগণ মধ্যে কায়স্থ জাতীয় দাসবংশীয় "দস্তি-

দারগণ" বিশেষ সম্মানিত। মোগল শাসনকালে এই বংশের স্থাপনকর্ত্তা হরেকৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের শাসন কর্ত্তৃত্বে (আমিলের পদে) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রবাদ অনুসারে "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত সম্মানিত মুসলমান পরিবার উল্লিখিত দস্তিদারবংশ হইতে উদ্ভূত। এই প্রবাদ বাক্য সত্য হউক আর না হউক, প্রোক্ত মুসলমান বংশের স্থাপনকর্ত্তা চাকলে শ্রীহট্টের কাননগুই পদ লাভ করত "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকালে প্রত্যেক চাকলায় রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী "কাননগুই" উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। কাননগুইদিগের সাধারণ উপাধি মজুমদার। এই পদটি মুসলমান শাসনকালেও হিন্দুগণের একচেটিয়া ছিল। সুতরাং উল্লিখিত প্রবাদ বাক্য সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে বানিয়াচুংয়ের জমিদার বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানিত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লাউরের রাজবংশ হইতে এই জমিদার বংশ উদ্ভূত। লাউর রাজগণ কাত্যায়ণ গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে লাউরপতি মুসলমানদিগের অত্যাচারে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করত "রাজার" পরিবর্ত্তে "রেজা" আখ্যা ধারণ করেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি নামের সহিত সেই "রেজা" শব্দ সংযুক্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক সম্প্রদায় বিশেষ

সম্মানিত। শ্রীহট্টের বৈদিককুলে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব জন্মগ্রহণ করেন। এই বৈদিককুলে বিখ্যাত পণ্ডিত গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ আবির্ভূত হন। অদ্যাপি সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, "ছিলটিয়া গদা সোণার গদা" যে রঘুনাথ শিরোমণি বাঙ্গালার ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; গদাধর সেই মহাত্মার প্রিয়তম ছাত্র এবং জগদীশ তর্কালঙ্কারের গুরু। গদাধর স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ সমাপন পূর্ব্বক নবদ্বীপে টোল করিয়া তথায় শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। শিরোমণির মৃত্যুর পর গদাধরই বঙ্গীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজের শিরোভূষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তিনি "চিন্তামণি আলোক" ও "দীধিতির" যে টীকা রচনা করেন তাহা অদ্যাপি "গাদাধরী" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত রহিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র জগদীশ তর্কালঙ্কার ন্যায় শাস্ত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার। পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ জগদীশ "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" (বাদার্থ) ও "তর্কামৃত" (বৈশেষিক) নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গদাধরের মৃত্যুর পর অন্যান্য পণ্ডিতগণ শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ নবদ্বীপে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক নবদ্বীপেই অধ্যাপনা

করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষায় শ্রীহট্টের দুইটী ব্রাহ্মণ ছাত্র ন্যায় ও সাঙ্খ্যদর্শনের পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নানা প্রকার পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের "সাহাগণ" স্বজাতীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত।

শ্রীহট্টের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ অধিকাংশ শাক্ত এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ অধিকাংশ বৈষ্ণব। শ্রীহট্ট প্রদেশে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক। বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি আখড়া আছে, তন্মধ্যে বিথঙ্গলের আখড়াই সর্ব্বপ্রধান।

শ্রীহট্টবাসিগণ শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ। শ্রীহট্টের কারুগণ গজদন্তদ্বারা পাটি, পাখা, চুড়ি ও চেইন প্রস্তুত করিতে পারে। চুয়াল্লিশ পরগণার শীতল পাটি সার্ব্বোৎকৃষ্ট; তরপ পরগণার কোপ্তের কার্য্য ও ইটা পরগণায় উৎকৃষ্ট লৌহ কার্য্য হইয়া থাকে। পাথারিয়া পরগণায় আগর দ্বারা আতর প্রস্তুত হয়। আরব ও শ্যাম দেশীয়গণ এই আতর বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। নাগেশ্বর ফুল হইতেও আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট প্রদেশে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। খসিয়া পর্ব্বত জাত কমলালেবু শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। বাহাদুরপুর পরগণার অন্তর্গত জলচুপ নামক স্থানে অতি উৎকৃষ্ট আনারস উৎপন্ন হয়। ইতিহাস লেখক

বিবিধ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ আনারস অন্য কোন স্থানে তিনি প্রাপ্ত হন নাই। জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ইহার তুল্য ফল ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে নাই।" লঙ্গলা পরগণায় এলাচি-সুবাসিত উৎকৃষ্ট লেবু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলা সমূহের মধ্যে "অমৃত সাগর" বা "ডিঙ্গমাণিক" অতি বৃহৎ, সুখাদ্য ও সুমিষ্ট। "থৈফল" (অম্লবেতস) নামক এক প্রকার অম্ল রসাত্মক ফল কেবল শ্রীহট্টের পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অল্পকাল মধ্যে শ্রীহট্ট জেলায় অনেকগুলি চাবাগান হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটি মাত্র দেশীয় লোকের, অন্যগুলি ইউরোপীয় ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর অধিকৃত।

শ্রীহট্টের প্রধান পণ্য দ্রব্য—ধান্য, তণ্ডুল, চুণ, আলু, কমলা, গালা, মম, মধু, কমলা-মধু, চা, হস্তী ও হস্তিদন্ত, এবং তেজপত্র।

শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণদিগে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে নওয়াখালী এবং নওয়াখালীর দক্ষিণদিগে চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। গ্রন্থের শেষভাগে ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জিলার বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা করি, এজন্য পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চট্টগ্রামের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

চট্টগ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

কর্ণেল উইল ফোর্ড বলেন, "চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম "পুষ্পগ্রাম"। ইহা প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের একটী অংশ। যে তিনটি নগরী হইতে ত্রিপুরা, ত্রিপুরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, চট্টল তাহার অন্যতম নগরী। কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) চট্টল এবং বর্দ্ধণক (বা রসাং) এই তিনটি "পুর" হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি। এই ত্রিপুরাপতি ত্রিপুরকে ভগবান আশুতোষ ত্রিশূল দ্বারা বিনষ্ট করত সেই ত্রিশূল কমলাঙ্ক প্রদেশে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।"

পুরাণ ও তন্ত্র সমূহে চট্টগ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কবিতায় চট্টগ্রামের পরিবর্ত্তে "চট্টল" শব্দ লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় চট্ট ভট্টজাতি চট্টলের প্রাচীন অধিবাসী, এজন্যই হিন্দু-গণ ইহাকে চট্টগ্রাম আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। কোন কোন লেখক চট্টগ্রাম নামকরণের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহা সমীচীন নহে।

আরব দেশীয় বিখ্যাত ভূগোলবেত্তা এদৃসি ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামকে "কর্ণবুল"* লিখিয়াছেন। ইউরোপীয় প্রাচীন

---

* চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে চট্টলাধিপতির কর্ণের কুণ্ডল পতিত হইয়াছিল

ভ্রমণকারিগণ ইহাকে "পোর্টগ্রেণ্ডো" আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন।

৮৭৫ শকাব্দে আরাকাণের ইতিহাসে চট্টগ্রামের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ অব্দে আরাকাণপতি ষোলসিংহচন্দ্র চট্টগ্রাম জয় করত, প্রস্তর দ্বারা তথায় একটি জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১১৬৫ শকাব্দের একখণ্ড তাম্রশাসন পাঠে অনুমিত হয় যে, তৎকালে চন্দ্রবংশীয় দামোদর দেব নামক নরপতি চট্টগ্রামের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শ্রীপৃথ্বীধর শর্ম্মাকে কামনপৌণ্ডিয়া ও কেতঙ্গপাল গ্রামস্থিত পঞ্চ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। শ্রীমৎদত্ত নামক এক ব্যক্তি দামোদর দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রোক্ত অনুশাসন-পত্র লিখিত হইয়াছিল। দামোদরদেবের পিতৃপুরুষগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। দামোদর দেব কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজবংশীয়গণ চট্টলের রাজদণ্ড বলক্রমে গ্রহণ করেন।

সুবিখ্যাত মূর পরিব্রাজক ইবন বতোতা ১২৭২ শকাব্দে বাণিজ্যোন্নত চট্টগ্রামে উপনীত হন। সুবিখ্যাত

বলিয়া এই নদী "কর্ণফুলী" নামে পরিচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এদ্রিসির লিখিত "কর্ণবুল" শব্দটি কর্ণফুলী হইতে উদ্ভূত।

মুসলমান পীরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাত্মা ইবন বতোতা স্বীয় জন্মভূমি আফ্রিকার উত্তর প্রান্তস্থিত টেঞ্জিয়ার হইতে খানবালিক (পিকিন) নগরী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম নিবাসী সুবিখ্যাত পীর বদরুদ্দিন ১৩০২ শকাব্দে পরলোক গমন করেন। ইহার ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ইবন বতোতা চট্টগ্রামে উপনীত হন। সুতরাং বদরের সহিত ইবনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। পরিব্রাজক ইবন বতোতা বলেন, বাঙ্গালার সুলতান ফকিরোদ্দিন (আবুলমোজাফর মোবারক সাহ) সে সময়ে চট্টলাধিকারী ছিলেন, ঐ অব্দের অন্তভাগে আরাকাণ রাজ মেঙ্গদি চট্টালধিকার করেন।

১৪৩৪ শকাব্দে চট্টলের আধিপত্য লইয়া এক তুমুল কাণ্ড হইয়াছিল। যবন ও মগদিগের ভুজগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ত্রিপুরসেনানী রায় চয়চাগ কিরূপে বিজয়-বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য এবং তাহার বিখ্যাত সেনাপতি বীরবর চয়চাগের মৃত্যুর পর মহারাজ দেবমাণিক্যকে জয় করিয়া হুসনসাহার পুত্র নছরদ্দিন নছরৎ সাহ চট্টলাধিকার করেন।

বাস্তি খাঁর পুত্র পরাগল খাঁ সুলতান নছরদ্দিন নছরৎ সাহ কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত

পক্ষে পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর বাহুবলে চট্টগ্রাম হুসনি বংশের করায়ত্ত হইয়াছিল। লস্কর পরাগলের আশ্রয়ে থাকিয়া ব্রাহ্মণকুলজ কবীন্দ্র পরমেশ্বর জৈমিনির ভারত-সংহিতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা মহাভারত রচনা করেন। সেনাপতি ছুটি খাঁর সহচর কবিবর শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্ব বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থে পরাগল ও ছুটিখাঁর বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফণী নদীর তীরে পরাগল খাঁ স্বীয় বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি "পরাগলপুরে" তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরাগল যে বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "পরাগলের দীঘি" বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

সুবিখ্যাত পর্ত্তুগিজ লেখক ডি বরোস বলেন, পর্ত্তুগিজ-দিগের চট্টগ্রামে পঁহুছিবার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, আরবদেশস্থ জনৈক ভদ্রলোক দুইশত অনুচরের সহিত চট্টগ্রামে উপনীত হন। রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে একটি দুরাশা জন্মে। তিনি সেই আশায় মুগ্ধ হইয়া একটি কুঠি খুলিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দুই হইতে পঞ্চশত হইল। বণিক গৌড়েশ্বর নিকট পরিচিত হইয়া একবার উড়িষ্যাপতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি বঙ্গেশ্বরের শরীর রক্ষক সেনাদলের অধ্যক্ষ

পদে নিযুক্ত হন। তদনন্তর রাজার প্রাণবধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।" বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান নরপতিগণের ইতিহাস পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, ডি বরোস, হয় হাব্‌সি রাজ-শ্রেণীর ফিরোজ, নয় হুসন সাহকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যদিচ আমরা হুসন সাহের উন্নতির ইতিহাস অন্যরূপ অবগত আছি,* কিন্তু চট্টগ্রামের প্রতি হুসনি-বংশের প্রবল অনুরাগ দর্শনে ডি বরোসের বর্ণনা সত্যের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিবার জন্য আমাদের হৃদয় নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছে। বোধ হয় চট্টগ্রাম হইতেই হুসন সাহের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল। এজন্য তিনি বারংবার ত্রিপুর ও মগসৈন্য জয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার উপযুক্তপুত্র নছরৎ সাহ চট্টগ্রামে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বীয় পিতার প্রেতাত্মার পরিতোষ সাধন করিয়া-ছিলেন। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মৌলবি হামিদউল্লা খাঁ বাহাদুর বলেন যে, সুলতান নছরুদ্দিন নছরৎ সাহা চট্টগ্রাম জয় করিয়া কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে পশ্চিম বঙ্গ নিবাসী ভদ্রবংশীয় কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান রাজকার্য্যানুরোধে চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। নছরৎ-

* মল্লিখিত "কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারত" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (সাহিত্য, ৫ম বর্ষ, ৮০০ পৃষ্ঠা।)

সাহের অত্যাচারে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত দেশবাসী নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থলতান নছরৎসাহ যেস্থানে স্কন্ধাবার সংস্থাপন করেন সেইস্থান "ফতেয়াবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চট্টগ্রামের অপভ্রংস ভাষায় অধুনা তাহা "ফইত্যাবাজ" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ফতেয়াবাদ মধ্যে নছরৎসাহা যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "নছরৎ সাহার দীঘি" বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। নছরৎসাহের নির্ম্মিত ফতেয়াবাদের মসজিদ কালের করালগ্রাসে ধূলিস্মাৎ হইয়া-গিয়াছে।

হুসনিবংশের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা লস্কর পরাগল খাঁর পিতৃপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব হইতে চট্টগ্রামে বাস করিতেছিলেন। কবিবর শ্রীকরনন্দী, পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ এবং তাঁহাদের বাসস্থানের স্নুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। *

* আমরা সেই প্রাচীন কবির স্নললিত পদাবলী ইতিহাসে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এই কবিশ্রেষ্ঠের গ্রন্থ খানা যে মুদ্রিত হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র স্নুতরাং তাহাতে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা রক্ষা করা ইতিহাস লেখকের কর্ত্তব্য। যে হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা ১৫৭৬ শকাব্দের লিখিত, স্নুতরাং ইহার বয়ক্রম ২৪০ বৎসর হইয়াছে।

গোয়ার পর্ত্তুগিজ গবর্ণর মুনো, ডা, চোনা চট্টগ্রামে বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন, তিনি পাঁচ খানি জাহাজ, দুইশত সৈন্য এবং ডি, মেল্লোকে তাহার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া (১৪৫৭ শকাব্দে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) চট্টলে প্রেরণ করেন। তৎকালে গৌড়েশ্বর মহাম্মদ সাহ চট্টলাধিকারী ছিলেন। ডি, মেল্লো চট্টগ্রামে উপনীত হইয়া

নসরতসাহা তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসনসাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চারলোল গিরিতার পৈতৃক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাকে কি কহিব অতি॥
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত॥
ফেণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্বদিকে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন॥

২৭

সুলতান মহম্মদ সমীপে উপঢৌকন প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমত্যানুসারে তথায় বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন।

ত্রিপুরকুলতিলক বিজয়মাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার মগ নরপতি বৃষভ চিহ্ন-লাঞ্ছিত পতাকা চট্টগ্রামে সংস্থাপন করেন। তৎকালে চট্টলের আধিপত্য লইয়া ত্রিপুরেশ্বর ও আরাকাণ পতির

চতুঃষষ্ঠি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবী বিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দৈত্য বলি, কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা॥
কপট নাহিক যে তার প্রসন্ন হৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয়॥
তাহার যতগুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেতে তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটিখান॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥
ত্রিপুরনৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতে গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজবাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

মধ্যে কিরূপ অবিরত কলহ চলিতেছিল তাহা বিখ্যাত ইংরেজ ভ্রমণকারী রলফ্ ফিছ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মোগল সম্রাট আকবরের সুবিখ্যাত মন্ত্রী আবুলফজল স্বীয় আইন আকবরী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "চট্টগ্রাম সমুদ্র তীরবর্ত্তী ও পর্ব্বত মধ্যস্থিত একটি বৃহৎ বন্দর, ইহা খৃষ্টান ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিকদিগের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই বন্দর মগরাজের অধিকার ভুক্ত"। যে সময় আবুল ফাজেল চট্টল, আরাকাণের শাসনাধীন

আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভা খণ্ড মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশ ভাষায় এই কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারোক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার।
তাহান আদেশ মান্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

লিখিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে আকবরের সুবিখ্যাত রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা তুড়রমল্ল কুটিল রাজনীতি শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে সরকার চট্টগ্রাম স্বীয় জমাবন্দী ভুক্ত করিয়াছেন। রাজা তুড়রমল্লের কৃত "ওয়াশীল তুমার জমাতে" সরকার চট্টগ্রামের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা অবিকল এস্থানে উদ্ধৃত হইল।

সরকার চট্টগ্রাম—ইহার সৈন্য সংখ্যা—১০০ অশ্বারোহী ও ১৫০০ পদাতি। রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা ৩০ দাম। এই সরকারে ৭টি মাত্র মহাল। (চট্টগ্রামে পরগণা বিভাগ নাই।)

১। মালগাঁও বা তালগাঁও রাজস্ব ৫০৬০০০০ দাম। (বোধ হয় মিরেশ্বরী থানার অন্তর্গত তালবাড়ীয়া হইবে।)

২। চাটগাঁও। রাজস্ব ৬৬৪৯৪১০ দাম।

৩। দেওগাঁও। রাজস্ব ৭৭৫৫৪০ দাম। আনওয়াড়া থানার অধীন দেবগ্রাম বা দেওয়াং।

৪। সুলেমান ওরাক সেখপুর। রাজস্ব ১৫৭২৪০০ দাম।

৫। লবণের মাসুল। ৭৩৭৫২০ দাম।

৬। সহুরা। রাজস্ব ৫০৭৯৩৪০ দাম। বোধ হয় পটিয়া থানার অধীন সাকুয়াথলি হইবে।

৭। নওয়াপাড়া। রাজস্ব ৭০৩৩০০ দাম। রাওজান থানার অধীন একখানি গণ্ডগ্রাম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুবিখ্যাত পাঠান

সম্রাট সেরসাহ আধুনিক ডবল পয়সার ন্যায় এক প্রকার তাম্র মুদ্রা প্রচার করেন, তাহার নাম দাম, ৪০ দামে (সেরসাহী) ১৲ টাকা হইত। রাজস্ব সেই নিয়মে লিখিত হইয়াছে, এজন্যই বোধ হয়, রাজা তুড়রমল্ল সের সাহের জমাবন্দী নকল করিয়া স্বীয় ওয়াশীল তোমরজমা প্রস্তুত করিয়াছেন।

১৫০৫ শকাব্দে সুবর্ণগ্রামের ভৌমিক ঈশা খাঁ মছনদে আলি আকবরের সেনাপতি সাহাবাজ খাঁ কর্ত্তৃক অধিকার-চ্যুত হইয়া চট্টলে গমন করেন। তথায় তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করত সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সৈন্য দলের সাহায্যে তিনি মোগল সৈন্য ও কোচবিহারের রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয়, রাজমালা গ্রন্থে অমর মাণিক্যের সেনাপতি ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক মোগল সৈন্য জয় (৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও উল্লিখিত বর্ণনা একই ঘটনামূলক। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইতিহাসে একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। সময় সম্বন্ধীয় অসামঞ্জস্য এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। *

১৫৩২ শকাব্দে আরাকাণ রাজ পর্ত্তুগিজদিগের সাহায্যে ত্রিপুর সৈন্য জয় করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন। অমর

* *Long's Analysis of the Rajmála.* (J. A. S. B. Vol. XIX. p. 549.) and *Wise's Bara Bhuyas of Eastern Bengal.* (J. A. S. B. Vol. XLIII. part I p. 213.)

মাণিক্যের মৃত্যুর পর অন্য কোন ত্রিপুর নরপতি চট্টগ্রাম অধিকার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতে ত্রিপুরার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। অমর মাণিক্যের দুর্ভাগ্যের সহিত ত্রিপুরার সৌভাগ্য ভাস্কর চিরকালের তরে অদৃষ্টাকাশের পশ্চিম প্রান্তে ঝুলিয়া পড়িল। চট্টগ্রাম রঙ্গ-ভূমির এক অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়া শেষ হইল।

চট্টগ্রাম স্থায়ীরূপে মগরাজের কুক্ষিগত হইল। তাহার শাসন জন্য এক জন মগ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। আরাকাণপতি পর্ত্তুগিজদিগকে তথায় সংস্থাপন পুর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের সীমান্ত রক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি রাজ সরকার হইতে বেতন ও জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। তাহারা বল প্রয়োগদ্বারা নিঃস্ব প্রজা ও ইতর লোকদিগকে খৃষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিল। অনেকে দেশীয় রমণী সংযোগে এক নূতন জাতীয় জীবের সৃষ্টি করিল। সেই মন্ত্র দীক্ষিত ও মিশ্র পর্ত্তুগিজ সন্তানগণই "চাটগাঁয়ে ফেরেঙ্গি" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। মগগণ নিম্ন-শ্রেণীর বাঙ্গালি সংযোগে একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করিল। ইহারাই "দেশী মগ" বা "রাজবংশী"। কিছুকাল মগদিগের অধীনে থাকিয়া "চট্টলবাসী হিন্দু সন্তানদিগের একটি সংস্কার জন্মে; সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্যাপি তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলা বাসীদিগকে "বংদেই" (বঙ্গদেশী)

বলিয়া থাকেন। এই সময় হইতে চট্টগ্রামে “মগী” অব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

মগ ও পর্ত্তুগিজগণ সময় সময় ত্রিপুরা ও পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, দেশবাসীদিগকে জ্বালাতন করিতেছিল। বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তা ইশলাম খাঁ মস্‌হৌদি মগদিগের দণ্ড বিধান জন্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। পরাক্রান্তশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মগ শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় ১৫৬০ শকাব্দে মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পকাল অন্তে আরাকান রাজ চট্টলোদ্ধার করিয়াছিলেন।

সুলতান সুজার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করত দুর্দ্দান্ত আওরংজেব মির জুম্লাকে অতি সত্বর আরাকাণ রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ করেন। প্রতিকূল ঘটনা বশত জুম্লা সম্রাটের আজ্ঞা অবহেলা করত কোচ ও আসাম রাজ্য আক্রমণ করেন। জুম্লার মৃত্যুর পর আওরংজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তিনি বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়াই মগদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগিজদিগের জল-রণনৈপুন্য দর্শনে ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেটেবিয়া হইতে ওলন্দাজদিগের রণতরী সমূহ বাঙ্গালা পহুঁছিবার পূর্ব্বেই সায়েস্তা খাঁ উৎকোচ ও প্রলোভন দ্বারা পর্ত্তুগিজদিগকে বাধ্য করত চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কার্য্যোদ্ধার

পূর্ব্বক সায়েস্তা খাঁ আত্মপ্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন।* ১৫৮৮ শকাব্দে (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের) চট্টগ্রাম রঙ্গভূমির দ্বিতীয় অভিনেতার অভিনয় ক্রিয়া শেষ হইল। আরাকাণপতি চট্টগ্রাম হারাইলেন। ক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য ভাস্কর পশ্চিম গগনাঙ্গনে ঝুলিয়া পড়িল। ব্রহ্মসাম্রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা মহাবীর আলংক্রার তৃতীয় পুত্র হদোফায়া ১৭০৩ শকাব্দে আরাকাণ রাজ্য বিনষ্ট ও অধিকার করেন।

তোড়রমল্লের ওয়াশিল তোমরজমার ন্যায় সুজার জমা তোমরিতে সরকার চট্টগ্রামের রাজস্ব ২৮৫৬০৭ টাকা লিখিত আছে। প্রকৃত পক্ষে আকবরের ন্যায় সাহজেহান ও চট্টলের রাজস্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। আওরংজেবের রাজদণ্ডই সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে সংরোপিত হইয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার পূর্ব্বক ইহাকে "ইসলামাবাদ" আখ্যা প্রদাণ করেন। ১১২৮ বঙ্গাব্দে (১৭২২ খৃষ্টাব্দে) নবাব মুরশিদকুলি খাঁ "জমা কামেল তোমরি" নামক বাঙ্গালার রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন। তিনি বাঙ্গালা ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সরকার চট্টগ্রাম "চাকলে ইসলামাবাদ" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছে। এই চাকলায় ১৪৪টি মহাল ও তাহার রাজস্ব ১৭৬৭৯৫ টাকা লিখিত হইয়াছে। যথাঃ—

* Bernier's Travels in the Magul Empire. Vol. 1. p. 203.

চাকলে ইসলামাবাদ, সরকার চাটিগাঁ।

হাবিলি চাটিগাঁ	...	...	২১৮৫৬
জুগদা (জুগীদিয়া ?)	...	...	৩৫১৩৫
দক্ষিণকুল	...	...	২১২৩৫
বন্দর আলমগীর নগর	...	...	১৮৮২৫
ফত্তেয়াবাদ	...	...	৫৯২৩
সদ্ধনা	...	...	৪০৫০
আরঙ্গা নগর	...	...	২২৬৪
খর্দাখাঁ জাহানাবাদ	...	...	২৪১৯
ভরাযোড়া	...	...	৩০৯১
দেবং (দেয়াং)	...	...	৪৪০১
সারুয়াথলি	...	...	২১৯৭
সায়রাতমহাল	...	...	১৩১৭৭
নরসিংহআবাদ, সেনাবাদ প্রভৃতি ৬টি নিমক মহল			১৩২৯৮
১২৬টি ক্ষুদ্র মহল	...	...	৩২৫১১
			১৭৬৭৯৫

নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ যে টাকা চট্টগ্রামের রাজস্ব অবধারণ করেন, তৎসমস্তই চট্টগ্রামে ব্যয় হইত। একটি কপর্দ্দকও তৎকালে চট্টগ্রাম হইতে মুরশিদাবাদের রাজকোষে প্রেরিত হইত না। ব্যয়ের তালিকা এস্থানে প্রদত্ত হইল।

৩৫৩২ জন পদাতি সৈন্যের ব্যয়	১৫০২৫১
ফৌজদার ও সেনাপতি গণের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর	২৮০০০
রণতরীর ব্যয় ও দুইজন গোলান্দাজ দারোগার জায়গীর	২৫৪৪
	১৭৬৭৯৫

নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর উত্তরাধিকারী নবাব স্বজাউদ্দিনের সংশোধিত রাজস্বের হিসাবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত রাজস্ব ১৫৮৩৪০ টাকা দৃষ্ট হইতেছে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে চট্টগ্রামের ফৌজদার "থানাদারি" মহালের জায়গীরদারগণ হইতে একটি নূতন কর সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, তদ্দ্বারা বার্ষিক ৬৮৪২২ টাকা লাভ হইত।

কালবশে মোগলেরা সৌভাগ্যের উন্নত শিখর হইতে অধঃপতিত হইলেন। প্রবল প্রতাপ বঙ্গেশ্বরগণ ব্রিটনবাসী বণিকদিগের ক্রীড়া পুত্তল হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মির কাশেমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে স্থাপন করেন। নবাব কাশেমালি খাঁ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর দান করেন। এই সময়ে চট্টগ্রামের বার্ষিক রাজস্ব (৩৩৫১৩৫ টাকা, "সেবন্দিখরচ" ১২০০০ টাকা বাদে) ৩২৩১৩৫ টাকা ছিল। কিন্তু

অল্পকাল মধ্যেই কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ চট্টগ্রামের রাজস্ব ৪৬৬৪২৮ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। বারলেষ্ট সাহেব প্রথমতঃ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন, তাঁহার সরদার (Chief) উপাধি ছিল।

১৬৮৪ শকাব্দে (১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রামে একটি ভূমিকম্প হয়। অনেক স্থানে ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া জল ও কর্দ্দম নিঃসৃত হইয়াছিল। সেই নিঃসৃত দ্রব্যের সহিত গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যাইত। বান্দরবন নামক স্থানে একটি বৃহৎ নদী শুকাইয়া যায়। বাখরচং নামক সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানটি দুই শত লোক ও তাহাদের গবাদি পশুর সহিত সমুদ্র গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এই সময় আরাকাণে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রাচীন রাজবংশকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মরাজ হদোফায়া আরাকাণ অধিকার করেন। মগগণ ক্রমে ক্রমে আরাকাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

১৬৯৮ শকাব্দে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) পর্ব্বতবাসী চাকমা সরদার শ্রীদৌলত খাঁ এবং রামখাওন নামক অন্য একজন মগ সদাগর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তাহাদের দমন জন্য একটি যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৬৯৯ শকাব্দে কোম্পানিবাহাদুর প্রথমতঃ চট্টগ্রামের পর্ব্বত মধ্যে "খেদা" করিয়া হস্তীধৃত করেন। সেই বৎসর

প্রায় দশসহস্র মগ আরাকাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২ খৃঃ অঃ) আরাকাণ ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আরাকাণবাসী দস্যুগণ নিরীহ প্রজাবৃন্দের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন পূর্ব্বক চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকাণের শাসনকর্ত্তা সেই সকল দুষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য চট্টগ্রামের "সরদার" সাহেবকে বন্ধু ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এই সকল ঘটনা হইতে ক্রমে একটি লোমহর্ষণ ঘটনার সূত্রপাত হইতে লাগিল। একদিবসের সঞ্চিত মেঘে যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে কখনই দেশ প্লাবিত হইতে পারে না।

১৭০৬ শকাব্দে ব্রহ্মরাজ তরফুমার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার হস্তগত হয়। উভয় রাজ্য মধ্যে অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপন জন্যেই ব্রহ্মরাজ এই পত্র লিখিয়াছেন। উপসংহারে ব্রহ্মরাজ লিখিয়াছিলেন যে, "ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনোদ্দেশে আমি ৩০ জন লোকদ্বারা ৪টি গজদন্ত প্রেরণ করিতেছি।"

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনী * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চট্টগ্রামের

* Despach from the Governor General in

সীমান্ত স্থান হইতেও ব্রহ্মযুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনী সমূহে আরাকাণের শাসনকর্ত্তার অত্যাচারকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু "১১৮৬ মগি" অব্দের "৮ই জৈষ্ঠ" তারিখে—আরাকাণের শাসনকর্ত্তার লিখিত পত্রে কোম্পানির কর্ম্মচারী ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালি প্রজাবৃন্দের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। যাহা হউক এস্থানে আমরা ব্রহ্মযুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি না। চট্টগ্রামের সীমান্ত স্থান হইতে যে, এই ভীষণ অনলক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত রঙ্গাঙ্গনে যে লোমহর্ষণ নাটকাভিনয় হইয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাস পাঠকগণ স্মৃতিনয়নে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইবেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত বক্ষে যে অনল প্রজ্বলিত হয়, চট্টগ্রাম তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য চট্টগ্রামে গবর্ণমেণ্টের তিন শত সৈন্য ছিল। * তাহারা বিদ্রোহী হইয়া কারাগারের দ্বার ভঙ্গ করিয়া বন্দিগণকে মুক্ত ও

Council to the Secret Committee of the Court of Directors; dated the 23rd February, 1824.

* 2nd, 3rd and 4th Companies of the 34th Regiment Native Infantry.

রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করে। ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তাহারা ২৭৮২৬৭/৫ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপর সরকারি ফিলখানা হইতে তিনটি হস্তী লইয়া ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করে। এই সংবাদ শ্রবণ করত কুমিল্লাবাসী কর্ত্তৃপক্ষগণ ভয়ে ম্রিয়মাণ হইলেন। কিন্তু সৌভাগ্য বশত তাহারা কুমিল্লার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার পথাবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা মহারাজের আদেশ শ্রবণে ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাছাড়াভিমুখে গমন করে। গমনকালে বিদ্রোহিগণ পথি পার্শ্বস্থ জমিদারদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া খাদ্য যাচ্ঞা করিত। দুর্ব্বল ও নিরস্ত্র ভূস্বামিগণ তাহাদিগকে এক বেলার খাদ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বস্বপরিবারের প্রাণরক্ষা করিত। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীহট্টের পদাতিদলের নায়ক মেজর বিং বলিয়াছিলেন, "হারামজাদা লোককে (সেই সকল জমিদারগণকে) ফাঁসী দেনে হোগা"।

লাতু নামক স্থানে শ্রীহট্টের পদাতিদলের সহিত বিদ্রোহীদিগের একটি যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীদিগের বন্দুকের গুলিতে প্রথমেই মেজর বিং পরলোক গমন করেন। মেজর সাহেবের মৃত্যুর পর সুবাদার অযোধ্যা সিংহ জয়লাভ করিয়াছিলেন। লাতুর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিগণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে। মোহনপুর ও বিননকান্দী নামক স্থানে ব্রিটিশ

সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদিগের দুইটি যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়াছিল। মণিপুরের রাজকুমার চাইহুম (নরেন্দ্রজিৎ) * এইসময়ে কাছাড়ে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দুরাশায় মুগ্ধ হইয়া, স্বীয় সহচরবর্গকে লইয়া, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহিদলের অঙ্গপুষ্টি করিলেন। তখন মণিপুরের রাজাসন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র চারিশত সৈন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ঘোর সংগ্রামে বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়াছিল। হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক বিদ্রোহী কুকিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সেনাদলের বিনাশ সাধিত হয়।

চট্টগ্রাম মধ্যে একমাত্র নেজামপুর ব্যতীত অন্য কোন পরগণা নাই। বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে জমিদারী বিভাগও নাই। চট্টগ্রামের অন্তর্গত স্থান সমূহকে অধুনা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—তরফ, নওয়াবাদ তালুক এবং লাখেরাজ।

১। তরফ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তিন-বার চট্টগ্রামের অন্তর্গত সমস্ত ভূমি জরিপ করেন। (১৭৬৪, ১৭৮২, এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) সেই জরিপ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট

* চাইহুম অর্থ তিন বৎসর। প্রবাদ অনুসারে নরেন্দ্রজিৎ তিন বৎসর মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন।

পরিমাণ ভূমি এক একটী তরফ আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়াছিল। এক কিম্বা ততোধিক পরিমাণ তরফ এক এক জন ভূম্যধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সেই সকল তরফদারবর্গ বঙ্গদেশীয় জমিদারগণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমায় চিরকালের নিমিত্ত ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ৩৩৮১টী তরফের দশশালা বন্দোবস্ত হয়। লর্ড-কর্ণওয়ালিসের কৃপায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল তরফ চিরস্থায়ী হইয়াছিল। অধুনা কালেক্টরির তৌজিতে ৩৩৭৮টী তরফ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। নওয়াবাদ তালুক।—নওয়াবাদ শব্দের সরল অর্থ নূতন আবাদী ভূমি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এবং নূতন প্রজা স্বত্ববিষয়ক আইন (১৮৮৫ সালের ৮ আইন) বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট চারিবার চট্টগ্রামের ভূমির পরিমাপ করিয়াছেন। (৮০০, ১৮১৫, ১৮১৭-১৯, ১৮৩৫-৪৮, খৃষ্টাব্দে) এই সকল জরিপ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, তরফদারগণ জঙ্গল এবং অন্যান্য প্রকার ভূমি আবাদ করিয়া তরফের ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত অতিরিক্ত ভূমির আবাদকারিগণের সহিত মেয়াদি তালুক স্বরূপে বন্দোবস্ত করেন। ইহাই নওয়াবাদ তালুক। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৩২২৫৮টী নওয়াবাদ তালুক বন্দোবস্ত

হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেলহাউসি বারংবার জরিপ জমাবন্দী প্রভৃতির যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবার অভিপ্রায়ে নওয়াবাদী তালুকগুলিকে মকররি জমায় বন্দোবস্ত করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাইর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একজন তালুকদারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থী হন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যৎকালে লর্ড ডেলহাউসির আদেশ লিপি প্রত্যাহার করা হইল, তৎকালে দৃষ্ট হইল যে, ২৯৭৪৩টী নওয়াবাদি তালুকের মধ্যে কেবল মাত্র ৩৬০টী তালুকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূকৈসালের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়নারাণ ঘোষালের নামে জয়নগর জমিদারী সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাও নওয়াবাদের অন্তর্গত।

৩। লাখেরাজ—লাখেরাজ দুই প্রকার বহালী ও বাজেয়াপ্ত। বহালী লাখেরাজের অতিরিক্ত ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া নওয়াবাদ তালুকের রাজস্বের হার অনুসারে বন্দোবস্ত হইয়াছে।

প্রোক্ত ভূম্যধিকারিগণের অধীনে প্রধানতঃ পত্তনি, তালুক এবং এৎমাম নামক মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব দৃষ্ট হয়।

বাণিজ্য। চট্টগ্রাম চিরবাণিজ্যোন্নত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবণিকগণ প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যার্থ এস্থানে উপস্থিত হইতেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর পুর্ব্বে চট্টগ্রামের বাণিজ্য খ্যাতি ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টাব্দের

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তথায় চিন ও আরবদেশীয় বণিকগণের সমাগম হইত। পাশ্চাত্য বণিকগণ ইহাকে "পোর্ট গ্রেণ্ডা" আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন। বিনীসদেশীয় বণিক সিজার ফ্রেডিক খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন পিগু হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য চট্টগ্রামে আমদানী হইয়া থাকে। তৎকালে চট্টগ্রামই বাঙ্গালা দেশ মধ্যে রৌপ্যের প্রধান বন্দর ছিল। ১৫৫২ শকাব্দে হার্বার্ট সাহেব চট্টগ্রামকে বাঙ্গালার বাণিজ্যোন্নত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন অন্যতম প্রধান নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়া-গিয়াছেন। ১৫৬১ শকাব্দে মণ্ডলেস লুই রাজমহল, ঢাকা, ফিলিপাঠাম ও চট্টগ্রাম বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচীন কাল হইতে চট্টগ্রামে এক প্রকার অর্ণবতরি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অন্তর্বাণিজ্য অপেক্ষা চট্টগ্রামের বহির্বাণিজ্য ন্যূন ছিল বলিয়া বোধ হয় না

অদ্যাপি বাণিজ্য বিষয়ে চট্টগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গে অদ্বিতীয়। অধুনা ইহার প্রধান পণ্য দ্রব্য তণ্ডুল। কিন্তু চট্টগ্রামে যে পরিমাণ ধান্য জন্মে, তদ্দ্বারা চট্টগ্রাম কেবল আত্মরক্ষা করিতেই সক্ষম।' তাহার ভগিনী ত্রিপুরা ও নওয়াখালী তাহাকে প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল যোগাইতেছেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর হেঙ্কি সাহেব লিখিয়াছেন যে, তণ্ডুলের

প্রধান বাণিজ্য স্থানের বাণিজ্য কেবল ইউরোপীয় বণিকদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চাউল প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এবং আসিয়ার অন্তর্গত এদেন, সিংহল ও মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সমূহে চট্টগ্রাম হইতে তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে দুই প্রকার কার্পাস জন্মে। ফুলসুতা ও বেণীসুতা। ফুলসুতা শ্বেতবর্ণ ও উৎকৃষ্ট। জুম প্রণালিতে ইহারই চাষ হইয়া থাকে। বেণীসুতা ধুসরবর্ণ ইহার চাষ হয় না। ফুলের বিচির সহিত ইহার বিচি মিশ্রিত থাকায় অল্প পরিমাণ জন্মে। কাষ্টাম হাউসের বিজ্ঞাপনী পাঠে অনুমিত হয় যে, চট্টগ্রাম হইতে গড়ে ১৬ হাজার মণ কার্পাস প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামের পর্ব্বত হইতে প্রায় ৪৪ প্রকার কাষ্ঠ রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে জারুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা জাহাজ ও নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মণ লবণ বিদেশ হইতে চট্টগ্রামে আইসে। যে চট্টগ্রাম চিরকাল পূর্ব্ববঙ্গকে লবণ দান করিয়াছে, অদ্য তাহাকে লিবারপুলের নিকট লবণ ভিক্ষা করিতে হয়। অদৃষ্টদেব তোমাকে নমস্কার!!

"লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থান,
জন্মে লিবারপুলে লবণ তাহার!"

এই জেলার উত্তর সীমান্ত ফেণী, ইহাকে ত্রিপুরা ও নওয়াখালী হইতে পৃথক করিতেছে। দক্ষিণ সীমান্তে নাভী নদী আরাকাণ ও চট্টগ্রামের সাধারণ সীমা রক্ষা করিতেছে। মধ্য দিয়া কর্ণফুলী ও শঙ্খ অনন্ত ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিতেছে।

চট্টগ্রান প্রদেশ কি সুন্দর! একবার ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। কেমন সুন্দর প্রকৃতির প্রাচীর স্বরূপ মেঘমালা সদৃশ শিখরমালা উত্তর দক্ষিণে ধাবিত। চট্টগ্রামের পূর্ব্ব দিকে অভ্রংলিহ শিখর শ্রেণী আর পশ্চিমদিকে বঙ্গোপসাগরের সুনীল ফেনীল অসীম অনন্ত জলরাশি।

পর্ব্বত মধ্যে নানা প্রকার নির্ঝর, সুনির্ম্মল জলোৎস। ও লবণ-কূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথ পাহাড় নামক উচ্চ পর্ব্বতের সানুদেশে ভগবান শশাঙ্ক শেখর কৈলাস নাথ অবস্থান পূর্ব্বক প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বর দিগের অনন্তকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অনতিদূরে কলুষ নাশিনী পাতাল গঙ্গা ভোগবতী চন্দ্রশেখরের পরিচর্য্যার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাহার প্রায় ৫ মাইল দূরে "বাড়ব" নামক কুণ্ড মধ্যে হুতাশন জলের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সীতাকুণ্ড পর্ব্বত মধ্যে এক সময়ে দুইটী জ্বালামুখী দৃষ্ট হইয়াছিল।

অধুনা চট্টগ্রাম জেলার পরিমাণ ২৫৬৭ বর্গমাইল। ইহার অধিবাসী সংখ্যা ১২৯০১৬৭।

পঞ্চম অধ্যায়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিবরণ।

কাপ্তান লেউইন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী মানবদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা— "খউংতা (নদীবংশজ) ও তউংতা (পর্ব্বত্য বংশজ)।" আমরা খউংতাগণকে মগ বংশজ ও তউংতদিগকে কিরাতবংশজ বলিতে পারি। তউংতা-গণ এই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসী। তউংতাদিগের মধ্যে রিয়াংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। এজন্যই পূর্ব্ব-কালে ইহাকে রিয়াং রাজ্য বলা হইত। তৎপরে আরাকাণ-বাসী খউংতাগণ এই প্রদেশে প্রবেশ করত তউংতাদিগকে নির্যাতন ও উত্তরবাহিনী করিয়াছিল। অধুনা খউংতা এবং তউংতা বংশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন সরদারের অধীনে বাস করিতেছে। খউংতা বংশের একটী শাখা "চাক্‌মা" নামে পরিচিত। চাক্‌মা সরদারগণ প্রথমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কার্পাসকর দান করিত। ১৬৯৯ শকাব্দে চাক্‌মারাজ শ্রীদৌলত খাঁ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৭০৪ শকাব্দে তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা জানবক্স খাঁ

বার্ষিক পাঁচশত মণ কার্পাসের পরিবর্ত্তে মুদ্রা কর দান করেন। এইরূপ সামান্য কর প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল পার্ব্বত্য প্রদেশে পূর্ণ রাজশক্তি পরিচালন করিতে বিরত ছিলেন। তৎপরে কুকিদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া ১৭৮২ শকাব্দে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করেন। তদবধি ক্রমে ক্রমে চাকমা সরদারদিগের রাজশক্তি হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধারণ জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যদিচ গবর্ণমেণ্ট পর্ব্বতবাসী মানবদিগকে শাসনযন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্পেষিত করিতেছেন, তথাপি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতবাসীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। যাহারা গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিতরূপে কর প্রদান করিয়া থাকে তাহারাই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা, (১) ত্রিপুরা বা মুরং, (২) কুইমি, (৩) মুরু, (৪) খেয়াং জাতি।

২। যাহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু কোন প্রকার কর দান করে না তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যথা, (১) বঙ্জুগী, (২) পাঙ্খুজাতি।

৩। স্বাধীন জাতি সমূহ, কর প্রদান দূরে থাকুক, ইহারা গবর্ণমেণ্টের মৌখিক বশ্যতাও স্বীকার করে না, যথা কুকি (লুছাই) এবং সিন্দু। কুকি বা লুছাইদিগের বিবরণ বিশেষ

ভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত হইবে। সিন্ধুজাতি প্রধানতঃ নীল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে বাস করে। বোধ হয় প্রাচীনকালে ইহারা আরাকাণের মগরাজার দণ্ডাধীন ছিল। ইহারা একটী পরাক্রমশালী জাতি। আরাকাণ রাজ্য ব্রহ্মরাজের কুক্ষিগত হইলে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ তদ্দ্বারা ইহারা ইহাদের পিতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর বাহিনীহইয়াছিল। কুকি অধ্যায়ে ইহাদিগের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইবে।

প্রথম শ্রেণীর জাতি সমূহকে প্রধানত চারিটি শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছে। এক একটী শাখার অনেকগুলি প্রশাখা আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী এক ত্রিপুরাজাতিই পাঁচটি প্রশাখায় বিভক্ত। যথা—পুরাণ, নোয়াতিয়া, ওস্লি, রিয়াং, এবং মুরুং। প্রথমোক্ত চারিটী প্রশাখার বিবরণ প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে কেবল মুরুংদিগের কথা লিখিত হইল। আরাকাণবাসিগণ সমগ্র ত্রিপুরাজাতিকে মুরুং আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে। কর্ণেল ফেয়ার মুরুংদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "আরাকাণের জনৈক প্রাচীন নরপতি ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিয়া কতকগুলি ত্রিপুরাকে বন্দী স্বরূপ স্বরাজ্যে লইয়া যান। আধুনিক মুরুংগণ সেই সকল বন্দী ত্রিপুরার সন্তান সন্ততি। ইহারা প্রথমতঃ আরাকাণ জেলার অন্তর্গত লেমোই নদীর তীরে বাস করিত, কিন্তু ইহারা সেই-

স্থান পরিত্যগ করিয়া ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে।" মাতৃভূমির আকর্ষণ এমনই বটে। মুরুংগণ অধুনা প্রধানতঃ মাতামুড়ি নদীর তীরে বাস করিয়াছে। *

কুইনি ও মুরুজাতি আরাকাণের মগ বংশজাত। খেয়াং, ব্রহ্মদেশের পশ্চিম প্রান্তে পরাক্রমশালী খেয়াং জাতি বাস করে। ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীন খেয়াংবংশ সম্ভূত কতকগুলি লোক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাসা করিয়াছে। ইহাদেব সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

বঞ্জুগী ও পংখুজাতি এক মূল হইতে উৎপন্ন। ইহারা প্রাচীনকালে কুকি প্রদেশে বাস করিতেছিল। বোধ হয়, কুকিদিগের উৎপীড়নে ইহারা দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। তাহারা বলে "তলন্দরোক-পা" নামক জনৈক পরাক্রান্ত সরদার তাহাদের আদি পিতা। ইনি ঈশ্বরের কন্যা বিবাহ করেন। তাহাদের দুই পুত্র হইতে উল্লখিত জাতিদ্বয়ের উৎপত্তি।

* কর্ণেল কেয়ার মুরুংদিগের ইতিহাস তাহাদিগের নিকট যেরূপ শ্রুত হইয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি পরিশিষ্টে মরুং ভাষায় কয়েকটি শব্দ লিখিয়া দিলাম। যাহারা ত্রিপুরা ভাষা অবগত আছেন, তাঁহারা ইহার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, মুরুংদিগের কথিত, তাহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সত্য কিনা। (those acquainted with

তাহাদের মতে দুইটি দেবতা আছেন, এক জনের নাম "পতৈন" ইনিই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইনি পশ্চিমদিগে বাস করেন। রজনীতে দিবাকর তাহার আশ্রমে যাইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দেবতার নাম "খোজিং"। ব্যাঘ্রজাতি খোজিংদেবের পালিত কুকুর। এজন্যই ব্যাঘ্র জাতি তাঁহাদের প্রভু সন্তান (বঞ্জুগী ও পংখু) বর্গের কোন অনিষ্ট কামনা করে না। এই দুই জাতির বিশ্বাস অনুসারে মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর একটি বৃহৎ পর্ব্বতে গমণ করে। সেই বৃহৎ পর্ব্বতই মানবজাতির সূতিকা গৃহ।

বিবাহের পুর্ব্বে বঞ্জুগী ও পংখুজাতি স্ত্রী পুরুষগণ নির্ভাস্ত সেচ্ছা বিহার করিয়া থাকে। বিবাহের পর কোন রমণী পরপুরুষ উপগত হইলে, তাহার কর্ণ ছেদন করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু পরপত্নীগামী পুরুষের কোনরূপ দণ্ড হয়না। আচার ব্যবহার দ্বারা এই দুইটী জাতি কুকিদিগের নিকট সম্পর্কীত বলিয়া বোধ হয়। বঞ্জুগী পংখুজাতির লোক সংখ্যা বোধ হয় ৩।৪ সহস্রের অধিক হইবেনা।

তউংতা অর্থাৎ কিরাতবংশের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করাই আমাদের প্রধান অভিপ্রায়। সুতরাং থউংতাদিগের

---

the language of the Tipperah tribes will be able to decide whether the tale the Mroongs tell of their descent is correct or not.

সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছুই লিখিত হইলনা। আমাদের বিবেচনায় বঞ্জুগী ও পংখুজাতি তউংতা বংশসম্ভূত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তউংতা বংশের প্রধান শাখা কুকিদিগের বিবরণ লিখিত হইবে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্ত প্রদেশে সিন্দু নামক একটী পরাক্রামশালী জাতি বাস করে। তাহাদের সহিত এই গ্রন্থের বিশেষ কোনরূপ সংশ্রব নাই।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট ক্রমে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সীমা রেখা প্রসারিত করিতেছেন, তদনুসারে এই জেলার আধুনিক পরিমাণ ৬ সহস্র বর্গমাইল হইতে অধিক লিখিত হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কুকিজাতির বিবরণ।

বাঙ্গালার সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে যে সকল অনার্য্যজাতি বাস করে, তন্মধ্যে কুকিগণের ন্যায় হিংস্র মানব অতি বিরল। বঙ্গবাসীগণ ইহাদিগকে নরখাদক বলিয়া অবগত আছেন। যদিচ অধুনা ইহারা নর মাংশ ভক্ষণ করে না, কিন্তু ইহাদের নরহত্যা প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে

ইহাদিগকে রাক্ষস আখ্যা প্রদান করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের পার্শি ভ্রাতাগণ যেরূপ আমাদিগকে "হিন্দু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালিগণ এই রাক্ষশ বৃত্তি পরায়ণ জাতিকে "কুকি" আখ্যা দ্বারা আখ্যাত করিয়াছেন। কাছাড়বাসীগণ ইহাদিগকে "লুছাই" বলিত। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ কাছাড়ীদিগের নিকট "লুছাই" শব্দটি গ্রহণ করত তাহাকে "লুসাই" করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাচীন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্ট সমূহে "লুসাই বা "লুছাই" শব্দ দৃষ্ট হয় না।* কাছাড়বাসীগণ যে কুকি সম্প্রদায়কে লুছাই বলিত তাহাদের জাতীয় সাধারণ নাম "খচাক"

পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্য, পশ্চিমে ত্রিপুরা, ও চট্টগ্রাম উত্তরে প্রাচীন কাছাড় ও মিতাই ভূমি, দক্ষিণে আরাকাণ। ইহার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশই এই দুর্দ্দান্ত জাতির নিবাস ভূমি। ইহার পরিমাণ দশ সহস্র বর্গমাইলেরও অধিক। প্রাচীনকালে সমগ্র কুকিজাতি প্রবল বিক্রম ত্রিপুরেশ্বরদিগের অধীনতা নিগড়ে বদ্ধ ছিল। মুসলমান ও মগদিগের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া, বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ত্রিপুরেশ্বগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখনই এই দুর্দ্দান্তজাতি মস্তকোত্থলনের

* Asiatic Researches. Vol II. p. 187. and Vol VII p. 183.

সুযোগ প্রাপ্ত হইল। অধুনা কুকিগণ মধ্যে কতকগুলি স্বাধীন, কতকগুলি ত্রিপুরা ও মণিপুরপতির অধীন, অবশিষ্ট কুকিগণ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনতা নিগড়ে বদ্ধ রহিয়াছে।

কুকিজাতি অনেকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী সমূহের সংখ্যা ও তাহার নাম অদ্যাপি বিশুদ্ধ ভাবে কোন লেখক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমরা শ্রেণী সমূহের নাম যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম যথা,—

পইতু, পাইতে, ফুন, ফুনতেই, লেনতেই, রাংচন, রাংচিয়ে, বুরদইয়া, হ্রালতেই, জংতেই, সওয়ালই, পওয়াকৃতু, ধুন, অমড়ই, চোটলং, চন্‌লেল, পাট্‌লই, বেত্‌লু, বাল্‌তে, বলতে, বিয়েতে, থরেং, বাইফেই—ইত্যাদি। শ্রেণীসমূহের ভাষা মূলত এক। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্ম্মণ লিখিয়াছেন "মণিপুরী ভাষার সহিত কুকি ভাষার ও শব্দের বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও মণিপুরী ভাষার স্বর ও গঠনের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। কুকিদিগের উচ্চারিত ভাষাও কণ্ঠ, তালু, দন্তোষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিঘাত জনিত সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ আবশ্যক হয়, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই মূর্দ্ধণ্যবর্ণ উচ্চারণের ন্যায় উচ্চারণ হইয়া থাকে। কুকিদিগের ভাষায় মাধুর্য্য কোমলতা এবং ওজস্বিতা প্রভৃতির পারিপাট্য আছে।" মিতাই জাতির সহিত যে কুকিদিগের নৈকট্য সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে

উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই দুই জাতির ভাষায় শব্দ ও উচ্চারণের সাদৃশ্য বিচিত্র নহে। কুকি ভাষা নিরক্ষর, কিন্তু ইহা বিস্তৃত এবং শ্রবণ মনোহর। * ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহের মধ্যে যেরূপ হিন্দী প্রধান, ইয়োরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষার প্রাধান্য, বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে তদ্রূপ ত্রিপুরা ভাষার প্রাধান্য পরিলক্ষীত হইয়া থাকে। কাপ্তান লেউইন সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।†

কুকিগণ কিরাত বা লৌহিত্য বংশজ। কিন্তু অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি হইতে ইহাদের আকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক দৃষ্ট হইতেছে। অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতি হইতে ইহাদের বর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন. কিন্তু ইহাদের নাসিকা উন্নত, ওষ্ঠ পাতল। তাতার বা মোঙ্গলীয়ান জাতি সাধারণের ন্যায় ইহাদের মুখ মণ্ডল চাপা নহে। ইহার কারণ আমরা এরূপ স্থির করিয়াছি যে, বাঙ্গালী রমণীগণের সংযোগে এই জাতির আকৃতি ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে।‡ ইহাদিগের মধ্যে ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু গুম্ফ বিরাজিত সুন্দর মুখ মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদের প্রতিবেশী অন্য কোন জাতিতে তদ্রূপ পরিলক্ষীত হয় না।

---

* ত্রিপুরা যুবরাজ রাধাকিশোর দেব বাহাদুর ১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যবাসী পইতু কুকিদিগকে বঙ্গীয় বর্ণমালা ও ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথম যত্নবান হন।

† Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 99.

‡ কাপ্তান লেউইন লিখিয়াছেন যে, They differ

"কুকিদিগের একতা এবং সমাজ বন্ধন অতীব প্রশংসনীয়। কোন ব্যক্তি সমাজিক নিয়মের কোন অংশ উপেক্ষা করিলে, সমাজ তাহার উপর কঠিন শাসন প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘনকারী সেই শাসন সহ্য না করিয়া পারে না। প্রতি সম্প্রদায়ের রাজা; অথবা প্রত্যেক বাড়ীর প্রধান লোকই (সরদার) সেই সেই সমাজের অধিপতি, কিন্তু অধিপতি হইলেও সমাজের অপরাপর প্রধান প্রধান লোকের অজ্ঞাতে ও অমতে কোন লোকের কি সমাজের

entirely from the other hill tribes of Burman or Arracanese origin, in that their faces bear no marks of Tartar or Mongolian descent. They are swarthy in complexion and their cheeks are generally smooth among the Howlong tribe. However, one meets many men having long bushy beards. I should be inclined to attribute this to a mixture of Bengali blood, from the many captives they have from time to time carried away কিন্তু উপসংহারে লেউইন ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন, but I have seen old men, white bearded, and we possess no record of any Lhossai raids so long as even 30 or 40 years ago." আমরা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছি যে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে হইতে কুকিজাতির অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। তদারধি বাঙ্গালি রমণীসংযোগ কুকিবংশ বৃদ্ধি হইতেছে।

কোন নিয়মের উপর নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এজন্য কুকিদিগের সামাজিক বন্ধন নিতান্ত দৃঢ় রহিয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন কি সামাজিক কোন ব্যক্তির উপর সমাজ সম্পর্কীয় কোন শাসন প্রয়োগ করিতে হইলেও সেই সমাজের মতামত ও অভিপ্রায় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয়।"

সুসভ্য দেশ সমূহের প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সভাপতির ন্যায় কুকি রাজগণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমর কার্য্যে তাঁহার ক্ষমতা অসীম।

"কুকিদিগের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশলও আবশ্য প্রশংসনীয়। বাস্তবিক ইহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী সামান্য ব্যয় সাধ্য ও অতীব সুন্দর, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। কুকিগণ কেবল পর্ব্বতস্থ স্বভাবজাত বাঁশ ও সেই বাঁশেরই বেত দ্বারা এবং সেই বাঁশেরই পাতা দ্বারা তাহার ছাউনী দিয়া বাস গৃহ নির্ম্মাণ করে। প্রায় প্রত্যেকের গৃহই সুদীর্ঘ ও বিস্তৃতরূপে প্রস্তুত হয়; কিন্তু গৃহের ভিটাগুলি মৃণ্ময় নহে, এবং তাহাও সেই অরণ্যজাত বাঁশ দ্বারাই অতি উচ্চরূপে মাচা নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। চিত্র বিচিত্র বংশ শলাকা দ্বারা ঐ সমস্ত গৃহের সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়। কোন কোন গৃহের অভ্যন্তরে অনেক প্রকোষ্ঠ থাকে এবং উহারই মধ্যে একটী অভ্যাগতের অবস্থান জন্য নির্দ্ধারিত হয়। গৃহগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও

নিরন্তর বাস করিবার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, এবং এক এক গৃহে বিস্তর লোক বাস করে। কোন গৃহস্থেরই একখানার অতিরিক্ত গৃহ থাকে না এবং এক এক গৃহে ৩০।৪০ জন পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বাস করে।

"কুকিগণ অধিকাংশ স্থলেই বহু লোক একত্র হইয়া গভীর বংশ বনাবৃত অরণ্যাণী পরিষ্কার করিয়া বাস করে। বাস্তবিক উহাদের এক একটী বাড়িই গ্রাম বিশেষের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এতগুলি লোক যে একস্থানে একই অবস্থায় পরস্পর প্রেম প্রণয়ে ও নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে, ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয়।

"কুকিগণ গভীর অরণ্যাণী কাটিয়া কিছুকাল নিপতিতাবস্থায় রাখে, এবং উহার সমস্ত শুকতা প্রাপ্ত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উহাতেই নানাবিধ শস্য বীজ একত্র করতঃ পর্য্যায়ক্রমে বপন করিয়া দেয়। কিছুকাল পর ঐ সমস্ত বীজের অঙ্কুর উদ্‌গম হইলে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যথাকালে শস্য সংগ্রহ করে। এইরূপে উৎপন্ন শস্য মধ্যে ধান্য, তিল ও কার্পাসই প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য অনেক প্রকার শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে।" ইহারা প্রকৃত পক্ষে মাংসাশী, সুতরাং ইহাদের শস্যের প্রয়োজন অতি অল্প।

"যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণ করিলে মৃত্যু বা শরীরের কষ্ট ও আকাস্মিক কোন রোগাদি উপস্থিত হয় না,

প্রায় উহার সমস্তই কুকিদিগের আহার্য্য। কেবল অগ্নিতে ঝলসাইয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে জলযোগে সিদ্ধ করিয়া উদরাগ্নির আহুতি প্রদান করে। ইহাদিগের মধ্যে দধি, দুগ্ধ বা ঘৃতের ব্যবহার নাই। কদাচিত কেহ কেহ দধি দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু সমাজে উহার আদর অতি অল্প।

"ইহাদিগের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে কোন মসলার প্রয়োজন হয় না। কেবল খাদ্যোপযোগী দগ্ধ বা সুসিদ্ধ হইলেই লবণ সংযোগে উদরাসাৎ করিয়া ফেলে। আহার্য্য মধ্যে টাটকা বা সোরা (শুষ্ক) মাংসই সমধিক আদরণীয় এবং প্রথম শ্রেণীর খাদ্য। মৎস্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। তদ্ভিন্ন আর সমস্তই নিকৃষ্ট আহার্য্য। প্রথম শ্রেণীর আহার্য্য চতুষ্পদি প্রাণি মধ্যে মৃগ, শশক, হস্তী, অশ্ব, বানর বিড়াল এবং সরীসৃপ জাতি মধ্যে অজাগর, সাপ, গোসাপ, ভেক ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ আহার্য্য মধ্যে গণ্য। এই সমস্ত মাংস ভিন্ন ইহারা প্রায়শঃ অন্নাদি আহার করে না। কুকিজাতি মদিরাপানে নিতান্তই আশক্ত।"

ইহাদের গৃহপালিত পশু গবয় ও ছাগ বৃহৎ ভোজ উপলক্ষ বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করে। ইহারা কুকুরকে তণ্ডুল ভোজন করাইয়া তখনই সেই কুকুর বধ করত তাহাকে অগ্নিতে বিশেষ রূপে দগ্ধ করিয়া তাহার উদরস্থিত সুসিদ্ধ তণ্ডুল মিষ্টান্নের ন্যায় ভোজন করিয়া

থাকে এবং ইহা তাহাদের মধ্যে একটি উপাদেয় খাদ্য। অধুনা কুকিগণ নরমাংশ আহারী নহে কিন্তু তাহারা প্রথম যে মনুষ্যকে বধ করে তাহার যকৃতের কিয়দংশ ভোজন করিয়া থাকে।

"কুকিজাতির স্ত্রীলোক অনেকাংশেই স্বামী অপেক্ষা স্বাধীন। পুরুষগণ প্রায় সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কুকিরমণীগণ শরীরের সাজসজ্জা করিতে ভালবাসে। বস্তুতঃ সর্ব্বদাই কেশবিন্যাস, গলদেশে নানাবর্ণ বিরঞ্জিত প্রস্তরমালা দোদুল্যমান থাকে। তাহারা হস্তে গজদন্ত বা মহিষাদির শৃঙ্গ বিনির্ম্মিত চুড়ি ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের আড়ম্বর নাই। স্বজাতিরমণীগণ নির্ম্মিত নাতি দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কটিদেশ আবৃত ও কখন কখন বক্ষ আবরক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বক্ষদেশ আবরণ করিয়া রাখে। কিন্তু অধিক সময়েই সেই আবরণ বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তাহারা বিস্মৃত হইয়া থাকে।

"কুকীরমণীগণ অধিকাংশই গম্ভীর প্রকৃতি। যাহারা সুন্দরী তাহাদের বর্ণ সুকোমল। কিন্তু তাহাদিগেরও কর্ণলতিকা বিস্তৃত রন্ধ্র সমন্বিত হওয়ায় দেখিতে তত প্রীতিকর বোধ হয় না। ব্যভিচার দোষ তাহাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না।" কুকিজাতি যদিচ কখন কখন সামান্য আকারে বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শরীরের কোন কোন অংশ আচ্ছাদন করে বটে কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে ইহারা উলঙ্গ জাতি আখ্যা দ্বারা বিশেষ রূপে পরিচিত হইতে পারে।

"কুকিগণ মধ্যে অতি অল্পই ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে। সামাজিক নিয়মের কাঠিন্য বশতঃই কেহ ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইতে সাহস পায় না। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার বিশেষ দোষাবহ নহে। বিবাহিত পুরুষ কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রী, অন্যের সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হওয়ার কথা প্রকাশ হইলে সমাজে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। তজ্জন্যই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কোন স্ত্রী কি পুরুষ সহজে পরস্পরের পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত কিম্বা বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন না হইলে ব্যভিচার দোষে সন্নিবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় না। অবিবাহিত পুরুষ কি অবিবাহিতা স্ত্রী এই উভয় মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হইলে প্রায়ই তাহারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং পরে সমাজের নিয়মানুসারে বৈবাহিক আচার ব্যবহার সম্পন্ন করিয়া লয়। কিন্তু পরস্পর মধ্যে সম্বন্ধের নৈকট্য প্রতিবন্ধক থাকিলে ঐরূপ প্রণয়েও বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না, এবং উহা অসিদ্ধ বিবাহ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। বিবাহ কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। বৃহৎ ভোজ ও অপরিমিত মদিরা পানই বিবাহোৎসবের প্রধান অঙ্গ। কুকিগণ মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইলে সহজে কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু অনিবার্য্য

কারণে একজন অন্যজনকে পরিত্যাগ করিতে কি নিজেই পরিত্যক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে, সমাজে সেই বিষয় উত্থাপিত হয় এবং সামান্য কারণ ঐ পরিত্যাগের বা পরিত্যক্ত হওয়ার মূল হইলে সমাজ তাহার প্রতিরোধ করিয়া দেয়। তাহাতেও পরস্পর মধ্যে অসামঞ্জস্য হইয়া উঠিলে তন্মধ্যে যাহারই পরিত্যাগ পাইবার ইচ্ছা প্রবল, তাহাকেই সামাজিকগণকে একবার ভোজ এবং বিরুদ্ধ পক্ষের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইলেই ঐ বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদ ও পুনরায় অন্যের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রী পুরুষ মধ্যে পরস্পরের প্রণয় জন্মিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়। কখন কখন পরস্পরের অভিভাবক ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দেয়।

"কুকিগণ নিরীশ্বরবাদী নহে। অথচ কোনও নির্দ্দিষ্ট দেব দেবীর বা ঈশ্বরের উপাসনা করাও তাহাদের কুলাগত রীতি নাই, কিন্তু তাহারা মানে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবদেবী ও জগৎস্রষ্টা একজন ঈশ্বর আছেন। তাহারা বলে যে, ঈশ্বর অনিমা, লঘিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্য মহিমায় আবশ্যকানুসারে এই বিশ্বসংসারের সমস্ত স্থানেই বিচরণ ও প্রাণীদিগের হিতাহিত ও শুভাশুভ সাধন করিয়া থাকেন, এবং সেই ঈশ্বর ও দেবদেবীকেই কুকীগণ "পাতিএন্" * বলিয়া উচ্চারণ করে, ও মানিয়া থাকে।

* বঙ্গুগী ও গংখুঙ্গ্‌জাতির ঈশ্বর "পতৈন"।

"নিরন্তর সুখস্বচ্ছন্দের কামনায় সংবৎসর মধ্যে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এবং কোনও পীড়াদি প্রশমনার্থ সময়ে সময়ে ছাগ, কুক্কুট, বরাহ ও মহিষাদির বলিবিধান দ্বারা কোনও সুবৃহৎ বৃক্ষ বা পর্ব্বত কিম্বা নদনদী অথবা বংশ-বিনির্ম্মিত চিত্রিত শলাকা সংযোজিত আসন নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ ভেদে সংজ্ঞা বিশেষে দেবদেবী কল্পনায় ও উদ্দেশ্যে "পাতিএনের" পূজা বিধান ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শুভাশুভ ও হিতাহিত কল্পনা করে। সুতরাং ইহাই কুকিদিগের উপাসনা বা অর্চ্চনার পদ্ধতি, তদ্ভিন্ন আর অন্যরূপ উপাসনার পদ্ধতি ও নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই।

"কুকিগণ মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার আত্মীয় স্বজাতিগণ তাহাকে অগ্নিসাৎ করিয়া সংস্কার করে এবং তাহার স্বর্গার্থ তদুদ্দেশে সামাজিক সকলকে প্রচুর মাংস মদি-রাদি দ্বারা ভোজ প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু রাজগণ মধ্যে কেহ পরলোক গমন করিলে তৎক্ষণাৎ উহার অগ্নিসংস্কার না করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত করত মৃতদেহ শুষ্ক করিয়া যত্নের সহিত দীর্ঘকাল রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু রক্ষার অযোগ্য হইয়া উঠিলে মহাসমারোহে অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলে, অথচ পর্ব্বে পর্ব্বে সেই মৃতব্যক্তির উদ্দেশে মাংস, মদিরাদি উৎসর্গ করিয়া উদরসাৎ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান ও মগদিগের সহিত

অবিরাম কলহ করিয়া যখন ত্রিপুরেশ্বরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তৎকালে ত্রিপুর রাজবংশধরগণ আত্ম-কলহ দ্বারা রণদুর্ম্মদ কুকিদিগকে অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার পন্থা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। ১১৪৭ ত্রিপুরাব্দে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) যৎকালে সুবা রুদ্রমণি ঠাকুর, মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্য ও মুসলমান ফৌজদারকে কারারুদ্ধ করিয়া, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন, তৎকালে রণদুর্ম্মদ কুকিগণ তাহার সহায় হইয়াছিল। তদবধি ইহাদের অত্যাচারের সূত্রপাত হয়। সেই সময় হইতে যখনই ইহারা কোনরূ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই পার্ব্বত্য-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করত তাহাদের রাক্ষসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কুকিগণ বারংবার সমসেরগাজির সহিত আহবে লিপ্ত হইয়াছে। যদিচ সমতল ক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধে কুকিজাতি তাহাদের বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু এই সময় হইতে ইহারা পর্ব্বত মধ্যে আপনাদের বল বিক্রম প্রকাশ করত বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে কুকিগণ এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে মহারাজ

রামগঙ্গা মাণিক্য সপরিবারে তাঁহাদের দ্বারা নিহত হইতেন। ত্রিপুর বংশের যে শাখা এক্ষণ ত্রিপুর সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত রূপ সাহায্য না করিলে এই শাখার চিহ্নও বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে ত্রিপুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বের অন্যরূপ মীমাংসা হইত।*

১২৩৪-৩৬ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বারংবার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে ত্রিপুরেশ্বর উত্তর-পূর্ব্বসীমান্তে তাঁহাদের সীমান্ত প্রদেশ সুদৃঢ় করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। আধুনিক কাছাড় জেলার অন্তর্গত হাইলাকান্দী ও মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত থাঙ্গম নামক কুকিগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া তিনি দাবি করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে মণিপুরপতির সহিত ত্রিপুরেশ্বরের কলহের উপক্রম হইলে গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল যে, থাঙ্গম, থচাক কুকিদিগের প্রাচীন বাসভূমি, ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে সমসূত্ররেখায় ১৬০ মাইল দূরে, পূর্ব্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত, এই গ্রাম মণিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও পূর্ব্বে ইহা ত্রিপুররাজছত্রের

* *Mackenzie's North-East Frontier. P. 274.*

অধীন ছিল। কিন্তু ৪।৫ বৎসর যাবৎ মণিপুরপতি সেই গ্রামে একটি থানা স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট "দখল কারের দখল" স্থির রাখিয়া থাঙ্গম নামক স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে ত্রিপুরেশ্বরকে নিষেধ করিলেন। * হাইলাকান্দী পরগণা লইয়া বিগত শতাব্দীর অন্ত্যভাগেও কাছাড়পতির সহিত ত্রিপুরেশ্বরের বিরোধ চলিতেছিল। † কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হাইলাকান্দীর দক্ষিণদিকস্থ সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিয়াছেন ‡ তদনুসারে আধুনিক কাছাড় জেলার অধীন বর্ণারপুর প্রভৃতি অনেকগুলি চাক্ষেত্র ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত হইতেছে।

* *Mackenzie's North-East Forntier. P. 277.*

† *Wilson's Burmese War. Appendix P. XXVII.*

‡ From the sources of the Jeeree River along the western bank, to its confluence with the Borak ; thence south on the western bank of the latter river to the mouth of the Chikoo (or Tipai) nullah, which *marks the triple boundary of Manipur, Cachar and Tripurah.* On the south the limits have never been accurately defined, and we only know that on this side the line is formed

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে "সাঁতার না জানিলে বাপের পুকুরে ডুবিয়া মরিতে হয়।" রাজ্য এক সময় বৃহৎ ছিল সত্য, কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে রাজ্য বৃহৎ থাকে না, ক্রমে সীমারেখা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যে দিবস লক্ষ লক্ষ বীর পুরুষ ধন্যমাণিক্য ও বিজয় মাণিক্যের বিজয়ী পতাকা আকাশ মার্গে উড্ডীন করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত, বহুকাল হইল সেই দিবস গত হইয়াছে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন খচাকদিগের বাসভূমি

---

by the northern foot of lofty mountains inhabited by the Poitoo Kookies and by *wild and unexplored tracts of territory subject to Tripurah.* This densely wooded and mountainous region appears to commence at a distance of between 40 and 50 miles from the southern bank of the Soormah.

(*Pemberton's Report. 1835.*)

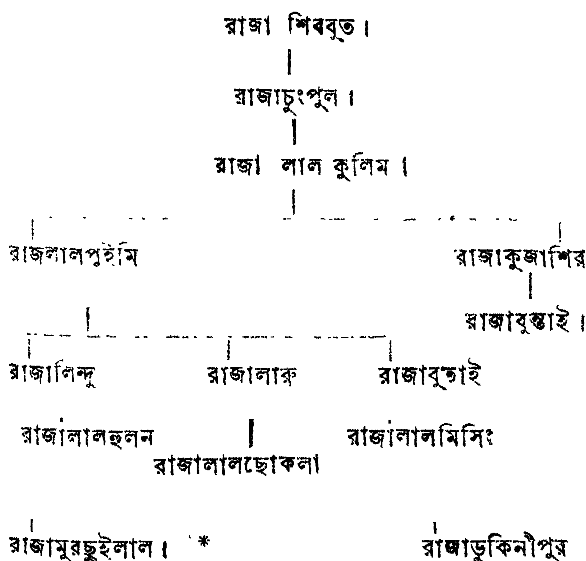
এসম্বন্ধে সার আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জি লিখিয়াছেন:—

The southern extremity of the Suddhashur-Hills was the south-east corner of Cachar. It would appear from this that the narrow hilly tract running down betwen Hill Tipperah and Manipur, and represented in our most recent maps as part of Cachar, was in Pemberton's time considered to be part of Hill Tipperah.

লইয়া মণিপুর পতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় তৎকালেও চারিসহস্র সৈন্য হনুমানমূর্ত্তিলাঞ্ছিত ত্রিপুরপতাকা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। মহারাজ কাশীচন্দ্র এবং মহারাজ কৃষ্ণকিশোর বিলাস সাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া মণিপুরী “লাইছাবী” দ্বারা রাজঅন্তঃপুর পরিপূর্ণ করিলেন। উপযুক্ত অর্থব্যয় করিয়া সৈন্য রক্ষা নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান হইল। চাকলে রোসনাবাদ ঋণজালে বদ্ধ করিয়া কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বিলাস সাগরে স্বর্ণরাশি ঢালিলেন। সুশিক্ষিত সৈন্যের অভাবে রাজ্যসীমা সঙ্কুচিত হইতে চলিল।

ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে পইতু কুকিগণের বাস। যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয়ের শোণিত অদ্যাপি শুষ্ক হইয়া উঠে তাহার অধিকাংশই পইতু কুকি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে তাহাদের একটি প্রধান শাখার বংশাবলী প্রদান করিতেছি। বিগত শতাব্দীর অন্ত্যভাগে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে, পইতু কুকির প্রধান সরদার শিববুক্ত পঞ্চবিংশতিসহস্র কুকি পরিবার লইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহার উত্তর পুরুষগণ মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন রহিয়াছে। অন্যেরা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুসারে কর প্রদান করিতেছে। যাহারা স্বাধীন রহিয়াছে, তাহাদের কৃত অত্যাচারে জ্বালাতন

হইয়া গবর্ণমেণ্ট কৌশল পূর্ব্বক তাহাদের স্বাধীনতা-রত্নহরণ মানসে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।



* ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ ইহাকে Gnoor-shai-lon, এবং Mischoey Looee প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা পরিচিত করিয়াছেন। বোধ হয় এজন্য তাঁহারা ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে ইহার সম্বন্ধে বিশুদ্ধ উত্তর প্রাপ্ত হন নাই। ইতিহাস লেখক স্বয়ং মুরছুই লালকে দর্শন করিয়াছেন। ইনি ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ সামন্ত নরপতি।

আমরা আরও কতকগুলি বিখ্যাত কুকি সরদারের বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এজন্য উল্লেখ করা হইল না।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে (১২৩৬ ত্রিপুরাব্দে) কুজাশিরের পুত্র রাজা বুন্তাই শ্রীহট্টবাসী কতকগুলি কাঠুরিয়াকে পর্ব্বত মধ্যে বধ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজবংশজ রামকান্তঠাকুর ৩।৪ শত ত্রিপুরা কুকি লইয়া খণ্ডল নিবাসী মেরকুচৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করেন। তিনি উক্ত চৌধুরীর বাসভবন ভস্মীভূত ও ১৫জন লোককে বধ করিয়া পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের নায়কদিগকে ধৃত করিবার জন্য লিখিলেন, ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাদের চিরঅভ্যস্ত "বাঁধাবোলে" উত্তর করিলেন যে "ইহারা তাঁহার প্রজা নহে।" *

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের (১২৫৩ ত্রিপুরাব্দে) অন্ত্যভাগে বিখ্যাত কুকি সরদার রাজালারু কাল কবলিত হন। তাহার উপযুক্ত পুত্র লালছোকলা পিতার ঔর্দ্ধ দৈহিক কার্য্য উপযুক্ত রূপে সম্পাদন করিতে মনস্থ করিলেন। এরূপ একজন পরাক্রমশালী বীরের শ্রাদ্ধ কার্য্য কখনই নরমুণ্ড ও দাস দাসী ব্যতিত সম্পন্ন হইতে পারেনা। বিশেষত ব্রিটীস রাজ্যের অস্ত্রশস্ত্র

* *Mackenzie's North-East Frontier P. 280.*

বিহীন অধিবাসী না হইলে নরমুণ্ড কিম্বা দাস দাসী সংগ্রহের সুবিধা হয় না। সুতরাং বীরবর লালছোকলা পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া ১৮৪৪খৃষ্টাব্দের ১৬এপ্রিল নিশাবসানে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় পরগণার মধ্যবর্ত্তী কচুবাড়ী নামক গ্রাম আক্রমণ করত ২০টি নরমুণ্ড এবং ৬টি দাস দাসী সংগ্রহ করিলেন। শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট এই লোম হর্ষণ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার কারীগণকে ধৃত করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে লিখিলেন, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর দিগের চিরঅভ্যস্ত প্রথানুসারে তদুত্তরে লিখিলেন যে, "ইহারা তাঁহার অধীন নহে।" কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অত্যাচারী কুকিগণকে ধৃত করিবার জন্য মহারাজকে লিখিলেন, অগত্যা মহারাজ বাধ্য হইয়া একজন দারগাকে ১০জন ববকান্দাজের সহিত লালছোকলাকে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎসংবাদ শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইহাকে একটি প্রহসন বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন যে আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রকৃত অত্যাচারীকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ না করিলে ব্রিটিস সৈন্যদল তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচারকারীকে

ধৃত করিবে। এই ঘটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ৪জন কুকি অপরাধীকে ২৭জন সাক্ষীর সহিত শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল যে, তাহারা ইহার কিছুই অবগত নহে। এই ঘটনায় কিছু কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে নিরূপিত ১লা ডিসেম্বরে কাপ্তেন ব্লেকউড একদল পদাতি সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত লাল ছোকলার গ্রাম অবরোধ করিলেন।

ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৪ঠা ডিসেম্বর লালছোকলা কাপ্তেন ব্লেকউডের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু প্রবন্ধলেখক বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন যে, ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি (কেলি ফেয়িঙ্গী) লালছোকলাকে ধৃত করিয়া ব্লেকউডের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে লাল ছোকলার বিচার হয়। সেই বিচারে লাল ছোকলা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজবংশজ ভগবানচন্দ্র ঠাকুর একদল কুকি সংগ্রহ করত খণ্ডলের অন্তর্গত একখানি গ্রাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত স্থানে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, দেড়শতের অধিক প্রজা তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণ-

গোচর হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাহার রাজ্য মধ্যে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার, গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই। কিছু কাল এই কথা লইয়া গণ্ডগোল চলিয়াছিল। অবশেষে কাপ্তেন ফিসারের মানচিত্র দ্বারা ঘটনা স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত নির্ণীত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। তৎপর মহারাজ এই দুর্ব্বৃত্ত-দিগের দমন জন্য আর কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিন্দু, খচাক ও লুসাই প্রভৃতি কুকিগণ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছাড় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অনেক গুলি লোকের প্রাণ সংহার ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময় কুকিগণ প্রায় ৪২ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের দ্বারা এইরূপ জ্বালাতন হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন কর্ণেল লেষ্টার সৈন্য লইয়া কাছাড় হইতে কুকিদিগের বাসস্থানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব্বদিক হইতে প্রায় ৪০০ কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং কাছাড়ের দক্ষিণ-দিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আর একদল কুকি শ্রীহট্টের

অন্তর্গত লাতু থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের চিরঅভ্যস্ত নরহত্যা, গৃহ দাহ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া পলায়ন করে। লাতুর নিকটবর্ত্তী স্থান ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মহারাজ বিশেষতর্ক উত্থাপন করিলেন, এবং আক্রমণকারী কুকিগণ ও ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল।

কর্ণেল লেষ্টারের যুদ্ধ যাত্রার ফল মোটের উপর এই হইয়াছিল যে, বিখ্যাত কুকি সরদার স্থকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের এই সকল স্বীকৃত বাক্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমরা এই সকল অসভ্য বর্ব্বরদিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, ইহার পর প্রায় দশবৎসরকাল কুকিদিগের দ্বারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। কেবল ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সীমান্ত স্থানে কতক গুলি কাঠুরিয়া কুকিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য এই সময় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য জেলা স্থষ্টি করিয়া তথায় একজন ইংরাজ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সংস্থাপন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে খণ্ডলের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। আমরা বাল্য কালে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণ, সেই দুঃখের কথা কি বলিব। কানপুরের বিদ্রোহী সিপাইগণ যে লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাসপটে শোণিতাক্ষরে লিখিত থাকিবে; কিন্তু খণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কতজন পাঠক অবগত আছেন? আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা নিম্নলিখিত রূপ সামান্য আকারে বর্ণিত হইয়াছে। *

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া রাধামোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,

* "Early in January 1860, reports were received, at Chittagong, of assembling of a body of 400 or 500 Kookies at the head of the River Fenny, and soon the tale of burning villages and slaughtered men gave token of the work they had on hand. On the 31st January, before any intimation of their purpose could reach us, the Kookis, after sweeping down the course of the Fenny, burst into the plains of Tipperah at Chagalneyah, burnt or plundered 15 villages, butchered 185 British subjects, and carried off about 100 captives."

আমরা বাল্যকালে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কবিতা সম্পূর্ণ রূপে এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। তাহার কিয়দংশ মাত্র স্মরণ রহিয়াছে।* তৎকালে যাহারা পলায়ন পূর্ব্বক আত্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নিকট এই ঘটনা যেরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এইস্থলে তাহাই প্রকাশ করা গেল।

খণ্ডল পরগণার অন্তর্গত (ছাগলনাইয়া থানার অধীন) মুনসীরখীল নামক গ্রামস্থ বাজারে ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি—কাপ্তান ধরণীধর সিংহ—কতিপয় সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী পূজা ছিল। কাপ্তান তাঁহার সঙ্গীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি

* কবি বীণাপাণির পদ বন্দনা করিয়া বলিতেছেনঃ—
"শুন সর্ব্ব সাধু ইহার নির্ণয়,
যেনমতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়।
দেখ, মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুনসীরখীল বাজারে বাবু ধুরন্ধর আছিল।
সে দিন প্রভাত কালে, করেছিল পূজার আয়োজন,
চিনি শর্করা আদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেনকালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রাকুকি আসি দেখা দিল।
তারা দাও শেল হাতে, বন্দুক কান্ধে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুসঙ্গর।
রণে প্রবেশিল, যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়,
অবনিতে কাটা পরি ধূলাতে লুটায়।

ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া পূজার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ৪০০।৫০০ কুকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তান মহাশয় এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন। কুকিগণ নির্ব্বিবাদে গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। যে সকল শিশু মাতার সহিত কুকিদিগের দ্বারা ধৃত হইল, কুকিগণ সেই সকল শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করত নিম্নে সুতীক্ষ্ণ শেল ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ

রুধির আবেসিল, আকাশেতে উড়িছে শকুন,
ঘর জিনিষ লুট করি, চালে দেয় আগুন।
তারা খন্তা নিল, কুড়াল নিল, আর নিল দাও কাঁচি।
সিন্ধুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাচি।

*   *   *   *

ঠিক দুপর বেলা হ'ল পুড়ে মুনসী বাড়ী।
সে দিন ফিরে যায়; রাত পোহা'ল ছিল রবিবার,
কাটা গ্রামে কাটি আসি দিল পুনর্ব্বার।

*   *   *   *

চৈলেছে কোলা পাড়া।
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর কোলে আসি দিল দরশন।
দেখে গুণাগাজি. গুণাগাজি এল সাজি সিফাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল বন্দুক আওয়াজ করি।

করিতে লাগিল। হতভাগী জননীগণ এই রূপ নিষ্ঠুরতা সহিত অপত্য নিধন দর্শনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুকিগণ পুরুষ মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত হত্যা করিয়া যুবতী রমণীগণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করত আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহারা এই রূপে ১৫ খানাগ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিয়া ১৮৫ জন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করত প্রায় একশত মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষত যুবতী। এই ১৫ খান গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যে সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া গিয়াছিল।

এই সময় গুণাগাজি নামক গ্রামস্থ এক জন প্রধান ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ পল্লি সমূহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রায় ২৫। ৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া বাউনালী নদীর তটে কুকিদিগকে আক্রমণ করেন। কুকিদিগের অধিক বন্দুক ছিল না, সুতরাং তাহারা বন্দুকের মুখে নদী পার হইতে সাহসী না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিশেষত কুকিগণ প্রায়ই সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। গুণাগাজি এরূপ সাহস অবলম্বন না করিলে যে আরও কত গ্রাম ভস্মীভূত এবং কত লোক কুকিদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইত, তাহা কে বলিতে পারে? গুণাগাজির এই কীর্ত্তি অনন্তকাল ইতিহাস লেখক ঘোষণা করিবেন।

জেলা ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কতিপয় সৈন্য খণ্ডলাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কেবল মাত্র কুকিদিগের অত্যাচারের জ্বলন্ত চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিল। কুকিগণ ইহার পূর্ব্বেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদের কর্তৃপক্ষগণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। *

উল্লেখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ আমরা এরূপ অবগত আছি, ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াং নামক এক সম্প্রদায় আছে, ইহারা কুকিদিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতি না হইলেও, নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে।

* It was at first supposed that this extended movement on the part of these tribes was directed by certain near relatives of the Tipperah Raja, and was intended to involve that chief in trouble with the English Government. But it was afterwards ascertained, with considerable certainty, that the main instigators of the invasion were three or four Hill Tipperah refugees, Thakurs who had lived for sometime among the Kookis, and who took advantage of the ill-feeling caused by an attack made by the Raja's subjects upon some Duptung Kookis, to excite a rising, that unfortunately became diverted to British territory.

রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙ্গালী মহাজনগণ হইতে সর্ব্বদা টাকা কর্জ্জ করিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা দাঁড়াইল। মহাজনেরা সর্ব্বদা রিয়াংদিগকে টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে দুথাং ও অন্যান্য কুকিদিগের সহিত সম্মীলিত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি রাজ বংশীয় কয়েক জন ব্যক্তি সংস্পৃষ্ট ছিলেন। * বিখ্যাত কুকি সরদার রতনপুইয়া ইহাদের সহিত যোগ দান করেন।

কুকিদিগের অত্যাচারে যে সকল খণ্ডলবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ১৩০০৭ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরেশ্বর হইতে গৃহীত হয়।

Driven by the Raja from his dominions, these men had formed alliances among the various Kooki tribes of the interior, and, year by year villages, supposed to be friendly to the Raja, had been attacked and plundered, vague rumours of which disturbances had reached our ears. Some of the Raja's own subjects, moreover, exasperated by constant exactions, were believed to have invited the Kookis to ravage his territories."

* কুমার নীলকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ ইহাতে সংলিপ্ত বলিয়া অবরুদ্ধ হন। কিন্তু পশ্চাৎ তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ

গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার মানসে তৎপর বৎসর শীতকালে একটি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে (১৮৬১ খৃঃ অঃ জানু-য়ারিতে) একদল কুকি ত্রিপুরেশ্বরদিগের প্রাচীন রাজ-ধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনানিবাস ছিল। তাহাতে একজন হাওলদার ও ২৫ জন সিপাই থাকিত, ইহারা কুকিদিগের নাম শ্রবণ মাত্র, "মেগেজিন" ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিগণ সেই মেগেজিনের বারুদ, গুলি ও গোলা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দুই খানা গ্রাম ও একটি প্রকাণ্ড বাজার ভস্মীভূত ও কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় চাকমা সবদার কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের একদল পুলিস সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, কুকিগণ তাহাতে বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনার পর কুকিদিগকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতন করিবার মানসে ত্রিপুরেশ্বরের সহিত উপযুক্ত পরামর্শ করিবার জন্য কাপ্তান গ্রেহাম সাহেব আগড়তলায় প্রেরিত হন। সেই সকল বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপর বৎসর বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

(১৮৬২ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু উত্তরাংশে শ্রীহট্ট জেলার সীমান্তবর্ত্তী স্থানে আদমপুরের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

লাল ছোকলারপুত্র মুরছুইলাল বিখ্যাত কুকি সরদার সুকপাইলালের ভগিনী ভানুইথাঙ্গীকে বিবাহ করেন।* কোন কারণ বশত মুরছুই লাল স্বীয় পত্নী ভানুইথাঙ্গীকে অপমানিত করেন। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্তা ভগিনী সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা সুকপাইলালকে তৎ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতেই কুকিদিগের মধ্যে একটি গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। মতান্তরে—রাজা মুরছুইলালের সহিত কুমারী ভানুইথাঙ্গীর বিবাহ কালে, যৌতুক প্রদান করিবার জন্য আদমপুর আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দাস দাসী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মুরছুইলাল, সুকপাইলাল, রাংবুং ও লালহুলন নামক ৪ জন কুকিরাজা সম্মীলিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত

* সুকপাইলালের পিতা মংপের কুকিগণ মধ্যে একজন পরাক্রমশালী সরদার ছিলেন। শিববুতের উত্তর পুরুষ লাকুর সহিত মংপেরের দীর্ঘকাল কলহ চলিয়াছিল। লাকুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র লালছোকলা মংপরের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন।

আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিন খানা গ্রাম অগ্নিদ্বারা দগ্ধ ও কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে মুরছুইলাল ও রাংবুং ত্রিপুরেশ্বরের অধীন এবং সুকপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন; লালহুলন মুরছুইলালের পিতৃব্যপুত্র ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কৌশলে কুকি সরদারদিগকে বাধ্য করিয়া পূর্ব্বসীমান্তে শান্তি সংস্থাপন করিতে যথাসাধ্য যত্নকরিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গ্রেহাম রতন পুঁইয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তৎকালে ইহা অবধারিত হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর রতন পুঁইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগকে ৮০০ টাকা ও সাইলো গণকে ৮০০ টাকা প্রদান করিবেন।

উত্তরদিকে কাছাড়ের ডিপুটী কমিসনর ষ্টুয়ার্ট সাহেব সুকপাইলাল ও মোল্লা সরদার বনপুইলালের সহিত সামান্য প্রকারের সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত শান্তি রক্ষা করিলে তাহাকে বার্ষিক ৬০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের সময় কুকিগণ যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি পলায়ন

পূর্ব্বক কাছাড়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলিকে কুকিগণ বিবাহ করে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিগণ নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা বাঙ্গালার সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই।

১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ বঙ্গীয় সমতলক্ষেত্রে কোন-রূপ অত্যাচার করে নাই। কিন্তু তৎকালেও যে তাহারা তাহাদের চিরঅভ্যস্ত কার্য্যে বিরত ছিল, এমত নহে, কারণ সেই সময় তাহারা আত্মকলহে নিযুক্ত ছিল। সৌভাগ্য বশত আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের সতর্কতায় তাহারা সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় নাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে প্রায় ৫০০ হাউলং তাহাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। কর্ত্তৃ-পক্ষগণ রতন পুঁইয়ার দ্বারা এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া ত্রিপুরারাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইল। সৌভাগ্য বশত হাউলংগণ এবার ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুকপাইলাল এবং বনপুই লালের অধীন কুকিগণ কাছাড়, ত্রিপুরা এবং মণিপুর রাজ্যে সমভাবে অত্যাচার করিয়াছিল। এই সময় মণিপুরের

ভূতপুর্ব্ব নরপতি মারজিতের পুত্র কানাই সিংহ পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করিবার মানসে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল সংগ্রহ করিয়া কুকিদিগকে উত্তেজিত করেন। কুমার কানাই সিংহ কুকিগণের সহিত বিশেষরূপ প্রীতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রিপুর রাজ-কুমার নীলকৃষ্ণ, কানাই সিংহের ভগিনীপুত্র এবং এজন্যই খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড নীলকৃষ্ণের চক্রান্তে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে প্রথমতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু ত্রিপুরার ভূতপুর্ব্ব মাজেষ্ট্রেট গর্ডন সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে গবর্ণমেণ্ট নীলকৃষ্ণকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি প্রদান করেন।* খণ্ডলের ভীষণ হত্যাকাণ্ড নীলকৃষ্ণের চক্রান্তে সম্পাদিত হইয়াছিল কি না, তাহা স্থিরভাবে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন; কিন্তু কোন কোন কুকি সরদারের সহিত যে নীলকৃষ্ণের গুপ্ত প্রণয় ছিল তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। বিশেষত কাছাড়ের ভূতপুর্ব্ব ডিপুটী কমিসনর (পশ্চাৎ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী) এডগার সাহেব কুকি প্রদেশে ভ্রমণকালে তাহার বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজের ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মচারীগণ কোন কোন সময় বৈরনির্য্যাতন মানসে কোন কোন নির্দ্দোষ ভদ্রলোককে

* *Government letter to the Commissioner of Chittagong. 7th November. 1860. No 5845.*

কুকি অত্যাচারে সংস্পৃষ্ট বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ নিকট প্রচার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। কুমার নীলকৃষ্ণের প্রিয় সুহৃদ ঢাকা নিবাসী বাবু বংশীলোচন মিত্র এবং উজির বংশধর শিবজয় ঠাকুরকে খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত করিবার জন্য রাজসরকার পক্ষে একটি ঘৃণিত চক্রান্ত হইয়াছিল। ইহা নিতান্ত দুঃখের সহিত আমরা উল্লেখ করিতেছি যে, যদিচ বারংবার ত্রিপুরার রাজ পক্ষ হইতে এইরূপ ব্যবহার গবর্ণমেণ্ট অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, তথাপি এইরূপ অনুষ্ঠানে মহারাজ কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না। বর্ত্তমান মহারাজের কর্ম্মচারীর দোষে জমাতিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু মহারাজের কর্ম্মচারিগণ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র নীলকৃষ্ণ ও চক্রধ্বজকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুমার নবদ্বীপচন্দ্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার জন্য বর্ত্তমান মহারাজের প্রিয় দেওয়ান-ক্ষুদ্রচাণক্য-রামমাণিক্য ও কণিক-শিষ্য-ঈশানচন্দ্র এই ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাজেষ্ট্রেট কাওয়েলী সাহেব পাপাত্মাগণের পাপ চক্রান্তে আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের বিরুদ্ধে তিনদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ যাত্রার ফল

সন্তোষ জনক হয় নাই। তদনন্তর ঐ বৎসরের শেষভাগে বৃহৎ একদল সৈন্য কুকিদিগের প্রতিকূলে প্রেরণ করিবার জন্য সার উইলিয়ম গ্রে, গবর্ণর জেনরল লর্ড মেও বাহাদুর নিকট প্রস্তাব করেন। লর্ড মেও সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিবার জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ করেন। তৎকালে তিনি পর্ব্বত ত্রিপুরারাজ্যে পলিটিকেল এজেন্ট নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বিশেষরূপে অনুমোদন করেন। প্রকৃতপক্ষে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা অবগত না হইয়া বারংবার যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা কেবল গবর্ণমেণ্টের অর্থ নাশ মাত্র হইতেছিল।

প্রায় একবৎসর কাল কর্ত্তৃপক্ষগণ কুকি সরদারদিগকে কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই সময় কাছাড়ের ডিপুটী কমিশনর এডগার সাহেব কুকি প্রদেশ স্থিত বেপারি বাজারে গমন পূর্ব্বক বিখ্যাত সরদার সুকপাইলালকে এক আশ্চর্য্য খেলাত প্রদান করিলেন। * কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের সুতীক্ষ্ণ নীতি শাস্ত্র বর্ব্বর কুকি

* Sukpilal was invested with a dress of honour specially made for him,—green *pyjama*, with scarlet and gold flowers, a purple coat with green and gold embroidery, an indescribable hat of green and white silk, a necklace of glass

জাতির হস্তে ভোতা হইয়া দাঁড়াইল। কুকিগণ বিবেচনা করিল “আমরা যতই অত্যাচার করিব ততই সাহেবগণ আমাদিগকে নানা প্রকার উপহার প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। সুতরাং সাহেবদিগের নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে হইলেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইতে নরহত্যা গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে।” এডগার সাহেব সুকপাইলালকে খেলাত প্রদান পূর্ব্বক শিলচারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই সংবাদ পাইলেন যে কুকিগণ তাঁহাদের চির অভ্যস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে কুকিগণ কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত বিবিধ স্থান আক্রমণ করত তাহাদের চির অভ্যস্থ নরহত্যা গৃহদাহ, লুণ্ঠন ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করে। এই সময় তাহারা অনেকগুলি যুবতী স্ত্রীলোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। স্মরণীয় কাল মধ্যে কোন

buttons and gold beads and two glass earrings. (*Observer. 25-2-71.*) এডগার সাহেব বিবেচনা করিলেন, কতকগুলি মূল্যহীন ঝুটা বস্তু দিয়া এই বর্ব্বরকে গোলাম করিয়া লইলাম। আর সেই বর্ব্বরের অনুচরগণ মণিপুরের রাজ দরবারে যাইয়া প্রকাশ করিল যে, কাছাড়ের বড় সাহেব আসিয়া আমাদের রাজাকে কর প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এক বৎসরে এতগুলি স্থান আক্রান্ত হয় নাই। * কাছাড়ের অন্তর্গত আলেকজেণ্ডারপুর নামক চাক্ষেত্র আক্রমণ করিয়া কুকিগণ কেবল যে কতকগুলি কুলি বধ করিয়াছিল এমত নহে, চাক্ষেত্রের মেনেজার উইনচেষ্টার সাহেবকে বধ করিয়া তাহার শিশু কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিল।

এই সকল অত্যাচার কাহিনী বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কর্ণ গোচর হইলে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে কেবল বেল-

---

* এই সময়ের কুকি অত্যাচারের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। যে যে স্থান কুকিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থানে প্রদত্ত হইল।

(১) ত্রিপুরা রাজ্য—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১।২২ জানুয়ারী এবং ১ মার্চ্চ ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত বিবিধ স্থান আক্রমণ করত কুকিগণ গৃহদাহ লুণ্ঠন ও নরহত্যা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে।

(২) শ্রীহট্ট জেলা—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৩ জানুয়ারী কাছাড়িয়াপাড়া আক্রমণ করত ২০ জন মনুষ্য বধ ও কতকগুলি যুবতী স্ত্রী লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ২৪ জানুয়ারি চারগোলা থানার নিকটবর্ত্তী এক খানা গ্রাম আক্রমণ করত ২ জন মনুষ্য বধকরে। ২৭ ফেব্রুয়ারি আলীনগরের নিকটবর্ত্তী এক খানা গ্রাম আক্রমণ করে। এডগার সাহাবের বন্ধু সুকপাইলালের অনুচরগণ দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

ওয়ারি বুতামের হার দ্বারা এই বর্ব্বর জাতিকে শান্তকরা অসম্ভব। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ মেইর সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সারজর্জ্জ কেম্পবল লিখিলেন, যে পূর্ব্ব সীমান্তে শান্তি স্থাপন জন্য একটি সামরিক অভিযান, অনুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োজন। সেই মন্তব্য লিপি ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্ট সমূহ পাঠ করিয়া গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেও বাহাদুর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ ১১ জুলাই এক

---

(৩) কাছাড় জেলা—

১৮৭১খৃষ্টাব্দের ২৩জানুয়ারি আইনেরখাল গ্রাম এবং আলেকজেণ্ডারপুর ও কাৎলাছড়া চাক্ষেত্র আক্রান্ত হয়। তাহারা ২৪ জানুয়ারি পুনর্ব্বার কাৎলাছড়া চাক্ষেত্র আক্রমণ করে। ২৭ জানুয়ারি মণিয়ারখাল এবং নন্দীগ্রাম চাক্ষেত্র ও রুকণী নদীর তীরস্থিত একদল কাঠুরিয়া তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। ২৩ফেব্রুয়ারি তাহরা জালনাছড়া চাক্ষেত্র আক্রমণ করে।

(৪) মণিপুর রাজ্য—

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে মণিপুরের দক্ষিণদিকস্থ একখানি গ্রাম বিনষ্ট করিয়া ৪০ জন মনুষ্য বধকরে এবং ২০ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

সাইলো কুকিসরদার সবোঙ্গা, হাউলং কুকিসরদার লালসোবনা ও সেইপয়া, থচাক কুকিসরদার বোনপাইলাল, তাহার মাতা ইম্পায়, বনোলাল তৎপুত্র লালবোরা, ও জোংদং এবং সুকপাইলাল, তাহার দুই পুত্র ও তাহার ভগিনী ভায়ই খাঙ্গির-অনুচরগণ দ্বারা এই সকল ভীষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব সীমান্তে স্থায়ী রূপে শান্তি স্থাপন জন্য আগামী শীত ঋতুতে একটি সমারিক অভিযান হইবে; ত্রিপুরা ও মণিপুর পতি এই অভিযানে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। এই অভিযানের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হইবে। এই অভিযান দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। একদল সৈন্য চট্টগ্রাম হইতে গমন করিবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ডিপুটী কমিসনার লেউইন সাহেব সেই সেনাদলের সহিত সিবিল অফিসারস্বরূপ গমন করিবেন। হাউলং ও সাইলোদিগকে নির্য্যাতন করা ইহাঁদের প্রধান কার্য্য হইবে। দ্বিতীয় দল কাছাড় হইতে থঙ্গাক (লুসাই) কুকিদিগের বিরুদ্ধে গমন করিবে। কাছাড়ের ডিপুটী কমিসনর এডগার সাহেব এই সেনাদলের সহিত সিবিল অফিসার স্বরূপ গমন করিবেন।

বিগত শীতঋতুতে কোন্ কোন্ সরদার দ্বারা উল্লেখিত ভীষণ অত্যাচার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা স্থির ভাবে নির্ণীত হয় নাই। অভিযান সময়ে তাহা স্থির করিতে পারিলে প্রকৃত অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতেহইবে। বন্দীগণকে মুক্ত করিতে হইবে। যাহাদের নিকট বন্দীগণ আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করা হইবে। সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহার গ্রাম, শস্যাগার ও শস্য-

ক্ষেত্র অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে হইবে। এবং ভবিষ্যতে যাহাতে কুকিগণ দ্বারা কোনরূপ অত্যাচার সংসাধিত না হয়, তজ্জন্য সরদারগণ হইতে জামিন লইতে হইবে। প্রত্যেক সেনাদলের সহিত এক কিম্বা ততোধিক সারবে অফিসার গমন করিবেন। তাহাদিগকে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের মানচিত্র প্রস্তুত করিতে হইবে ;—ইহাই অভিযানের অভিপ্রায়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কাছাড় ও চট্টগ্রামে দুইটি বৃহৎ সেনাদল উপস্থিত হইল। চট্টগ্রামের সেনাদলের নায়ক হইলেন জেনারল ব্রাউনলো, জেনারল বোরসিয়ার কাছাড় সেনাদলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে অভিযান আরম্ভ হয়।

জেনেরল ব্রাউনলো সাইলু ও হাউলং সরদারগণকে এক প্রকার বিনাযুদ্ধে অবনত মস্তক করিয়া মেরি উইনচেষ্টার এবং অন্যান্য বন্দীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর ব্রাউনলো দেমাগিরি হইতে যাত্রা করেন। ২৩১ মাইল পার্ব্বত্য পথে জয়ডঙ্কা নিনাদিত করিয়া তিনি স্বীয় অনুচরগণ সহ ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিখ্যাতকুকি সরদার রতনপুইয়া জেনেরল ব্রাউনলো ও তাহার অনুচরগণের পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন।

কাছাড়দলের নায়ক বোরসিয়ার স্থানে স্থানে অনলক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্যান্য কুকি সরদার-

গণকে নির্য্যাতন করিয়া তিনি অবশেষে সর্ব্বপ্রধান ও পরাক্রমশালী কুকি-রাজা লালবোরা হইতে ১ জোড়া উৎকৃষ্ট গজদন্ত, এক জোড়া ঘুং * ১ছরা হার, ১০টী ছাগল, ১০টী শূকর, ৫০টী মুরগ ও ২০ মণ ধান্য এবং মণিয়ারখাল ও নন্দীগ্রাম চাক্ষেত্র লুণ্ঠন করিয়া কুকিগণ যে কয়েকটি বন্দুক লইয়াগিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক বন্দুক দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করত ১০ মার্চ্চ কাছাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কাছাড় হইতে ১৯৩ মাইল দূরে অবস্থিত লালবুরোর সুদৃঢ় গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ যাত্রায় খছাক, সাইলো ও হাউলং প্রভৃতি কুকি সরদারগণকে ব্রিটীস বৈজয়ন্তীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

উল্লেখিত দুইটী সেনাদলের সহিত যে সকল সারবে অফিসার গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই অল্পকাল মধ্যে চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের মধ্যবর্ত্তী ৬৫০০ বর্গমাইল ভূমির মানচিত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখা নির্ণয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। কুকিগণ কর্ত্তৃক কোনরূপ অত্যাচার কার্য্য সম্পন্ন হইলেই, ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের চির অভ্যস্ত “বাঁধা বোলে” উত্তর দিয়াছেন যে “ইহারা আমার প্রজা নহে।” পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখা নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাঁহারা

* একটি বৃহৎ কাশির ন্যায়, কুকিদিগের রণ বাদ্য।

ত্রিপুর কুলতিলক ধন্যমাণিক্য ও বিজয় মাণিক্যের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ব্রহ্মরাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে নিতান্ত লালায়িত হইয়াথাকেন। নিতান্ত পক্ষে টেপাই নালা ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা বলিয়া প্রদর্শন করিতে তাহারা বিশেষরূপে সক্ষম; কিন্তু ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেণ্ট পাউয়ার সাহেব ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে সারবেয়ারগণ সহিত পরিভ্রমণ করিয়া উক্ত রাজ্যের আধুনিক পূর্ব্বসীমা বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। * ইহা দ্বারা সুকপাইলাল ও অন্যান্য খচাক কুকিদিগের বাসভূমি চিরকালের তরে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। সারবেয়ারগণ পর্ব্বত শ্রেণী অপেক্ষা নদী দ্বারা সীমা নির্ণয় প্রয়োজনীয় বলিয়া রিপোর্ট করেন, তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট জাম্পুই ও

* পাউয়ার সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিলের পত্রে লিখিয়াছেন:—

"The territory over which the Raja has a *bona fide* nominal control is bounded on the east by a range of hillrunning southward from Chatter Choora to Sorphul peak, and from thence in a zig-zag line to Surdaing. On the east of this line, the Lushai land cmmences, and on the west there is much uninhabited and unexplored jungle.

হিচক পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লঙ্গাইনদী (তাহার উৎপত্তি স্থান বেতলংশিব পর্য্যন্ত তৎপর) ধলেশ্বরীর (ডলুজুরীর) জলপ্রপাত সমুৎপন্ন স্রোত রেখা অতিক্রম পূর্ব্বক স্যার্দ্দিং ও ফেণী নদী দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।† এই সীমারেখার পূর্ব্বদিকে লুসাই ভূমি। ত্রিপুরেশ্বর সেই দেশবাসীর সহিত কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্ট সেই প্রদেশে রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব করিবেন।

উল্লেখিত অভিযান সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে স্যার-জর্জ কেম্পবল বলিয়াছিলেন, "কুকি অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে। চা-কর এবং আমাদের প্রজাগণ শান্তভাবে কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারিবে।"

উল্লেখিত অভিযানের পর কয়েক বৎসর কুকিগণ দ্বারা বিশেষ কোন অত্যাচার সংসাধিত হয় নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কুকি প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তৎকালে কুকিগণ কাছাড়ের ডিপুটী কমিসনর সাহেব নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। কুকি প্রদেশ মধ্যে চাংশীল (প্রাচীন বেপারি

† আমাদের বিবেচনায় পর্ব্বত শ্রেণীর পরিবর্ত্তে স্রোতস্বিনীগুলি দ্বারা সীমা নির্ণয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে নানারূপ তর্ক উপস্থিত হওয়ার সম্ভব।

বাজার) সোনাই এবং টেপাইমুখ নামক স্থানে তিনটি হাট-বাজার ছিল। কাছাড় ও শ্রীহট্টের বাঙ্গালী বণিকগণ তথায় নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য লইয়া গমন করিত এবং সেই দ্রব্য কুকিগণ নিকট বিক্রয় করিয়া তাহারা কুকিগণ হইতে সুলভ মূল্যে রবার খরিদ করিয়া আনিত। ক্রমে কুকি-রাজগণ অতিরিক্ত শুল্ক বণিকদিগের নিকট দাবি করিতে লাগিলেন তদ্দ্বারা সেই তিনটী বাজারের অবনতি আরম্ভ হইল। অবশেষে রবারের বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে বাজারগুলি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ধান্য ও তণ্ডুল প্রেরণ করত বাঙ্গালি বণিকদিগকে উৎসাহিত করিয়া ঐ সকল বাজারে তণ্ডুল প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পল পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে জনৈক পলিটিকেল অফিসার নিযুক্ত পূর্ব্বক সমগ্র কুকি প্রদেশ ও ত্রিপুরা রাজ্য তাহার শাসনাধীনে সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। আসামের চিফ-কমিসনার কর্ণেল কিটিঞ্জ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "লুসাই কুকিগণ কাছাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে, চট্টগ্রাম হইতে ইহাদিগকে শাসন করা কঠিন হইবে। সুর্ম্মা নদীর তীরস্থ প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য আগরতলায় জনৈক পলিটিকেল এজেণ্ট রাখাই আমি সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি।

কর্ণেল কিটিঞ্জের মন্তব্য অনুসারে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সার রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

১৮৭৬-৭৭খৃষ্টাব্দে কুকিগণ ভীষণ আত্ম কলহে নিযুক্ত ছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার পলিটিকেল এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য কমলপুর, কৈলাসহর, ফারুয়াধর্ম্মনগর, একছরি, উদয়পুর, ঋষ্যমুখ, খাদলামাদলা এবং আগরতলার মহারাজের যে আটটী সেনা নিবাস আছে, তাহার অধিকাংশ সৈন্যগণেরই বারুদগুলি প্রভৃতির নিতান্ত অভাব দেখা যাইতেছে এবং সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে বেতন পাইতেছে না।" ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র আদেশ করিলেন যে, "সীমান্ত প্রদেশের শান্তিরক্ষা করিবার জন্য মহারাজ যেরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আছেন তাহাকে অবশ্যই তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।"

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একদল কুকি চাংশীল বাজার লুণ্ঠন করিয়াছিল। বণিকগণ এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কাছাড়ে উপনীত হন। ডিপটী কমিসনার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা সুকপাইলালকে বণিকদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য এক সহস্র টাকা জরিমানা করেন। উক্ত টাকা প্রদান না করিলে চাংশীলে কোন বাঙ্গালি বণিক গমন করিবে না এইরূপ বলা হইয়াছিল। সুকপাইলাল ইহার অধিকাংশ পরিশোধ করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দণ্ড হইতে চিফ্‌-কমিসনার তাহাকে

মুক্তি প্রদান করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সুকপাইলালের মৃত্যু হয়।

১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ ভীষণ আত্মকলহে নিযুক্ত ছিল। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় নিরীহ বাঙ্গালি হত্যার পন্থা রুদ্ধ হওয়ায় তৎকালে তাহারা স্বজাতীয় নরহত্যা দ্বারা আপনাদের রাক্ষসবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। এই সময়ে কুকি প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট তৎকালে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একদল স্মৃক্তি কুকি টেপাই মুখের কুকি রাজার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া একটী বালককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুকিগণ সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পর্ব্বত মধ্যেই সময় সময় তাহাদের রাক্ষসবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেনেণ্ট ষ্টুয়ার্ট যৎকালে পার্ব্বত্য প্রদেশে জরিপী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় (৩ ফেব্রুয়ারি) সিন্দুগণ বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ও দুই জন ইংরেজ সৈনা ও একজন দেশীয় পদাতির প্রাণ বধ করে। তখন গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে কেবল আত্মরক্ষা নীতি অবলম্বন দ্বারা এই বর্ব্বর জাতিকে পাশবাচার হইতে বিরত রাখা অসম্ভব। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী শীত ঋতুতে একটী প্রশস্তাকার অভিযানের প্রয়োজন হইল।

১৮৮৮-৮৯খৃষ্টাব্দে "চীন-লুসাই" অভিযান হইয়াছিল। ব্রহ্মা হইতে একদল ও চট্টগ্রাম হইতে একদল এবং কাছাড় হইতে একদল সৈন্য কুকিপ্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। এই অভিযান দ্বারা কুকিদিগকে বিশেষ রূপে শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক অনেকগুলি বন্দীকে মুক্ত করা হইয়াছিল। তদনন্তর গবর্ণমেণ্ট কুকি প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া "উত্তর লুসাই" ও 'দক্ষিণ লুসাই" নামক দুইটী প্রকাণ্ড জেলা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুই জেলার পরিমাণ বোধ হয় ৪০০০০ বর্গমাইল হইতে ন্যূন হইবে না।

মরে সাহেব প্রথমত দক্ষিণলুসাই জেলার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। তদনন্তর তিনি পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের এসিষ্টাণ্ট কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইলে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১মে কাপ্তান সেক্সপিয়ার উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৮ মে কাপ্তান ব্রাউন উত্তরলুসাই জেলার পলিটিকেল অফিসার হইয়া আজিয়াল দুর্গে গমন করেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর প্রাতে কাপ্তান ব্রাউন সৈরং হইতে চাংশীল গমন করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার ক্লার্ক বাবু কামিনীকুমার সেন, ১জন দফাদার ও ২জন পুলীস সৈন্য ও কতকগুলি কুলি মাত্র ছিল। পথি মধ্যে কুকিগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করত নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত,

কাপ্তান ব্রাউন, কামিনীকুমার সেন ও তাঁহাদের ১৯ জন অনুচরকে বধ করে। মৃত সরদার সুকপাইলালের আত্মীয়-বর্গ দ্বারা এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল। আসামের চিফ্-কমিসনার ও গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই সংবাদ অবগত হইয়া উপযুক্তরূপে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

অধুনা গবর্ণমেণ্ট এই বর্ব্বরজাতিকে যেরূপ কৌশলের সহিত ব্রিটীস-শাসন-যন্ত্রের মধ্যে আনয়ন করিতেছেন, বোধ হয় কিছুকাল পরে এই রক্ত পিপাসু বর্ব্বরগণ সাওতাল-দিগের অবস্থাপন্ন হইবে। ইহারা শতাধিক বৎসরকাল আমাদিগের প্রতি যেরূপ পাশব অত্যাচার করিয়াছে, সমগ্র কুকিজাতির রুধির ধারা দ্বারা ও তাহার সম্পূর্ণ প্রতিশোধ হইতে পারেনা; কিন্তু ক্ষমাই ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আমরা ভরসা করি আমাদের গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে ভীষণ শাসন যন্ত্রে নিষ্পেষিত না করিয়া সভ্যতার আলোক প্রদর্শন পূর্ব্বক কুকিদিগের উদ্ধারের জন্য একটুকু কটাক্ষ পাত করি-বেন। আমরা ইহাদিগকে সভ্যতা শিখরের শীর্ষদেশ বাসী কোন উন্নত জাতির বিকৃত আদর্শ দর্শন করিতে অভিলাষী নহি। কুকিগণের জাতীয় জীবন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিলুপ্ত হউক, ইহা আমাদের অভিপ্রায় নহে। কুকিগণ তাহাদের জাতীয় ভাব ও ধর্ম্ম রক্ষা করত শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ দ্বারা উন্নতির

তুঙ্গ শৃঙ্গে আপনাদের জাতীয় আসন সংস্থাপন করুক, ইহাই আমদের অভিলাষ। কাপ্তান লেউইন পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার জন্য লিখিয়াছেন, আমরাও এই বর্ব্বর জাতির প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি।*

* This I say, then, let us not govern these hills for ourselves, but administer the country for the well-being and happiness of the people dwelling therein. Civilization is the result and not the cause of civilization. What is wanted here is not measures but a man. Place over them an officer gifted with the power of rule; not a mere cog in the great wheel of Government, but one tolerant of the failings of his fellow-creatures, and yet prompt to see and recognize in them the touch of Nature that makes the whole world kin;—apt to enter into new trains of thought and to modify and adopt ideas, but cautious in offending national prejudice. Under a guidance like this, let the people by slow degrees civilize themselves. With education open to them, and yet moving under their own laws and customs, they will turn out not debased and miniature epitomes of English-, men, but a new and noble type of God's creatures.

Lewin's Hill Tracts of Chittagong. p. 118.

রাজমালা

চতুর্থ ভাগ।

রাজমালা।



চতুর্থভাগ।

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য
বা জেলা নওয়াখালী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সুহ্মদেশ বা প্রাচীন ত্রিপুরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভুলুয়া তাহার অন্যতম। প্রবাদ অনুসারে গৌড়ের প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভর শূর এই রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা। মতান্তরে "আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। ৬১০ বঙ্গাব্দে রাজা বিশ্বম্ভর-চন্দ্রনাথ, দর্শন মানসে পোতারোহণে গমন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে পোতারোহিগণের দিগ্‌ভ্রম জন্মে, ক্রমে অষ্টাহ ইতস্ততঃ নৌসঞ্চালনের পর তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দর্শন করেন।

নৃপতি বারাহী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, দেবী তৎকালে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে বলিলেন। বৎস! এই দ্বীপে— তুমি আমাকে স্থাপন কর। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হইবে এবং তুমি এই রাজ্যের অধিপতি হইবে। এই রজ্য ভুলুয়া নামে খ্যাত হইবে।* তোমা হইতে অধস্তন সাত পুরুষ ক্রমান্বয়ে এই রাজ্যে একাধিপত্য করিবেন। অষ্টম পুরুষে তোমার এই বিস্তৃতরাজ্যের সীমারেখা সঙ্কুচিত হইবে। পঞ্চদশ পুরুষে তোমার বংশধরগণ হৃত রাজ্য হইবেন।"

দেবীর আদেশ অনুসারে বিশ্বম্ভর সেই স্থানে বারাহী দেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক ৬১০ বঙ্গাব্দের ১০ মাঘ ভুলুয়া রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করেন।† প্রচলিত ও লিখিত প্রবাদ বাক্য হইতে যে সময় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে

---

* ভুল – হুয়া, হইতে ভুলুয়া শব্দের উৎপত্তি।

† সময় সম্বন্ধে হণ্টার সাহেব ভ্রমাত্মক মত প্রচার করিয়াছেন। (*Statistical Account of Bengal. Vol. VI. p. 247.*) ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন :—The exact date of this fiction is given as the 10th of Magh, 610 Bengali year or A. D. 1203, the same year in which the first Muhammadan invasion of Bengal under Bakhtyar khilji took place.

(*J. A. S. B. Vol. XLIII. part 1. p. 203*)

তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ কি না তৎপক্ষে আমাদের সন্দেহ আছে, কিন্তু বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কিম্বা তাঁহার অনুচরগণ দ্বারা তাড়িত হইয়া যে শূর বংশীয় বিশ্বম্ভর ভুলুয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

প্রবাদ অনুসারে কল্যাণপুর তাঁহাদের আদি রাজধানী। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আমিসাপাড়া গ্রামে রাজা বিশ্বম্ভর প্রথমত বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, কারণ এই স্থানেইবারাহী দেবীর মন্দির ও প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভুলুয়াপতি শূরবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় কুল হইতে উদ্ভূত; † কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা তাঁহারা—বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। কোন কুলক্রিয়া উপলক্ষে বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণ সকলেই ভুলুয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভোজনকালে চতুর্ম্মগুলের মিত্র, বসুবংশীয় বহরের কৃষ্ণজীবন মজুমদার এবং হংস বসু ও কীর্ত্তি বসু পলায়ন করেন। এই অপরাধে পলায়িত ব্যক্তিগণের কুল নষ্ট হয়। বঙ্গজ কায়স্থ মিত্রগণ মধ্যে তৎকালে কেবল চতুর্ম্মগুলের মিত্রগণেরই কুল ছিল। সুতরাং তাহাদের কুল নষ্ট হওয়ায়

† ইহার একটী বিশেষ প্রমাণ এই যে, রঘুনন্দন এই রাজবংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহাদের দশক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বঙ্গজ মিত্রগণ সকলেই অকুলীন হইলেন। প্রবাদ অনুসারে রাজা কবিচন্দ্রের সময় এই ঘটনা হইয়াছিল। *

বিশ্বম্ভরের উত্তর পুরুষগণ ত্রিপুর রাজদণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে ভুলুয়ারাজ সর্ব্ব প্রধান বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ত্রৈপুর নৃপতিগণের অভিষেক কালে ইঁহারাই তাঁহাদের ললাটে রাজটীকা প্রদান করিতেন। ত্রিপুরেশ্বর সিংহাসনে উপবেশন করিলে ভুলুয়াপতি সর্ব্ব প্রথম "নজর" প্রদান করিতেন, তদনন্তর অন্যান্য সামন্ত ও অমাত্যবর্গ নজর দান করিতে সক্ষম হইতেন

রাজা বিশ্বম্ভর হইতে অধস্তন ৭ পুরুষের বংশাবলী এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১। রাজা বিশ্বম্ভর রায়।
|
২। রাজা গণপতি রায়।
|

* এজন্য মিত্র বংশীয়গণ ভুলুয়া রাজবংশের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজ সেই মিত্রবংশীয় বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের সাহায্যে "দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস" রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ভুলুয়া রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :— "Raja Bishambhar Rai of the low class of Kayastas called Sur." (*J. A. S B. Vol. XLIII. part. 1. p. 203*)

৩। রাজা সুরানন্দ খাঁ।
|
৪। রাজা দেবানন্দ খাঁ।
|
৫। রাজা রবিচন্দ্র খাঁ।
|
৬। রাজা রাজবল্লভ রায়।

উদয় মাণিক্য	রাজ মাণিক্য	৭ লক্ষ্মণ মাণিক্য	গোবিন্দ মাণিক্য	নরসিংহ মাণিক্য,

রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য এক জন অসাধারণ বীর ও পণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভিষেকের পূর্ব্বেই জুগীদিয়া ও দাঁদড়া নামক পরগণা দুইটি ভুলুয়া রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। রাজা তুড়রমল্লের ওয়াশীলতোমর জমায় সরকার সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত প্রাচীন ভুলুয়ার অধীন মহাল সমূহের এইরূপ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভুলুয়া জোয়ার। রাজস্ব ১৩৩১৪৮০ দাম।
জুগীদিয়া। রাজস্ব ৫১২০৮০ দাম।
দাঁদড়া। রাজস্ব ৪২১৩৮০ দাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আকবর সাহের রাজস্ব-মন্ত্রী সের সাহের রাজস্বের হিসাব নকল করিয়া অপূর্ব্ব বাহাদুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সম্রাট আকবর এই সকল স্থানের করগ্রাহী ছিলেন না। যাহা হউক এস্থলে ভুলুয়ার রাজস্ব ৩৩২৮৭ টাকা লিখিত হইয়াছে।

বিখ্যাত পাঠান সম্রাট সের সাহ কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন নরপতি ভুলুয়া ও অন্য দুইটী পরগণা হইতে যদিও কোন সময় এইরূপ কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আকবর তাহা করিতে পারেন নাই। ইংরেজ ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিছ বলিয়াছেন যে, "এই সকল সামন্ত নরপতিগণ প্রবল নদীস্রোতে আপনাদের বিজয়ী-পতাকা উড্ডীন করিয়া আকবরের অশ্বারোহিগণকে উপহাস করিতেছিলেন" প্রাচীন বঙ্গবাসীদিগের চির অভ্যস্ত জল-রণ-নৈপুণ্য বিনষ্ট করিবার শক্তি তখনও মোগলদিগের করায়ত্ত হয় নাই।

লক্ষ্মণমাণিক্য সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও কবিছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণবধ অবলম্বন করিয়া "বিখ্যাত বিজয়" নামক একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। যদিচ তাহার গ্রন্থ "রত্নাবলী" কিম্বা "নাগানন্দের" ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি ইহা জনৈক রাজকবির লেখনী-প্রসূত বলিয়া আমরা গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতে পারি। নান্দীতে গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রাচীন কুলদেবতা বারাহীদেবীর বন্দনা করিয়াছেন। তদনন্তর সূত্রধর প্রস্তাব ও গ্রন্থের যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। * বীররসই এই নাটকের জীবন। ইহা

* প্রেক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তল মহামাণিক্য রত্নাকরঃ
প্রাক্ সৎপুরুষ পৌরুষোৎকর কথা স্রোতস্বতী ভূধরঃ।

দের দ্বারা গ্রন্থকারের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াযায়।

প্রবাদ অনুসারে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। সংগ্রামকালে তিনি যে কবচ পরিধান করিতেন, তাহার কিয়দংশ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কবচটি সম্পূর্ণ অবস্থায় দর্শন করিয়াছেন, এরূপ লোক অদ্যাপি নিতান্ত বিরল নহে। এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ইহার ওজন প্রায় ১ মণ ছিল, অর্দ্ধ মণ ওজনের একটি কবচ পরিধান পূর্ব্বক সংগ্রাম করা একজন অসাধারণ বীরের কার্য্য। আধুনিক জগতের বীর জাতি সমুহের মধ্যে বোধ হয় এরূপ বীর নিতান্ত বিরল।

চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় লক্ষ্মণমাণিক্যের সমসাময়িক, তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভুলুয়াপতিগণ বারংবার চন্দ্রদ্বীপে বিজয়ীপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা রামচন্দ্র নিতান্ত বিড়াল তপস্বীর ন্যায় ভুলুয়ায় আগমন করেন। উদার-হৃদয় লক্ষ্মণমাণিক্য স্বজাতীয় বালক নরপতির বিনীত ব্যব-হারে নিতান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একদা

দৃশ্যচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রাগল্ভ্য পুষ্পাকরঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ ভূপতে রভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ ॥
আশ্রয়ো যস্য রাজানস্তস্য বীররসস্য চেৎ।
প্রবন্ধা ভূভুজা বদ্ধস্তস্মিন্নৌপয়িক শ্রমঃ ॥

সরল ভাবে রাজা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার কোষনৌকায় গমন করত আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতক পামর রামচন্দ্র সেই সময় স্বীয় প্রধান সেনাপতি রামমোহন সিংহ (প্রকাশ্য রামাই মাল)* ও অন্যান্য বীর পুরুষ দ্বারা নিরস্ত্র বীর লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্ধন করিয়া চন্দ্র-দ্বীপে লইয়া গেলেন। তথায় নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে বধ করা হইয়াছিল। †

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লেখক বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র বলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্মণমাণিক্য পৃষ্ঠের আঘাতে একটি প্রকাণ্ড তাল-বৃক্ষ ধরাশায়ী করিয়াছিলেন।

*সেনাপতি রামমোহন সিংহ (রামাই মাল) কায়স্থ বংশজ। উজীরপুরার সিংহ (রায়) মহাশয়গণ তাঁহার সন্তান সন্ততি।

† চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লেখকগণ এই ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারাও রাম-চন্দ্রের বিশ্বাস ঘাতকতা ও কাপুরুষোচিত ব্যবহার গোপন করিতে পারেন নাই। ডাক্তার ওয়াইজ ইহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"He (Ram Chandra) immediately ordered his war-boats to be got ready and his followers to be armed. The fleet crossed Megna and anchored off Bhaluah. Lakhan Manik, not suspecting any treachery, went on board to welcome his neighbour without any guard. He was at once seized and carried off to Chandradip.

(*J. A. S. B. Vol. XLIII, part 1. p. 204.*)

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলরাম রায় ভুলুয়ার রাজদণ্ড ধারণ করেন। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ অমরমাণিক্য ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজা বলরাম তৎকালে চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে রাজটীকা প্রদান করত নজর ও করদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। এজন্য অমরমাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ ও জয় করিয়া বলরাম হইতে কর গ্রহণ করেন।

১৬৬১খৃষ্টাব্দে "টেরছেলিং" নামক ওলন্দাজদিগের একখানি অর্ণবপোত ভুলুয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রতটে ঝড়ের দ্বারা বারংবার আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। চার্লস ডোবেল প্রভৃতি আট জন নাবিক তৎকালে বহুকষ্টে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা ভুলুয়াপতির নিকট উপনীত হইলে, তিনি উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রদান পূর্ব্বক একখানি নৌকা দ্বারায় তাহাদিগকে ঢাকায় প্রেরণ করেন।* ইহা নিতান্ত

* They were at length brought to their lodging, and, by the prince's order, served with an excellent kind of meat called *brensie,* which is only seen here at great men's tables. This was such a nourishing food, that in three or four days they recovered their full strength. In a day or two after, the prince sent them word that they might go where they pleased, the barques being ready. This being their desire they parted an hour after, and happily arrived at Decka. (*Tales of Shipwrecks and Adventures at Sea. p. 705.*)

দুঃখের বিষয় যে নাবিকগণ ভুলুয়াপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। কেবল মাত্র "বোলোয়ার প্রিন্স" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বংশ বিস্তৃতির সহিত ভুলুয়া রাজ্য খণ্ড খণ্ড হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল। আকবরের পূর্ব্বেই এই রাজ্য তিনঅংশে বিভক্ত হয়; তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে (১১৩৫ বঙ্গাব্দে) ভুলুয়া রাজ্য ১৪টী জমিদারীতে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার তালিকা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। এরূপ বিভক্ত হইবার কারণ আমরা এবম্প্রকার স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছি।

১। মগ ও মুসলমানদিগের সহিত কলহ করিয়া ত্রিপুরেশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, সুতরাং ভুলুয়াপতি হইতে কর গ্রহণ করিতে তাঁহারা অপারগ হইলেন। তৎপরিবর্ত্তে ভুলুয়াপতিগণ সম্পূর্ণরূপে মোগলদিগের অধীনস্থ জমিদার হইলেন।

২। মগ ও পর্ত্তুগিজ বোম্বাটীয়াদিগের হস্ত হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য মোগলগণ ভুলুয়ায় কয়েক জন মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করিলেন। তদতিরিক্ত ভুলুয়ায় একটি সেনানিবাস (বা "থানা") স্থাপিত হইল। তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য রাজস্ব ও ভূমি দ্বারা জায়গীর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সালে

মহালের নাম।	জমিদারের নাম।	জমিদারির সংখ্যা।	মহালের সংখ্যা।	খালসা জমা।	জায়গীর জমা।	মোট রাজস্ব।
ভুলুয়া।	রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ।	৩	১	১৪২৭১	২৬৮৯১	৪১১৬২
জুগাদিয়া।	রঘুরাম প্রভৃতি।	৩	১	——	১৬৯৮৪	১৬৯৮৪
দাঁদরা ও এলাহাবাদ	মহাম্মদ আরিরত প্রভৃতি।	২	২	২৩৪৮	৫১৩৮	৭৪৮৬
বাবুপুর।	উদয়নারায়ণ চৌধুরী।	১	১	৩৫০	——	৩৫০
গোপালপুর।	সফিলদ্দিন।	২	২	৩১১৬	——	৩১১৬
ওমরাবাদ।	... ...	১	১	২৮৯	——	২৮৯
গোপালপুর মির্জানগর	... ...	১	১	১৪৩	——	১৪৩
সাইস্তানগর	... ...	১	১	৯৯৩	——	৯৯৩
কাঞ্চনপুর।	... ...	১	১	২০৯০	——	২০৯০
		১৫	১১	২৩৬০০	——	৭২৬১৩

রাজা রুদ্ররায়ের পত্নী রাণী শশীমুখীর শাসন কালে নিজ ভুলুয়া রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। শূর বংশের দুইটি কনিষ্ঠ শাখা দুই অংশ ও রাজ বংশের কর্ম্মচারী খিল-পাড়া নিবাসী সিংহ বংশীয় নারায়ণ চৌধুরীগণ একাংশ গ্রহণ করেন। শূর বংশের সেই দুইটি শাখা দত্তপাড়া ও মাইজদীর চৌধুরী বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত হইয়া থাকেন। দত্ত-পাড়ার চৌধুরীগণ অধুনা সামান্য তালুকদার মাত্র। কিন্তু তাহাদের গুহ বংশীয় দেওয়ানের বংশধরগণ অধুনা অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয় যে চন্দ্রদ্বীপের রাজলক্ষ্মীর ন্যায় ভুলুয়া রাজলক্ষ্মী মুদি বংশের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আংশিক ভাবে দেওয়ান বংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গুহবংশীয়গণ অধুনা দত্তপাড়ার দেওয়ানজী বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, দেওয়ান মহাশয়গণ দরিদ্র প্রভু বংশের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ইহা আধুনিক বাঙ্গালি চরিত্রের বিপরীত এবং তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক। মাইজদীর চৌধুরী ও খিলপাড়ার সিংহ নারায়ণ চৌধুরীগণের উত্তর পুরুষগণও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। বিক্রমপুর তারপাসা নিবাসী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পূর্ব্ব-পুরুষ রাণী শশীমুখীর অধীনে কার্য্য করিয়া প্রচুর সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ভুলুয়ার নিকট সমুদ্রগর্ভে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি "চর" বা দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের স্রোত প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা এই সকল দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। ব্লেব ও বানডিন ব্রোকের মানচিত্রের সহিত মেজর রেনল কৃত এবং আধুনিক মানচিত্র যুগপৎ দৃষ্টি করিলে প্রতীত হইবে যে, এই সকল দ্বীপ অতি আশ্চর্য্যভাবে আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি দ্বীপ স্রোত প্রবাহিতকর্দ্দমরাশী দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এক একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ গঠিত হইয়াছে। প্রবল স্রোত বেগে কোন দ্বীপের একদিক ভাঙ্গিয়া গেলেও অন্যদিকে তাহার আয়তন আশ্চর্য্য রূপে বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান হাতীয়া দ্বীপ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহার একদিক ভাঙ্গিয়া গিয়া বিপরীত দিকে নল চিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া সমুদ্রের দিকে আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। জেলা নওয়াখালীর অন্তর্গত দ্বীপ সমূহের মধ্যে সনদ্বীপ, সিদ্ধি এবং হাতিয়াই প্রধান। তদ্ব্যতীত আরও ২৮টি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ভুলুয়ার সমতল ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে।

তুড়রমল্লের ওয়াশীল তোমর জমাতে কেবলমাত্র সন্দ্বীপের নাম দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ভুলুয়া ও তদন্তর্গত অন্যান্য মহালের ন্যায় ইহা সরকার সুবর্ণগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তাহাতে উক্ত দ্বীপ সরকার ফতেয়াবাদের অধীন

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাহার রাজস্ব ২৯৫৬১।০ আনা লিখিত আছে। আধুনিক দুর্দ্দান্ত জমিদারগণের দুশ্চরিত্র নায়েবগণের ন্যায় রাজা তুড়রমল্ল কাগজপত্রে আকবরের রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন, বস্তুতপক্ষে আওরংজেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মোগল সম্রাটগণ সনদ্বীপের রাজস্ব এক কপর্দ্দকও ভোগ করিতে পারেন নাই। এই দ্বীপের আধিপত্য লইয়া হিন্দু, মগ, পর্ত্তুগিজ ও মুসলমানগণ নররুধিরে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি অবিশ্রান্ত রঞ্জিত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করি না। বাঙ্গালী জাতির জল রণ-নৈপুণ্য খ্যাতি প্রাচীন জগতে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। ১৫২৪ শকাব্দে শ্রীপুরপতি কায়স্থ কুলতিলক বীরচূড়ামণি কেদার রায় দ্বারা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় সেই প্রাচীন গৌরবজ্যোতি শেষবার বিকীর্ণ হইয়াছিল। মগদিগের ভুজ গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া—বঙ্গোপসাগরে বিজয়ীপতাকা উড্ডীন করিয়া—সেই প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গকুল-চূড় কেদার রায় ১৫২৪ শকাব্দে সনদ্বীপ অধিকার করেন। জগতের ইতিহাসে আমরা জীবন্মৃত, এজন্যই আমরা আমাদের শেষ নেলসনের নামটীও বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইতে প্রস্তুত হইয়াছি।

১৫৮৮ শকাব্দে (১১জুমদা ১০৭৬হিঃ সালে) সনদ্বীপ স্থায়িরূপে মোগল সম্রাটদিগের করতলস্থ হইয়াছিল। ১১৩৫ সালের

রাজস্বের হিসাবে সনদ্বীপের রাজস্ব ৫৪৬৯৬ টাকা লিখিত।

১১৭০ সালের জমাবন্দীতে ভুলুয়া ও তদন্তর্গত মহাল সমূহের রাজস্ব নিম্নলিখিতরূপে লিখিত আছেঃ—

ভুলুয়া	১৩৫৯৮২
জুগীদিয়া	১৭৭৩৭
দাঁদরা ও এলাহাবাদ	৪৮৬১৮
বাবুপুর	১২১৮৪
গোপালপুর	১৫৮৮৯
সনদ্বীপ	১০৮৪৭০

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহালগুলির রাজস্ব এ প্রকার অতিরিক্ত রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দেশীয় বস্ত্রের বাণিজ্য জন্য জুগীদিয়া কল্যানদী এবং লক্ষ্মীপুরে তিনটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ভুলুয়া, ঢাকা-জেলালপুরের অধীন ছিল। তদনন্তর ত্রিপুরা জেলা সৃষ্টি হইলে সমগ্র ভুলুয়া তাহার অধীন হইয়াছিল, কেবল মাত্র সনদ্বীপ প্রভৃতি চরগুলি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লবণ প্রস্তুত জন্য ভুলুয়ায় একজন এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ভুলুয়ার প্রস্তুতি লবণ চট্টগ্রামে প্রেরিত হইত।

এই সময় ভুলুয়া বাসীগণ ডাকাইত দিগের অত্যাচারে হৃত সর্ব্বস্ব হইতেছিল। সেই উপদ্রব নিবারণের জন্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সনদ্বীপ, হাতীয়া প্রভৃতি দ্বীপ এবং ত্রিপুরা জেলার অধীন থানে সুধারাম ও বেগমগঞ্জ, বামনী ফাঁরি দ্বারা নওয়াখালী নামক একটি ক্ষুদ্র জেলা সৃষ্ট হয়। এই জেলার ফৌজদারী সংক্রান্ত শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনৈক ইংরেজ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্প কাল অন্তে জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত রামগঞ্জ ও আমিরগাঁও এবং বাখরগঞ্জের অধীন (থানা চানদীয়া ও ধনিয়ামনিয়া ফাঁরি) দক্ষিনসাবাজপুর-দ্বারা এই ক্ষুদ্র জেলার অঙ্গ পুষ্টি করা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বীপ সমূহ ব্যতীত সমগ্র নওয়াখালীর রাজস্ব ও দেওয়ানী বিভাগ তখনও ত্রিপুরা জেলার অধীনে ছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লবণের এজেণ্টকে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। সম্ভবত ১৮৩০ সালে নওয়াখালীর জন্য একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর নিযুক্ত হন। তদনন্তর ধংকালে মাজেষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা একজন রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হয়, তৎকালে নওয়াখালীজেলা অপেক্ষাকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেওয়ানী ও ছেসন সম্বন্ধে সেই সময়েও ইহা ত্রিপুরার অধীন ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নওয়াখালীতে স্বতন্ত্র সিবিল ও ছেসন জজ নিযুক্ত হয়। তৎকালে ত্রিপুরার অন্তর্গত ছাগল-

নাইয়া ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত মীরেশ্বরী থানা এই জেলার সহিত সংযুক্ত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে (১৮৭৫) খৃষ্টাব্দে চানদীয়া ও ধনিয়া মনিয়া পুনর্ব্বার বাখরগঞ্জের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল অন্তে মীরেশ্বরী থানা চট্টগ্রাম জেলা ভূক্ত হইল। সুতরাং এক্ষণ আমরা দেখিতেছি যে, একটী জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটী জেলা সৃষ্টি করা হইয়াছে। একটী ত্রিপুরা অন্যটী নওয়াখালী। কারণ নওয়াখালীর অঙ্গপুষ্টির জন্য বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রাম হইতে যে সকল স্থান গৃহীত হইয়াছিল, তৎসমস্তই পুনর্ব্বার সেই সেই জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। কেবল মাত্র রাজ কর্ম্মচারিগণের বিষম যন্ত্রনাদায়ক উপসর্গস্বরূপ কয়টী দ্বীপ জেলা নওয়াখালীর অঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে।

অধুনা নওয়াখালী জেলার পরিমাণ ১৬৪৪ বর্গমাইল। এই জেলায় ১০০৯৬৯৩ জন লোকের বাস। এই জেলা দুইটী মহকুমায় বিভক্ত যথা সদর ও ফেণী। বলা বাহুল্য যে ফেণী নামক নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া শেষোক্ত মহকুমাটী ফেণী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

জেলা নওয়াখালীর অন্তর্গত ভূমি, গবর্ণমেন্টের খাস মহাল ব্যতীত, নিম্ন লিখিত শ্রেষ্ঠ, মধ্যে ও অধীন স্বত্বে বিভক্ত।

(ক) শ্রেষ্ঠ স্বত্ব :— (খেরাজ বা সকর ভূমি)

১। জমিদারী। ১০সালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে

২। খারিজা তালুক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারগণ দ্বিবিধ উপায়ে এই সকল তালুকের সূত্রপাত করেন। (১) সেলামী কিম্বা অন্যরূপ উপকার প্রত্যাশায় জমিদারগণ পাট্টাদ্বারা যে সকল তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাকে পাট্টাই তালুক বলিত। (২) রাজস্বের জন্য একটী নির্দ্ধারিত জমা অবধারণ পূর্ব্বক জমিদারগণ তাঁহাদের বৃহৎ জমিদারীর ক্ষুদ্র অংশ বিক্রয় করিয়া প্রকৃত খারিজা তালুকের মূল ভিত্তি সংস্থাপন করেন। যদিচ রাজকর পরিশোধ জন্য জমিদারগণ তালুকদারবর্গের মারফতদার মাত্র ছিলেন। তত্রাচ তাঁহাদের প্রতি জমিদারগণ নানা প্রকার অত্যাচার করিতে বিরত ছিলেন না। পরম কারুণিক লর্ড কর্ণয়ালিসের মন্তব্য লিপি * প্রচারিত হইলে ইঁহারা সকলেই জমিদারের অধীনতা শৃঙ্খল ছেদন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের আবেদন অনুসারে এই শ্রেণীর তালুক সমস্তই খারিজ হইয়া গেল। তালুকদারগণ জমিদারদিগের ন্যায় তাঁহাদের তালুকের রাজস্ব রাজকীয় ধনাগারে অর্পণ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি এই সকল তালুক খারিজ বা স্বাধীন তালুক আখ্যাদ্বারা আখ্যাত হইতেছে। নওয়াখালী জেলার মধ্যে এইরূপ অবিভক্ত তালুকের সংখ্যা ৭৪০ এবং বিভক্ত তালুকের সংখ্য; ৭১৪ হইবে।

* এই মন্তব্য লিপির বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

(খ) শ্রেষ্ঠস্বত্ব ঃ—লাখেরাজ বা নিষ্কর ।

এই সকল নিষ্কর চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ।

১। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত লাখেরাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এই লাখেরাজ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার সংখ্যা ১টী মাত্র।

২। বাদসাহি লাখেরাজ। (১) আয়মা, (২) মদদমাস। ইহার বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইবে।

৩। সিদ্ধনিষ্কর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে জমিদারগণের প্রদত্ত নানা প্রকার নিষ্কর।

৪। খোসবাস। মগদিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৪০০ মোগল সৈন্য ভুলুয়াতে স্থাপিত হয়। ইহারা প্রথমত ভুলুয়ার ওয়াদাদার হইতে বেতন প্রাপ্ত হইত। পশ্চাৎ বাঙ্গালার নবাব তাহাদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে ৪০ দ্রোণ ভূমি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। সৈন্যগণ খরিদ করিয়া ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। নবাবী সনন্দ দ্বারা সেই সকল ভূমি খোসবাস ভুক্ত হইয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই সকল ভূমির কোনরূপ কর ধার্য্য হয় নাই। বোর্ডের অনুমতিমতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর এই ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাহার জরিপ জমাবন্দী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩৬টি খোসবাস মহালের মালিক দশ বৎসরের রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে

সেলামী প্রদান পূর্ব্বক লাখেরাজ স্বত্ব স্থির রাখিয়াছিলেন।

মধ্যস্বত্ব :—

(ক) খেরাজ বা সকর।

১। অধীন তালুক —যাহার খাজানা জমিদারকে প্রদান করিতে হয়। এই তালুক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(ক) চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী। লিখিত চুক্তি পত্রের দ্বারা এই সকল তালুকের মালিকগণ খারিজের অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ জমিদারগণও এই সকল তালুকদার হইতে নির্দ্ধারিত কর ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। (খ) পত্তনী তালুক, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনের মর্ম্মানুসারে নির্দ্ধারিত করে এই সকল তালুক সৃষ্টি হইয়াছে।

২। পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিম্বা পরে প্রধানত পতিত ভূমি আবাদ দ্বারা এই সকল তালুক সৃষ্টি হইয়াছিল। জমিদারগণ এক পাট্টা প্রদান পূর্ব্বক আপন গৃহে সুখে নিদ্রা গিয়াছেন, আর তালুকদারগণ আপন আপন শরীরের রক্ত জল ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই সকল তালুকের আবাদ ও উন্নতি করিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় তালুক-দারগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছিল। [illegible] নল দ্বারা অধীন স্বত্বাধিকারীদিগের ভূমির পরিমাপ করা [illegible] এই সকল তালুকের ভূমি তদপেক্ষা বৃহৎ নলে পরিমাপ হইত এবং আবাদি ভূমির পঞ্চমাংশ তালুকদারগণ "জীবিকা" বা

'মথন' বলিয়া বাদ পাইতেন।"* কিন্তু আধুনিক জমিদারগণ তাহাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই সকল তালুকদারের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে বিরত হইতেছেন না। এই শ্রেণীর তালুকের বিবরণ পশ্চাৎ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইবে।

৩। তপা। ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান তালুকের ন্যায়। নওয়াখালী জেলার মধ্যে ৩০টির অধিক তপা হইবে না।

৪। নম্বরীয়ান। গবর্ণমেণ্টের খাস মহালের অন্তর্গত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত জমায় তালুকের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সকল জমিদারী গবর্ণমেণ্টের খাস হইলে নম্বর অর্থাৎ সংখ্যা দ্বারা এই সকল মহালের তালিকা প্রস্তুত হয়, এজন্য ইহা নম্বরীয়ান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। নওয়াখালী জেলার মধ্যে এই রূপ নম্বরী মহালের সংখ্যা ১৫টির অধিক হইবে না।

৫। দর-পত্তনি। পত্তনি তালুকের মালিকগণ নির্দ্ধারিত জমায় অন্যকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

৬। ওসত-তালুক। খারিজা বা স্বাধীন তালুকদার

* *Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. VI. page 305.*

এবং অধীন তালুকদারগণ দরপত্তনির ন্যায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। পত্তনি তালুকের বিধি অনুসারে এই সকল তালুক রাজস্বের জন্য সরাসরিতে নিলাম হইতে পারে। এই তালুকের সংখ্যা ১০০০ সহস্র হইবে।

৭। সিকিমি-তালুক। এইগুলি প্রায় ওসত-তালুকের ন্যায় ইহার সংখ্যা প্রায় ৩০০০ সহস্র হইবে।

৮। দরসিকিমি। সিকিমি তালুকদার তাঁহাদের অধীনে এই সকল তালুক সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। জঙ্গলবুরি-তালুক। চর ভূমিতে আবাদের জন্য এই সকল তালুক সৃষ্টি হইয়াছে।

১০। হাওলা। পতিত ভূমি আবাদ করিবার জন্য ভূম্যধিকারিগণ দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে যে অধিকার প্রদত্ত হইত তাহাকে হাওলা বলিত। হাওলাদার স্বয়ং এবং প্রজার সাহায্যে ভূমি আবাদ করিয়া কমিসন স্বরূপ লভ্যের অধিকারী হইতেন। প্রথম অবস্থায় হাওলা, রায়তী স্বত্বের ন্যায় সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইহা তালুকের শ্রেণীতে পরিগণিত হইতেছে। হাওলার অধীনে ক্রমে নিমহাওলা, ওসতহাওলা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া ইহাকে মধ্য স্বত্বে সংস্থাপন করিয়াছে। হণ্টার সাহেব চট্টগ্রামের নওয়াবাদ তালুকের সহিত নওয়াখালীর হাওলা মহালের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন।

১১। জিম্বা। ইহার সাধারণ অর্থ এইরূপ যে, নিব্যূঢ় স্বত্ব বিহীন ভূমি। কোন জমিদারী কিম্বা তালুক বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে নূতন ক্রেতা তাঁহার অধীন ভূম্যধিকারীকে কোনরূপ তালুকদার বর্ণনা না করিয়া তাহা হইতে কর গ্রহণ পূর্ব্বক ভবিষ্যতে বিরোধের পন্থা পরিষ্কার রাখিবার জন্য "জিম্বা" উল্লেখে দাখিলা প্রদান করেন। ইহা একটি আশ্চর্য্য কৌশল বটে। এইরূপে নওয়াখালীতে জিম্বা ও জিম্বাদার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

(খ) মধ্যস্বত্ব:—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

১। দেবোত্তর। ২। ব্রহ্মোত্তর। ৩। মহত্তরান। ৪। খয়রাতী। ৫। চাকরান।	এই সকল ভূমির বিবরণ পশ্চাৎ বিশেষ ভাবে লিখিত হইবে।

অধীনস্বত্ব:—

১। মসকুরী রায়তী। ইহাকে কায়েমী রায়তী বলা যাইতে পারে। যথেচ্ছা ভোগ ও বিনিয়োগের অধিকার রায়তগণ মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

২। রায়তী খোদকাস্ত,—এই সকল রায়তী ভূমির খাজানা বৃদ্ধির অধিকার ভূম্যধিকারীর আছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই খোদকাস্ত রায়তগণ রায়তী স্বত্বের ভূমি খরিদ বিক্রী করিয়া আসিতেছে।

৩। ওসত-রায়তী—রায়তের অধীন খোদকাস্ত রায়তী।

৪। নিম-ওসত-রায়তী—ওসত-রায়তের অধীন তদ্রূপ স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী ভূমি।

৫। চান্দীয়া-রায়তী—হাট বাজারের ভিটী ভূমি।

৬। ওসত-চান্দীয়া-রায়তী—চান্দীয়া-রায়তীর অধীন তদ্রূপ স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তী ভূমি।

৭। জোত—প্রকৃত কৃষক সম্প্রদায়ের কৃষির ভূমিকেই জোত বলে।

বাস্ত ভূমি ব্যতীত কর নির্ণয় জন্য নওয়াখালী জেলার ভূমিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১—ধানী। ২—বাগান। ধানী জমির নিরেখ কাণী প্রতি ৫।৬ টাকার ন্যূন নহে। বাগান কাণী প্রতি ৮।১০ টাকা জমা।

নওয়াখালী জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, সুপারি ও নারিকেল। *

---

* সম্প্রতি সুপারি বৃক্ষের যেরূপ মরক উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কোনরূপ প্রতিকার না হইলে নওয়াখালী বাসীগণ নিতান্ত কষ্টে পতিত হইবে। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরা বৎসর অন্যূন শতাবধি টাকার সুপারি বিক্রয় করিয়া থাকে। বার্ষিক ৪।৫ হাজার টাকার সুপারি বিক্রয় করিয়া থাকেন, এরূপ লোক নিতান্ত বিরল নহে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত চাকলে রোসনাবাদের কিয়দংশ জেলা নওয়াখালীর অধীন হইয়াছে।

এই জেলা নিম্নলিখিত পরগণা ও মহালে বিভক্ত।

পরগণা বা মহালের নাম।	ভূমির পরিমাণ একর	ভূমির পরিমাণ বর্গমাইল	মহালের সংখ্যা।	রাজস্ব।
১ এলাহাবাদ	৫২৩০	৮·১৭	২	২০৮২
২ আমিরাবাদ	১০৮৯৭	১৭·০৩	১০	৭৬১৯
৩ অশ্বদিয়া চাকলা	৪৬৬৪	৭·২৮	১০৬	৩০০৬
৪ বাবুপুর	২৩৮৯৩	৩৭·৩৪	৯	১৫০৩৪
৫ বাঙ্কানগরচাকলা	২৩৩৭	৩·৬৫	৩	৪৪১৮
৬ ভুলুয়া	২৪৫৮৩৩	৩৮৪·১২	১৮১	১১৩৩০৯
৭ দান্দরা	২১৮৩৬	৩৪·১২	৩১	১৫৬৮৮
৮ ঘোষবাগ চাকলা	১৯৬১	৩·০৬	১৮	১৫১৮
৯ গোপালপুর মির্জ্জানগর	২৭২৭৯	৪২·৬২	৪	২৩২৭৬
১০ জয়নগর তপা	২৯৮০৫	৪৬·৫৭	২	১০১৪৩
১১ জুগীদিয়া	৪৩১১৭	৬৭·৩৭	৫	২৯৬৬১
১২ কাদবা, বেদরাবাদ, আম্মিরাবাদ	৬৫১৩০	১০১·৭৭	৫	৪৬১৭
১৩ কাঞ্চনপুর	৯৪৮৭	১৪·৮২	৯০	৬৩৪৭
১৪ লক্ষ্মীপুর মৌজা	১৩৩৩৯	২০·৮৪	৪	১০৮৫৯
১৫ অমরাবাদ	৭৯৬১৭	১২৪·৪০	৯৬৪	৭৯১২০
১৬ রামচন্দ্রপুর তপা	৪৮০৬	৭·৫১	৪৪	৪৮০৩

পরগণা বা মহালের নাম।	ভূমির পরিমাণ একর	ভূমির পরিমাণ বর্গমাইল	মহালের সংখ্যা	রাজস্ব
১৭ সনদ্বীপ	২৬৭৩০৪	৪১৭·৬৬	৭৩	১০৪৩১৫
১৮ সাইস্থানগর	২০৮৬৯			৬২৭৫
১৯ সমশেরাবাদ	৫৩২	০·৮৩		৫১৭
২০ দ্বীপ সমূহ (জজিরা)	১০৭২৪২	১৬৭·৫৬	৫৮	৮৮৩৭২
২১ হাতিয়া চাকলা	৪৭৩৬৬	৭৪·০১		২৯৯৭৮
২২ পং জজিরা (জমিদারি)	১০৭০৪	১৬·৭২		
২৩ বামনি চাকলা	৩৮৭৫৮	৬০·৫৫	১৩	১২৩২৮
২৪ টেরা	৪৭১	০·৭৩	৯	৫৬৭
২৫ জোয়ারলক্ষ্মণপুর	৪৪৬	০·৬৯	১	১১৭
২৬ ভাটরা জোয়ার	১০৫২	১·৬৪	১	৩৮২
২৭ মহবতপুর	১৯০	০·২৯	৩	৮২
২৮ গোমনাবাদ	৪০৭	০·৬৩	৫	১৬৬
২৯ ফরকাবাদ তপা	৪৯৭	০·৭৭	১	২০৩
৩০ সিংহের গাঁও	১২৮	০·২		১১০
৩১ চাকলে রোসনাবাদ (দক্ষিণাংশ)	৭৯৫০১	১২৩·২৬		
৩২ দক্ষিণশিক	৭১			

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জেলা ত্রিপুরা।

জেলা ত্রিপুরার সৃষ্টি কাল হইতে ইহার পরিমাণ ও সীমা অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিধাতা যেরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমাদের বিধাতৃ-পুরুষ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও এ বিষয় লইয়া তদ্রূপ অবিশ্রান্ত ক্রীড়া করিতেছেন; সেই সকল প্রাচীন কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধুনা ত্রিপুরা জেলা ২৩°০′ এবং ২৪°১৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৬′ এবং ৯১°৩৯′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ২৪৯১ বর্গ মাইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে ইহার অধিবাসী সংখ্যা ১৭৮২৯৩৫ নির্ণীত হইয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্বদিকে ত্রিপুরা (পার্ব্বত্য) রাজ্য। উত্তরে জেলা শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ। পশ্চিমে মেঘনাদ নদ এই জেলাকে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ও বাখরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দক্ষিণে নওয়াখালী জেলা। কিন্তু নওয়াখালীকে ত্রিপুরা জেলার একাংশ মনে করিলে এই জেলার দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং এই জন্য কবি চূড়ামণি কালিদাস ত্রিপুরাকে "তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল,

গুবাক জাতীয় পাদপ শ্রেণী অদ্যাপি সেই প্রাচীন কবির বর্ণনার সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।

জেলা ত্রিপুরা একটি সমতল ক্ষেত্র। ত্রিপুরা পর্ব্বতের পদমূল হইতে মৃত্তিকা ক্রমে পশ্চিমদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এক মাত্র লালময়ী ময়নামতী ব্যতীত ইহাতে কোন পর্ব্বত বা উচ্চ ভূমি নাই। জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে পর্ব্বতের প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণ রঞ্জিত উচ্চ ভূমি এবং পশ্চিমে মেঘনাদনদের স্রোত প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা গঠিত নবীন "চর"সকল. নবাগত ব্যক্তি দিগের নয়নে দুইটি প্রাকৃত দৃশ্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকের ভূমি. নিম্ন ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশিষ্ট. আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরা জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ দর্শনে বোধ হয় এইস্থানে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল * নদী স্রোতে প্রবাহিত কর্দ্দমরাশি দ্বারা সেই হ্রদ ক্রমে শুষ্ক হইয়া অসংখ্য বিল সৃষ্টি করিয়াছে। বিলের কান্দী গুলিতে মনুষ্যের বাস হইয়াছে। বর্ষার জল প্লাবনে যখন সরাইল. নুরনগর প্রভৃতি পরগণা ভাসিয়া যায়, তৎকালে গ্রামগুলিকে তরুরাজি শোভিত এক একটি দ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। বর্ষার সময় (আষাঢ়ের শেষ ভাগ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত)

* ২৮৬ পৃষ্ঠ. দ্রষ্টব্য।

সরাইল ও নুরনগর পরগণার অধিকাংশ ভূমি জলে নিমজ্জিত থাকে।

ত্রিপুরার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া মেঘনাদ (মেঘনা) নদ প্রবাহিত হইতেছে। ইহার একটি প্রধান শাখা তিতাস পরিচিত। তিতাস নদী গোয়ালনগরের নিকট মেঘনাদ হইতে বহির্গত হইয়া সরাইল পরগণা প্রদক্ষিণ করত লাল-পুরের নিকট মেঘনাদে পতিত হইতেছে। ত্রিপুরার পর্ব্বতজাত হাওড়া, লোহুর প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী তিতাসকে করদান করিতেছে। তিতাসের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯২ মাইল হইবে। ত্রিপুরা পর্ব্বত জাত গোমতী, ডাকাতীয়া প্রভৃতি নদীগুলি মেঘনাদে পতিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদ নদীর মধ্যে ডাকাতীয়ার দৈর্ঘ্য সর্ব্বাধিক, তাহা ১৫০ মাইলের ন্যূন হইবে না। এই নদী সুগাগাজির নিকট ত্রিপুরা জেলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং চাঁদপুরের নিকট মেঘনাদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে লাল-মযী-ময়নামতী পর্ব্বত অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল। ইহার পরিধি ২১ মাইল। এই পর্ব্বত সমতল ক্ষেত্র হইতে গড়ে ৪০ ফিট উচ্চ। কিন্তু ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ প্রায় ১০০ ফিট উচ্চ হইবে। অধুনা এই পর্ব্বতটি জঙ্গলাবৃত,

কিন্তু প্রাচীনকালে এই পর্ব্বতে মনুষ্যের বাস ছিল; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে "কালীর বাজার রাস্তা" প্রস্তুত কালে পর্ব্বত শিখরে একটি সুন্দর দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই দুর্গের পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর দেবমূর্ত্তিসকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে রণবঙ্কমল্লের তাম্র শাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাহাও এই পর্ব্বত মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ-মেজেষ্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব তৎকালে সেই তাম্র শাসন কলিকাতার এসিয়াটিক সুসাইটীতে প্রেরণ করেন।

এই পর্ব্বতটি ত্রিপুরার মহারাজ তাঁহার স্বাধীন রাজ্যের একাংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোন কোন ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষও এরূপ লিখিয়াছেন।* অল্পকাল হইল গবর্ণমেণ্টের সহিত এই পর্ব্বত লইয়া মহারাজের একটী বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট ২১০০ হাজার টাকা সেলামী গ্রহণে লালময়ী পর্ব্বতটি লাখেরাজ স্বরূপ মহারাজকে দান করেন কিন্তু ময়নামতী শৃঙ্গটী ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাহার পত্নীর নাম ময়নামতী

---

* *Sutherland's "Tipperah."*

এবং কন্যার নাম লালময়ী ছিল, তদনুসারে এই পর্ব্বত লালময়ী ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।*

প্রাচীন কালে ত্রিপুরা রাজ্য পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং আধুনিক ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ তৎকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন লক্ষ্মণাবতী (গৌড়ের) বিদ্রোহী "মালীক" (গবর্ণর) সুলতান মগিসুদ্দিন তুগ্রল সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য নহে।† প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাজপাট সুবর্ণগ্রামে স্থাপিত হওয়ার পর তাহারা ত্রিপুরা অক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদিগের বিবেচনায় সুলতান মগিসুদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়াসাহ সর্ব্বপ্রথম (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। সে সময় হইতে সমতলক্ষেত্র মুসলমান রাজ্য ভুক্ত হওয়ার সূত্রপাত হয়। ক্রমে পাঠান সুলতানগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকারের জন্য যত্ন-করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ লক্ষ্মণসেনের ন্যায় কাপুরুষোচিত ব্যবহার করেন নাই। তাহারা যে কেবল হৃত

---

* রাজাগোপী চাঁদের গীত আমরা বাল্য কালে বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

† ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অংশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন এমত নহে, সুযোগ মতে তাঁহারাও পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করত পাঠানদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

রাজা তুড়রমল্লের কৃত ওয়াশীল তুমরজমাতে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের অধিকাংশ ভুক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওয়াশীল তুমরজমায় সীমান্তস্থিত যেসমস্ত মহালের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে সম্রাট আকবর তাহার করগ্রাহী ছিলেন না। কিন্তু বিখ্যাত পাঠান সম্রাট সেরসাহ যে এই সকল স্থান কিছুকালের জন্য করতলস্থ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে, কারণ সীমান্তস্থিত মহাল সমূহের জন্য তুড়রমল্ল সেরসাহের ওয়াশীল তুমরজমার নকল নবিস মাত্র। মুসলমানগণ তিন দিক হইতে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। এজন্যই ওয়াশীল তুমরজমায় সরকার সুবর্ণগ্রাম, সরকার শিলহট্ট (শ্রীহট্ট) ও সরকার চট্টগ্রামের অন্তর্গত মহাল সমূহের তালিকার মধ্যে ত্রিপুরার কোন কোন অংশ সংযোজিত দৃষ্ট হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে সরকার শিলহট্ট ও সরকার চট্টগ্রাম ও ভুলুয়ার অন্তর্গত মহাল সমূহের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য মহালের নামের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল।

সরকার সুবর্ণগ্রাম :—

১। উত্তর সাহাপুর। রাজস্ব ৯৬১ টাকা ২ দাম।

২। বলদাখাল। রাজস্ব ১৭৩৫২।০ টাকা। এই পরগণার আধুনিক সংশোধিত নাম "বরদাখ্যাত"। রাজা তুড়রমল্ল যৎকালে ওয়াশীল তুমরজমা প্রস্তুত করেন সেই সময় বলদাখাল খিজিরপুরের (সুবর্ণগ্রামের) সুবিখ্যাত ভৌমিক ইশা খাঁ মছনদে আলীর অধিকার ভুক্ত ছিল।*

* অযোধ্যা প্রদেশবাসী কালিদাস গজদানি নামক রাজপুত যুবা হুসনসাহের রাজত্বকালে তাহার এক যুবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তৎকালে কালিদাস "সুলেমান খাঁ" আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেই রাজকুমারীর গর্ভে কালিদাসের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্র দ্বয়ের নাম ইশা, ইসমাইল এবং কন্যার নাম সাহেনসা বিবি। ছলিম খাঁ ও তাজখাঁর সহিত যুদ্ধে কালিদাস নিহত হন। তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয় শত্রু হস্তে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুগণ দাস স্বরূপ তাঁহাদিগকে বিক্রয় করে। তাঁহাদের মাতুল কুতুবদ্দিন বিশেষ কষ্ট ও যত্ন করত তুরাণ হইতে কালিদাসের পুত্রদ্বয়কে উদ্ধার করেন। ইশা খাঁ স্বীয় মাতুল কন্যা ফতেমা খাতুনের পাণি গ্রহণ করেন।

গৌড়েশ্বর দাউদ আকবরের সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইলে তাঁহার ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়া করিমদাদ, ইব্রাহিম ও ইশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। তাঁহারা বঙ্গীয় বিখ্যাত সামন্ত নরপতি (জমিদার) গণের সাহায্যে আকবর সাহের সেনাপতিগণকে দীর্ঘকাল বাঙ্গালায় বিজয়ী পতাকা সংরোপিত করিতে দেন নাই। ইশা খাঁ সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী খিজির পুরে বাস করিয়া মোগল সৈন্যের সহিত অবিশ্রান্ত

৩। বোয়ালীয়া। রাজস্ব ৫৯৩৩ টাকা।

৪। পুরচণ্ডী। রাজস্ব ৩০০২৷৷০ টাকা। *

৫। পাইটকাড়া। রাজস্ব ১০২ টাকা। এই পাইট-কাড়ার কথা আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি।

আহবেলিপ্ত ছিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ বণিক ও ভ্রমণকারী রল্‌ফ ফিচ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিখিয়াছিলেন (the Chief king of all these countries is called Isacan, and he is the Chief of all the other kings, and is a great friend of the Christians.) "এই সকল দেশের প্রধান রাজার নাম ইশা খাঁ, তিনি অন্যান্য নরপতিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খৃষ্টানদিগের পরম বন্ধু।" ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক যাহাঁকে স্বাধীন রাজা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তুড়রমল্ল কিরূপে সেই রাজার অধিকৃত প্রদেশ আকবরের রাজস্বের হিসাবে ভুক্ত করিলেন পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

* কায়স্থ কুল জাত দে বংশীয় পুরন্দর রায় ইহার আদি জমিদার। চণ্ডীপ্রসাদ রায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই দুই ভ্রাতার নামে এই পরগণা পুরচণ্ডী আখ্যা প্রাপ্ত হয় শ্রীপুরপতি কেদার রায় পুরন্দরের কন্যা বিবাহ করিবার জন্য যত্নবান হন। এজন্য পুরন্দর ও চণ্ডীপ্রসাদ শ্রীপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেঘনাদের পূর্ব্ব তীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পরগণা উত্তরকালে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পুরন্দরের সন্তানগণ ৷৷/ ও চণ্ডীপ্রসাদের সন্তানগণ ৷৶ আনা প্রাপ্ত হন।

৬। বরদীয়া। রাজস্ব ৯০৭৸০ টাকা ২ দাম।

৭। টুরা। রাজস্ব ২৬২২৸০ টাকা।

৮। চাঁদপুর। রাজস্ব ৩০০০ টাকা। *

৯। দক্ষিণ সাহাপুর। রাজস্ব ৫৯৯৭৸০ টাকা।

১০। রায়পুর। রাজস্ব ১১৩।৵০ আনা।

১১। সিংহেরগাঁও। রাজস্ব ৮৫০৯৶ আনা। †

* তৎকালে চাঁদপুর একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। দিক্‌দেশীয় বণিকগণ এস্থানে বাণিজ্যার্থে সম্মীলিত হইতেন। সেই চাঁদপুর এক্ষণে মেঘনাদের গর্ভে শায়িত রহিয়াছে।

† সিংহ বংশীয়দিগের স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। প্রাচীন কালে সিংহেরগাঁও পরগণার পরিমাণ বর্ত্তমান সময় হইতে অধিক ছিল। আধুনিক মহবৎপুর প্রভৃতি পরগণার অধিকাংশ এই পরগণা হইতে পরিগৃহীত। রাজা মান সিংহ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা। ইনি সম্রাট আকবরের বহু কাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। (ইহাকে কেহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মান সিংহ বিবেচনা করিবেন না) সিংহেরগাঁও রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা মানসিংহের একমাত্র পুত্র, "রাজা শ্রীনাথ লস্কর"। শ্রীনাথের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ কুমার মহেশচন্দ্র, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ রাজা রামচন্দ্র খাঁ, রাজা নিশ্চিন্তচন্দ্র মৌলিক এবং রাজা প্রসন্নচন্দ্র মৌলিক পৈত্রিক রাজ তুল্য তিন অংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ ক্রমে ক্রমে হৃত রাজ্য হইয়াছেন। কিন্তু সাধারণে অদ্যাপি তাঁহারা রাজা আখ্যা দ্বারা আখ্যাত হইয়া থাকেন।

১২। শকদি (শকড়ি)। রাজস্ব ৪৬১১।০ আনা।

১৩। শিরচাল। রাজস্ব ৩২৫ টাকা।

১৪। করদী। রাজস্ব ২২৩১৸০ টাকা। অধুনা এই পরগণা মহব্বৎপুরের কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছে। *

১৫। মেহেরকুল। রাজস্ব ২৫৯৮৬৸০ আনা।

১৬। মেহার। রাজস্ব ১৫২০ টাকা। †

১৭। মহীচাল। রাজস্ব ৬২৫ টাকা।

---

* কর বংশীয় কায়স্থগণ ইহার আদি জমিদার ছিলেন। কর বংশ হইতে ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণ এই পরগণা অধিকার করেন। ক্রমে ইহারাও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। অধুনা করদী মহব্বৎপুর পরগণার অন্তর্গত একটি তপা মাত্র।

† কায়স্থ জাতীয় দাস বংশীয়গণ মেহারের প্রাচীন জমিদার। ইঁহারা "রাজা" উপাধি ধারণ করিতেন। দাস রাজগণের গুরুবংশে প্রাতঃস্মরণীয় ৺সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সিদ্ধ পিঠ অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে স্থানে বসিয়া তিনি পূর্ণানন্দ নামক সেবকের সাহায্যে দশ মহাবিদ্যার দর্শন লাভ করেন, সেই স্থানে অদ্যাপি ভগবতীর পূজা হইয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তি দিবস ছাগ রুধিরে তথায় স্রোত প্রবাহিত হয়। নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রিগণ সর্ব্বদা এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন সর্ব্ববিদ্যার সিদ্ধ পীঠ বলিয়া মেহার শাক্ত সম্প্রদায়ের তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মুসলমানেরাও দেবীর পূজার জন্য নানাবিধ দ্রব্য ও ছাগাদি উপহার দিয়াথাকে।

১৮। নারায়ণপুর। রাজস্ব ২৩৫১৯ টাকা। *

১৯। হুমনাবাজু। (হুমনাবাদ) রাজস্ব ৭০৩২ টাকা। †

* কায়স্থ দে বংশীয় রামদেব ও কামদেব নামক দুই ভ্রাতা বোয়ালীয়া ও নারায়ণপুর পরগণার আদি জমিদার। তাহাদের উত্তর পুরুষগণ দীর্ঘকাল এই দুইটি পরগণা উপভোগ করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে জনৈক মুসলমান জমিদার এই পরগণার কিয়দংশ অধিকার করেন। তাহার উত্তর পুরুষ সেখ দাড়া নামক এক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি প্রাচীন জমিদার বংশীয় রামেশ্বর চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইলেন। রামেশ্বর জাতিপাত ভয়ে নারায়ণপুর পরিত্যাগ করত বোয়ালীয়া আসিয়া জ্ঞাতিবর্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সুযোগে দুর্দ্দান্ত দাড়া সমগ্র নারায়ণপুর পরগণা অধিকার করিলেন। দাড়ার অনেকগুলি পুত্র কন্যা ছিল; তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এই পরগণাটি বহু অংশে বিভক্ত করিয়া লয়। বিখ্যাত শক্তি উপাসক মৃজা হুসন আলী মুসলমানদিগের উত্তরাধিকারীত্ব আইনের বিধান অনুসারে এই পরগণার কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্থাপিত কালী দেবী মুর্ত্তি অদ্যাপি নারায়ণপুরে পূজিত হইয়া থাকেন। পরগণাটি বহু অংশে বিভক্ত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে অনেক হিন্দু ও মুসলমান সেই সেই অংশ ক্রয় করিয়াছেন।

† প্রাচীন কালে কায়স্থ জাতীয় দে বংশীয়গণ এই পরগণার অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা "রাজা" উপাধি ধারণ করিতেন। দে বংশীয় শেষ নরপতির এক মাত্র কন্যা ছিল। দাস বংশীয় এক ব্যক্তি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম জানকী

এই সকল মহালের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের করতলস্থ ছিল। অবশিষ্টগুলি সামন্ত নরপতি-ও জমিদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। জমিদারগণ নিয়মিত রূপে ত্রিপুরাপতিকে কর দান করিতেন এবং সামন্ত নরপতি-গণ ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। বলদাখালের অধিপতি ঈশা খাঁ কিয়ৎ পরিমাণে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন ছিলেন। তুড়রমল্ল যৎকালে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন, তৎকালে আবুল ফজল ত্রিপুরাকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * ইংরেজ বণিক ও ভ্রমণকারী রলফ ফিছের বর্ণনা দ্বারা আবুল ফজলের লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। †

মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের আদেশ অনুসারে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। এই সময় ত্রিপুরার সমতল

নাথ দাস। জানকীনাথের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল, তাঁহার নাম সীতানাথ দাস। উভয় ভ্রাতাকে তাঁহাদের পিতা পরগণাটি দুই অংশে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জানকীনাথ ৷৷/ আনা ও সীতানাথ ।৶ আনা প্রাপ্ত হন। বহু কাল হইল জানকীনাথ ও সীতানাথের বংশধরগণ হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। তদনন্তর এই পরগণা একটি মুসলমান পরিবারের হস্তগত হয়। তাঁহাদের ইতিহাস পরে বলিব।

* ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ৬২ এবং ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্র প্রকৃত পক্ষে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। যেসকল পরগণা সামন্ত নরপতি কিম্বা জমিদারগণের অধিকারে ছিল, তাহা চিরকালের তরে ত্রিপুরেশ্বরদিগের করচ্যুত হইল। যাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রিপুরেশ্বরের করতলস্থ ছিল, তাহা মোগলগণ অধিকার করিয়া লইলেন। সেই অংশ "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই সরকার ৪টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। নুরনগর, মেহেরকুল ব্যতীত অন্য দুইটি পরগণার নাম আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তৎকালে এই সরকারের রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা অবধারিত হয়।

ধর চৌধুরী বংশের বংশাবলীর মতে ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। মতান্তরে ১০২৩ কিম্বা ১০৩০ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। ত্রিপুরা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১০০৯ এবং ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যকালে এই ঘটনা হইয়াছিল। এই সময় সরাইল পরগণাটি মহা-রাজের হস্তচ্যুত হয়। সরাইলের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এবং লৌহ-গড়ের উত্তর দিকস্থ ভূভাগ মোগলাধিকারের পূর্ব্বে ছিউং, বিউং ও কৈলারগড় নামক তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সরকার উদয়পুরের প্রথম শাসন কর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ (বা নুরুল্লাবেগ) সেই তিন ভাগ একত্র করিয়া স্বীয় নাম অনুসারে তাহাকে নুরনগর আখ্যা প্রদান করেন।* এইরূপে নুরনগর পরগণা সৃষ্টি

হইয়াছিল। ত্রিপুরার তদানীন্তন প্রধান নগরী নুরনগর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অধুনা সেই স্থান কসবা নামে পরিচিত। মোগল শাসন কর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ স্বীয় সহচর, কায়স্থ জাতীয় রামধর (প্রকাশ্য কায়েত রামধর) কে নুরনগরের চৌধুরীর পদে নিযুক্ত করেন। † চৌধুরী রামধর নুরনগরে তালুকদারি প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

এই সময় মোগলগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রে কতকগুলি মুসলমান জমিদার নিযুক্ত করেন।

১০৩৫ ত্রিপুরাব্দে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক মোগলদিগের হস্ত হইতে সরকার উদয়পুরের উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু অন্যান্য পরগণাগুলি উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

মোগল সম্রাট সাহ জাহানের শাসনকালে, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজা মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য হইতে কর

* "চিউং বিউং কৈলারগড়।
এই তিনে নুরনগর॥" (প্রবাদ বাক্য)

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮ জানুয়ারির এক খণ্ড নিষ্পত্তি পত্রে নুরনগর নামাকরনের এইরূপ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

† Chowdric—The constable of a small District.

Glossary to the Appendix to the History of Hindoostan. By Col. Dow.

গ্রহণ করিয়াছেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে স্মুজা যে জমা তুমারি প্রস্তুত করেন, তাহাতে সরকার উদয়পুরের অন্তর্গত ৪টি পরগণার রাজস্ব ৯৯৮৬০ টাকা লিখিত আছে।

কল্যাণ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ মাণিক্য মোগল দিগের করতলস্থ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্র মাণিক্য স্বাধীন ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করত করদান করিতে বিরত হইলেন। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য কিম্বা তৎপুত্র রত্ন মাণিক্য কখন স্বাধীন ও কখন অধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। "সরকার উদয়পুরের" রাজস্ব উল্লেখে তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক কপর্দ্দকও বাঙ্গালার নবাবকে প্রদান করেন নাই। মহারাজ রত্ন মাণিক্য বাঙ্গালার নবাব মুরশিদ কুলি খাঁকে প্রতিবৎসর নানা প্রকার উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অল্পকাল অন্তে মোগল সৈনা ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র লুণ্ঠন পূর্ব্বক তদানীন্তন রাজধানী উদয়পুরে উপনীত হইল। মহারাজ প্রথমত তাহাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাহাদের অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া একটি আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করেন। একদা পান ভোজন জন্য মোগলদিগেকে রাজ ভবনে আহ্বান করা হয়। যথাকালে তাহারা মদিরা পানে উন্মত্ত হইলে দ্বার বন্ধ করিয়া

ত্রিপুর সৈন্যগণ তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিল। যাঁহারা মদিরা পান করেন নাই কেবল তাঁহারাই প্রাচীর উলঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যদিচ ধর্ম্মমাণিক্য এবম্প্রকার কৌশলে জয় লাভ করত স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, কিন্তু এই সময় কয়েকটী পরগণা তাঁহার হস্ত চ্যুত হয়। সেই সকল স্থানে মোগল জমিদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

উল্লেখিত ঘটনার অল্পকাল পরে বাঙ্গালার নবাব ধর্ম্মমাণিক্যের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে কেবলমাত্র পরগণা নুরনগরের জন্য বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা কর ধার্য্য হয়। সম্রাট তাহাও সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দিয়াছিলেন। *

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নেয়াবতের দেওয়ান মীর হবিব ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎ রাম ঠাকুরের সাহায্যে ধর্ম্মমাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করেন। নবাব এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক বিজিত প্রদেশকে "রোসনাবাদ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন এবং রোসনাবাদ বাঙ্গালার রাজস্বের হিসাবে একটি অতিরিক্ত চাকলা বলিয়া গৃহীত হয়। জগৎরাম "রাজা জগৎ মাণিক্য" আখ্যা ধারণ পূর্ব্বক রোসনাবাদের প্রথম জমিদার হইলেন। তৎকালে

* ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চাকলে রোসনাবাদের রাজস্ব নিম্নলিখিতরূপ ধার্য্য হইয়াছিল।

মহাল	রাজস্ব
রোসনাবাদ	৯২৯৯৩
বাদ :—	
সাময়িক জায়গীর নুরনগরের রাজস্ব ২৫০০০	
পর্ব্বত হইতে হস্তী ধৃত করিবার খরচ ২০০০০	
	৪৫০০০
	৪৭৯৯৩

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মুরশিদাবাদ গমন করত নবাব সমক্ষে অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক অল্প জমায় চাকলে রোসনাবাদ জমিদারি স্বরূপ পাওয়ার প্রার্থনা করেন। নবাব সুজাউদ্দিন তদনুসারে রোসনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব পঞ্চ সহস্র মুদ্রা অবধারণ করত ধর্ম্মমাণিক্যকে প্রদান করিবার জন্য ঢাকার নবাবের প্রতি আদেশ করেন। প্রকৃত পক্ষে তৎকালে রোসনাবাদের রাজস্ব ৫০০০০ টাকা ধার্য্য হয়; তন্মধ্যে উল্লেখিত ৪৫০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫০০০ টাকা প্রদান করা হইত।

রোসনাবাদ ব্যতীত ত্রিপুরার অন্তর্গত পরগণা সমূহ অন্যান্য জমিদারের অধিকার ভুক্ত ছিল, তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জমা তুমারি তকছিছি (বা তসখিসি) মোতাবেক চাক্লে জাহাঁগীর নগর। সন ১১৩৫ ফসলি (বঙ্গাব্দ)।

রাজস্ব বিভাগ।

১। উত্তর সাহাপুর। রাজস্ব ৮৬৮৩ টাকা। বারেন্দ্র কুলজ শ্যাম বংশীয় চৌধুরীগণ এই পরগণার প্রাচীন জমিদার।

২। জুলাই। রাজস্ব ৪৭২৩ টাকা।

৩। দক্ষিণ সাহাপুর। রাজস্ব ৩৬১৭ টাকা।

৪। গঙ্গামণ্ডল। রাজস্ব ১৬৩৮০ টাকা।

৫। লৌহগড়। রাজস্ব ৬৬৯০ টাকা।

এই দুইটি পরগণা বলদাখালের জমিদার আকা সাদেককে প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১৭০ সালে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মির্জা সাহাবুদ্দিন জাফর এই দুইটি পরগণার অধিকারী ছিলেন। তিনি লৌহগড় পরগণাকে জাফরাবাদ আখ্যা প্রদান করেন। ১১৯৮ বঙ্গাব্দে এই দুইটি পরগণা শোভা বাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ক্রয় করেন।

৬। গুণানন্দী। রাজস্ব ১১৮১০ টাকা। ভরদ্বাজ গোত্রজ গুণার্ণব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই পরগণার আদি জমিদার। মোগলদিগের অত্যাচারে গুণার্ণবের উত্তর পুরুষগণ

উঁহার জমিদারি স্বত্ব পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর বিষ্ণু-বংশীয় কায়স্থ রামচন্দ্র চৌধুরী এই জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণের জমিদারী ব্রিটীসাধিকার কালে নিলামে বিক্রয় হইয়াছে। হরিণা গ্রামে তাঁহাদের বাসভবনের চিহ্ন ও কীর্ত্তি কলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭। গোপালনগর। ৮১৫ টাকা।

৮। নোমনাবাদ। রাজস্ব ২৬৮:১৭ টাকা। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথমত দে তদনন্তর দাসবংশীয়গণ এই পরগণার জমিদার ছিলেন। তৎপর মোগল সম্রাট সাহা আলমের (বাহাদুর সাহার) শাসন কালে কোরেসী বংশীয় সাহা জাদা জাহান্দরের (অন্য নাম আমির মির্জা আগোয়ান খাঁ) পুত্র আমির মির্জা আক্র খাঁ এই পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ মধ্যে এই পরগণা বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ১১৭০ সালে এই পরগণার মালিকের স্থলে তাঁহার উত্তরপুরুষ "দৌলত, জালাল, বক্স" এই তিনটি নাম লিখিত আছে। তাঁহাদের পুরুষ সন্তান মধ্যে চৌধুরী ইউছফ আলী অদ্যাপি এই পরগণার কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। উক্ত চৌধুরী সাহেবের দানশীলা ভগিনী "নবাব সাহেবা" ফয়েজন্নেছা স্বীয় পিতা, মাতা এবং স্বামীর উত্তরাধিকারিণী বলিয়া এই পরগণার বিশিষ্ট অংশ

প্রাপ্ত হইয়াছেন। * সাহাপুরের বিখ্যাত সৈয়দ বংশীয় † চৌধুরী বসরত আলী দৌহিত্র সূত্রে এই পরগণার কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য অংশ ক্রমে বিক্রীত হইয়া অন্যান্যের হস্তগত হইয়াছে। ‡

---

* নবাব ফয়জন্নেছা সাহেবার স্বামী চৌধুরী মাহাম্মদগাজি একজন প্রেকৃত মিতব্যয়ী জমিদার ছিলেন। তিনি দানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া গোপনে প্রচুর অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন; একটি জমিদারির উপস্বত্ব সৎকার্য্যে দান করিবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অপব্যয়ী ছিলেন না, এজন্যই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী, কন্যা প্রভৃতি উত্তরাধিকারিণীগণ প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

† ৪৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ হোমনাবাদের নবীন জমিদারদিগের মধ্যে আমরা দুইটি বংশের কথা উল্লেখ করিতে পারি:—

১। চৌহান ক্ষত্রিয় বংশীয় চতুরসিংহ নামে এক ব্যক্তি আজমির হইতে ত্রিপুরায় আগমন করেন। প্রথমত সামান্য ব্যবসা দ্বারা চতুরসিংহ কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া টাকা লগ্নির কারবার আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র তিলকচন্দ্র সিংহ পিতার ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি হোমনাবাদের কিয়দংশ ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্র বাবু রামদুলাল রায় ও বাবু গোপালকৃষ্ণ রায় এক্ষণ জীবিত আছেন। ক্রমেই তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। হোমনাবাদ ব্যতীত মহবৎপুর, সিংহেরগাঁও ও চৌদ্দগাঁও প্রভৃতি পরগণায় তাঁহারা জমিদারী অংশ ক্রয় করিয়াছেন।

৯। করদী। রাজস্ব ৩০৫৮ টাকা।

১০। কাশিমপুর } রাজস্ব ২৯৪৮৲ টাকা।
১১। মাছুয়াখাল }

১২। একতাদপুর। রাজস্ব ২৭৩৭ টাকা।

কায়স্থ নাগ চৌধুরীগণ এই তিনটি পরগণার প্রাচীন জমিদার ছিলেন। ১১৭০ সালের তুমর জমাতে উক্ত বংশজাত নরোত্তম চৌধুরীর নাম লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার উত্তর-পুরুষগণ অদ্যাপি ইহার কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। কাশিম-পুরের চৌধুরী বাটী দর্শন করিলে বোধ হয় ইহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন, ইঁহাদের বাস ভবন একটী সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ১৬টী পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৩। কাদবা
১৪। আমিরাবাদ
১৫। বেদরাবাদ

} রাজস্ব ৯৯২৬ টাকা। সংস্কৃত রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা—দিল্লীর সম্রাট পুত্র (আজিম ওশ্মান ?) ছত্র মাণিক্যের পুত্র উৎসব রায়কে (বৃত্তি স্বরূপ) এই জমিদারী দান করিয়া-ছিলেন। ১১৩৫সালের জমা তুমারিতে এই জমিদারীর মালিকি

২। সাহাবংশীয় ভজকৃষ্ণ চৌধুরী বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া হোমনাবাদের কিয়দংশ ক্রয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু অমরকৃষ্ণ চৌধুরী এক্ষণ জীবিত আছেন।

স্থলে উৎসব রায়ের পুত্র রাজা বিজয়নারায়ণ রায়ের নাম লিখিত আছে। ক্রমে বিজয় নারায়ণের বংশধরগণ এই পরগণা জয়ের অধিকার চ্যুত হইয়াছেন। কেবল অল্প কয়েকজনের কিঞ্চিৎ মালিকি উপস্বত্ব মাত্র রহিয়াছে। জমিদারিটি প্রথমত মহারাজ কাশিচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মেনেজার কোরজান সাহেবের হস্তগত হয়। অধুনা উহা কলিকাতা নিবাসী মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা ক্রয় করিয়াছেন।

৬। নূরনগর। রাজস্ব ১৯৫৬ টাকা। সিংহেরগাঁও পরগণার কিয়দংশ এবং বরদীয়া ও বোয়ালীয়া পরগণা লইয়া এই পরগণা নূতন গঠিত হয়। ঢাকা নিবাসী "নেপ সাহেব" নামে পরিচিত জনৈক মুসলমান নবাব হইতে এই পরগণা প্রাপ্ত হন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণ তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারিগণকে বেতনের পরিবর্ত্তে এক একটী তালুক প্রদান করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই সকল তালুক স্থায়িত্ব হইয়া ছিল।* মূল জমিদারি ও সেই সকল তালুক ক্রমে নিলাম হইয়া যাইতেছে।

---

* আহাদনমাণিক্যের ব্রাহ্মণবংশীয় হরি নারায়ণ চৌধুরী বরদীয়ার দাস মজুমদার, নূরনগরের রায় মজুমদার বোয়ালীয়ার দে চৌধুরী, করদীর কর চৌধুরী, আমা বক্তন মজুমদার, শেরাদিয়ার দে চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের গুপ্তগণ ও গোবিন্দদীয়ার বসুগণ প্রধান তালুকদার ছিলেন

১৭। নন্ধীচাল। রাজস্ব ৩০২২ টাকা। এই পরগণার আদি জমিদারবংশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের বিবেচনায় দত্ত চৌধুরীগণ ইহার প্রাচীন জমিদার ছিলেন। প্রায় দুই শতাব্দী অতীত হইল ব্রাহ্মণবংশীয় জয়দেব রায় চৌধুরী নবাব সরকার হইতে এই পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। ১১৩৫ সালের তুমার জমাতে জয়দেবের পুত্র নরসিংহ রায় চৌধুরীর নাম লিখিত আছে। নরসিংহ রায়ের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম পুরুষ এক্ষণ জীবিত আছেন। এই পরগণার অতি সামান্য অংশ এক্ষণ তাঁহাদের হস্তে আছে। অধিকাংশ নীলাম ও বিক্রয় হইয়া অন্যান্য হস্তগত হইয়াছে।

১৮। মেহার। রাজস্ব ৭৮৫১ টাকা। দাস রাজবংশের পর একটী মুসলমান বংশ এই পরগণাটি প্রাপ্ত হন। ১১৩৫ সালের তুমার জমাতে সেই মুসলমান বংশজাত "ছিংরাজ মুনা" নামক ব্যক্তিগণের নাম লিখিত আছে। ক্রমে তাঁহারাও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। অধুনা এই পরগণা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে। কলিকাতার ঠাকুর বংশের কোন ব্যক্তি ইহার একটী বৃহৎ অংশ খরিদ করিয়াছেন।

১৯। নারায়ণপুর। রাজস্ব ৩২৮৪ টাকা।

২০। নয়াবাদ। রাজস্ব ৩০৪১ টাকা। কায়স্থ শ্যাম

চৌধুরীগণ ইহার আদি জমিদার। চাঁদ ও গজেন্দ্র নামে দুই ভ্রাতা ছিল। চাঁদেরচর গ্রামে ইঁহারা বাস করিতেন। চাঁদের বংশধরগণ উত্তর-সাহাপুর প্রাপ্ত হন। গজেন্দ্রের বংশধরগণ নয়াবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাঁদের বংশধরগণ অদ্যাপি উত্তর সাহাপুরের কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু গজেন্দ্রের বংশধরগণ নয়াবাদটী হারাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কাশিমপুর মাছুয়াখাল প্রভৃতি মহালের প্রাচীন জমিদার নাগ বংশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বংশের একটি কনিষ্ঠ শাখা বারদী গ্রামে বাস করিতেছেন, তদ্বংশজাত এক ব্যক্তি এই পরগণাটি ক্রয় করেন। এক্ষণ তাঁহার উত্তর পুরুষগণ এই পরগণা ভোগ করিতেছেন।*

২১। পাইটকাড়া। রাজস্ব ২২৩৭৭ টাকা। মিরহবিবের ত্রিপুরা বিজয় কালে মোগলগণ এই পরগণাটি অধিকার করত বলদাখালের জমিদার আকা সাদেককে প্রদান করেন। ১১৭০ সালের বন্দোবস্তী কাগজে উক্ত পরগণার মালিকিস্থলে জমিদার (আকা সাদেকের পুত্র) মির্জা আবদুল হুসন (প্রকাশ্য আকা নবি) নাম লিখিত আছে। সেই জমিদার

* মতান্তরে বারদীর নাগবংশীয়গণই এই পরগণার প্রাচীন জমিদার। তাঁহাদের আদিপুরুষ নয়ানন্দ নাগ নবাব হইতে এই পরগণাটি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নাম "নয়াবাদ" হইয়াছে।

বংশ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। কলিকাতা নিবাসী বিখ্যাত "প্রিন্‌স" দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পরগণাটি ক্রয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণ এই পরগণা ক্রয় করিয়াছেন।

২২। রায়পুর। রাজস্ব ৮৬৪ টাকা।

২৩। সিংহেরগাঁও। রাজস্ব ১৪৩৯৭ টাকা। সিংহ বংশের একটি শাখা রূপ্‌সা গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা ⁄১১ গণ্ডা হিস্যার মালিক ছিলেন। কোন কারণে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রূপ্‌সার বর্ত্তমান মুসলমান জমিদারগণ সেই বংশের দৌহিত্র। ক্রমে ইঁহারা সিংহেরগাঁও পরগণার আরও কতকগুলি অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। সিংহেরগাঁও পরগণার মধ্যে ইঁহারাই এক্ষণ প্রধান জমিদার। করৈতলীর বসু জমিদারগণ সিংহ বংশের একটি দৌহিত্র শাখা হইতে উদ্ভূত। মূল জমিদার সিংহ বংশের অবস্থা এক্ষণ শোচনীয়।

২৪। শ্যামপুর। রাজস্ব ২২৪৯ টাকা।

২৫। শ্রীচাল (সিরচাইল) রাজস্ব ১৩২১ টাকা।

২৬। সিঙ্গাইর। রাজস্ব ৩৫১৬ টাকা।

২৭। শকদী। রাজস্ব ২৯৪২ টাকা।

২৮। টোরা। রাজস্ব ১৪৩৮১ টাকা। *

* এব্রাহিমপুর নামক আরও একটি পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট হয়।

২৯। চৌদ্দগাঁও। রাজস্ব ১৬০২ টাকা। রোসনাবাদ মধ্যে চৌদ্দগাঁও নামে অন্য একটি পরগণা আছে। এই জন্য ইহাকে "ঝলম চৌদ্দগাঁও" বলে। ১১৭০ সালে "মধু" নামক এক ব্যক্তি এই পরগণার জমিদার ছিলেন। ক্রমে ইহা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে।

সামরিক (নেজামত) বিভাগ।*

১। বলদাখাল। খালিসা জমা ৮৮৯৩ টাকা। জায়গীর ৭৭৯৫০ টাকা। মোট ৮৬৮৪৩ টাকা।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোগল সম্রাট আকবরের শাসন কালে এই পরগণা ইশা খাঁ মছনদে আলীর অধিকারভুক্ত ছিল। আলমগীর (আওরংজেব) পাদসাহের ৪৩ জুলুসে (১৭০০ খৃষ্টাব্দের), বাঙ্গালার নবাব নাজেম সাহাজাদা মাহাম্মদ আজিমের (প্রকাশ্য আজিম ওশ্বানের) এক খণ্ড "পরওয়ানা" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে বলদাখাল (ইশা খাঁ মছনদে আলীর উদ্ভব পুরুষ) দেওয়ান হয়বৎ মাহাম্মদ খাঁর

* বলদাখাল ও সরাইল নামক বৃহৎ পরগণা দুইটি মোগলদিগের নাওরা মহাল। এই দুই পরগণার জমিদার যে কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কোষ নৌকা যোগাইতে বাধ্য ছিলেন এমত নহে। এই দুইটি পরগণার সমস্ত রাজস্ব সমর-তরী বিভাগে ব্যয় হইত। এজন্য এই দুইটি পরগণা নেজামত সেরেস্তার অধীন হইয়াছিল।

অধিকার ভুক্ত ছিল।* ইহার অল্পকাল পরে আকা সাদেক এই পরগণাটি প্রাপ্ত হন। বোধ হয় তিনি দেওয়ানবংশীয় কন্যা বিবাহ করিয়া এই পরগণাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মির হবিবের ত্রিপুরা আক্রমণ কালে আকা সাদেক ইহার অধিকারী ছিলেন। আকা সাদেকের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিম, দ্বিতীয় মির্জা আবদুল হসন (আকা নবি), কনিষ্ঠ মির্জা মাহাম্মদ জাফর। জ্যেষ্ঠ মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিম পরগণে বলদাখাল ও তদন্তর্গত তপে কুড়িখাই প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় আবদুল হসন পাইটকাড়া ও অন্যান্য কয়েকটি মহাল প্রাপ্ত হন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ মাহাম্মদ জাফর গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিমের কোন পুত্র সন্তান জন্মে নাই। কেবল তিনটি কন্যা মাত্র ছিল। তাঁহারা তুল্যাংশে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, যথা:—

মির্জা মাহাম্মদ এব্রাহিম (প্রকাশ্য মির্জা ভেলা)

আজিজওন্নেছা খানম	রোসন্‌আরা খানম	——†
পতি মির আসরফ আলী হিং ।/৬॥/	পতি মির্জা মাহাম্মদ বাথর হিং ।/৬॥/	পতি মির্জা হসন আলী হিং ।/৬॥/

---

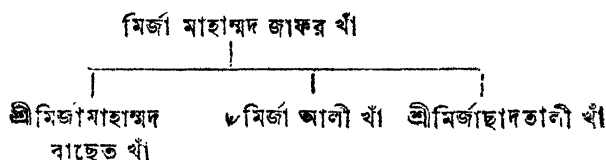
* *J. A. S. B. Vol. XLIII. part I. page 214.*

† মাহাম্মদ এব্রাহিমের তৃতীয় কন্যার নাম দুষ্প্রাপ্য।

কনিষ্ঠা কন্যার পতি মির্জা হুসন আলি কালী-উপাসক ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশের অর্দ্ধাংশ (৵১৩।⁄ ক্রান্ত) মির আসরফ আলীকে দান করেন। তদনুসারে মির আসরফ আলী ও তাঁহার পত্নী বলদাখালের অর্দ্ধাংশের মালিক হন। তাঁহাদের এই অংশ বাকীরাজস্বের জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নীলাম হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা ১৯৫০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। তদনন্তর মির্জা হুসন আলীর ৵১৩।⁄ ক্রান্ত অংশ বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে নিলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট ৬৫০৬৬ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন।

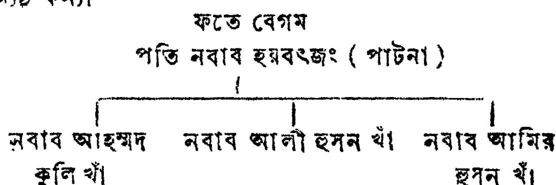
অবশিষ্ট ।⁄৬॥⁄⁄ ক্রান্ত অংশের অধিকারী মাহাম্মদ ইব্রাহিমের দ্বিতীয় কন্যার বংশাবলী (বেঙ্গার) পাটনার নবাববংশের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত; যথাঃ—

রোসেন-আরাখানম।
পতি মির্জা মাহাম্মদ বাখর।
|
মির্জা মাহাম্মদ কাজেম।
পত্নী সাহাজাদা বেগম (পাটনার নবাব কন্যা)
(১ পুত্র ৪কন্যা।)
|
মির্জা মাহাম্মদ খাঁ
পত্নী বর্ণিওখানম (ইংরেজ কন্যা)
১ পুত্র ২ কন্যা। *
|



মির্জা মাহাম্মদ কাজেমের কন্যাগণ ঃ—

জ্যেষ্ঠ কন্যা—



দ্বিতীয় কন্যা—

জিন্নতন্নেছা বেগম
পতি আকা মাহাম্মদ মেহেদী
|
দুইটি কন্যা।

তৃতীয় কন্যা—

খতিজা সুলতান বেগম
একটি কন্যা ঃ—
মাহাম্মদী বেগম
পতি ইউছফ আলী চৌধুরী
হোমনাবাদের জমিদার।

চতুর্থ কন্যা—

নুরজাহা বেগম

পতি নবাব ছোরাপে জং (পাটনা)

(২ দুই পুত্র।)

নবাব ফরজন্দ আলী খাঁ — নবাব মাহাম্মদ আলী খাঁ

রৌসন-আরা খানম স্বাধীন প্রকৃতি সম্পন্না রমণী ছিলেন। তাহার স্বামী মির্জা মাহাম্মদ বাখর, তাঁহার আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া একদিবস তাঁহাকে "বাইজী" বলিয়া উপহাস করেন। খানম স্বামীর উপহাস বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "আমার পিতার ভবনে * বসিয়া আমাকে অপমানিত করিতেছ! এখনই আমার বাস ভবন হইতে বাহির হইয়া যাও।" মাহাম্মদ বাখর সেই বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ স্বীয় শিশু পুত্রটিকে লইয়া পাটনায় গমন করিলেন। তদনন্তর তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈন্য বিভাগে কার্য্য করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পুত্র মাহাম্মদ কাজেম আপনাকে মাতৃহীন বলিয়া জানিতেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৎকালে বিষয় কর্ম্মের অনুসন্ধান করিতেছিলেন সেই সময় জনৈক প্রাচীন ভৃত্যের নিকট শ্রুত হইলেন

* থুল্লা গ্রামে ইঁহাদের বাস ভবন ছিল। ১০২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

যে, তাঁহার মাতা জীবিত আছেন এবং তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী, মাহাম্মদ কাজেমই তাঁহার একমাত্র পুত্র ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি মাতার নিকট গমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। একদা পিতার সমক্ষে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তৎশ্রবণে পিতা বলিলেন, "বৎস তুমি কখনও সেই পাপীয়সীর নিকট গমন করিওনা।" পুত্র পিতার বাক্য অগ্রাহ্য করত পলায়ন পূর্ব্বক মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা পুত্রকে স্নেহের সহিত ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যে সম্পত্তির লোভে পুত্র পিতার বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক মাতার নিকট আসিয়াছিলেন, মাতা পূর্ণাবস্থায় পুত্রকে সেই সম্পত্তি প্রদান করিতে পারিলেন না। যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে অদ্য তাঁহার পৌত্র এবং দৌহিত্র (পাটনার নবাব) গণ বার্ষিক ৪।৫ লক্ষ টাকা উপস্বত্বলাভ করিতেন, মাতা তাঁহার অধিকাংশ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; তিনি তাঁহার দুশ্চরিত্র কর্ম্মচারি গণের সাহায্যে পরগণার ।০ অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন।* অবশিষ্ট

* রৌসন-আরা খানম প্রথমত /০ আনা অংশ শ্যামগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় মহেশনারায়ণ রায়ের নিকট বিক্রয় করেন। তদনন্তর খানম সাহেবের পোদ্দার ভৃত্য সীতারাম নাগ ৫২॥ গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। নবীনগরের চৌধুরীগণ

/৬৷৷/৪ দন্তী অংশ মাত্র রৌসন-আরা খানম পুত্রকে প্রদান করিলেন। তাহাও ক্রমে ক্রমে সেই পুত্রের উত্তরাধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইতেছে। চঞ্চলার ক্রিয়া এরূপই বটে।

গবর্ণমেণ্ট বলদাখালের ৷৷৵১৩৷/ ক্রান্ত অংশ খরিদ করেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অধিকাংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। অধুনা নবাব খাজে আসতুলগণি বাহাদুর এই বৃহৎ পরগণার প্রায় তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়াছেন।

২। সরাইল-সতরখণ্ডল। খালীসা ও জায়গীর জমা ১১১০৮৪ টাকা।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সম্রাট আকবরের পূর্ব্বে সরাইল

সেই সীতারাম পোদ্দারের সন্তান সন্ততি। তদনন্তর ঢাকা নিবাসী আমিরুদ্দি দারোগা ৵৷৷গণ্ডা অংশ ক্রয় করেন। দারোগা সাহেবের পুত্র গোলামৌলা সাহেব অধুনা বলদাখালের অনেক খ্যাতনামা জমিদার। তৎপর বলদাখালের বাটোয়ারার মোকদ্দমার খরচের জন্য ৵৫ তিন কড়া অংশ নিলাম হইলে ঢাকা নিবাসী খাজে আলী মিঞা (নবাব সাহেবের পিতা) তাহা ক্রয় করেন। তদনন্তর মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মেনেজার কোরজন সাহেব /০ এক আনা ক্রয় করেন। অবশিষ্ট অংশ পশ্চাৎ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। সীতারাম পোদ্দার ও আমিরুদ্দি দারোগারঅংশ ব্যতীত অন্যান্যের প্রায় সমস্তই নিলাম ও বিক্রয় হইয়া ঢাকার নবীন নবাব পরিবারের হস্তগত হইয়াছে।

পরগণার কিয়দংশ মাত্র শ্রীহট্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।* ১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তীকালে সমগ্র সরাইল পরগণা মোগল সম্রাটের কুক্ষি প্রবিষ্ট হয়। তৎকালে ইশা খাঁ মছনদে আলীর জনৈক বংশধর—দেওয়ান মজলিস গাজি এই পরগণা জমিদারি স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশাবলী ৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেল।

প্রথম অবস্থায় সরাইল পরগণা শ্রীহট্ট চাকলার অধীন ছিল। দেওয়ান সাহেবগণ তাঁহাদের দেয় রাজস্ব শ্রীহট্টের আমিল নিকট প্রেরণ করিতেন। সম্রাট আওরংজেবের শাসন-কালে বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগীজ ও মগ বোম্বাটিয়া দিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য খিজিরপুরে + "নাউরা" (সমরতরী) বিভাগ সংস্থাপন করেন। এই বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১১২টী মহালের রাজস্ব ৮৪৩৪৫২ টাকা "উমলে নাউরা" নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সময় সরাইল-সতরখণ্ডল, চাকলে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়াবতের নেজামত সেরেস্তা ভুক্ত হয়। সরাইলের জমিদার খালিসা অংশের রাজস্ব নেজামত সেরেস্তায় দাখিল করিতেন। কিন্তু জায়গীর অংশের রাজস্বদ্বারা

(৪৫১ পৃষ্ঠা পঠিতব্য।)

* ২৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

+ আধুনিক নারায়ণগঞ্জের উত্তরাংশ খিজিরপুর নামে পরিচিত ছিল।

দেওয়ান মজলিসগাজি।

দেওয়ান মজলিস সাহাবাজ।

দেওয়ান নুর মাহাম্মদ।

দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ।

দেওয়ান সাহা মাহাম্মদ।

দেওয়ান লতিফ মাহাম্মদ।

দেওয়ান নজর মাহাম্মদ।

দেওয়ান নজমদ্দিন আলী
হিং ॥/ আনা (২৩কোসা)

দেওয়ান বক্স আলী
হিং ।৶০ আনা (১৭কোসা)

পুত্র
দেওয়ান জাফরআলী
হিং ।/১২গণ্ডা
(১৪॥ কোসা)

জামাতা
দেওয়ান সুলতান মাহাম্মদ
হিং ৶৮ গণ্ডা
(৮॥ কোসা

দেওয়ান ফতে আলী

দেওয়ান থাজেআলী

দেওয়ান সাহাবাজআলী

দেওয়ান নবাবআলী

দেওয়ান মাহাম্মদহদ্দি

দেওয়ান নুর আলী

দেওয়ান জোহর আলী

দেওয়ান নাগর আলী

দেওয়ান মেন্দী আলী

দেওয়ান আবুল হাকিম।

দেওয়ান মছলন্দ আলী

দেওয়ান মনহর আলী।
হিং ৸০আনা

দেওয়ান ছমদদ আলী।
হিং ।০ আনা।

৪০ খানা কোস নৌকা সংগ্রামকালে নবাবের আদেশানুসারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য ছিলেন।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আকবরের পূর্ব্বে সরাইল পরগণার একটি ক্ষুদ্র অংশ (সতরখণ্ডল) মুসলমানদিগের কুক্ষি প্রবিষ্ট হয়। ১০০৯ ত্রিপুরাব্দের পর সমগ্র সরাইল মোগলদিগের অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তিতাস নদীর পূর্ব্ব-দিকস্থিত ভূখণ্ড তৎকালে সরাইলের সীমা রেখার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। দেওয়ান নুরমাহাম্মদের পুত্র দেওয়ান নাছির মাহাম্মদ সেই অংশ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ (দ্বিতীয়) ধর্ম্মমাণিক্য হইতে দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে সরাইলে একটি আশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে।

একদা নাছির মাহাম্মদ মৃগয়া করিবার জন্য ত্রিপুরা পর্ব্বতে গমন করেন। জনৈক ত্রিপুর রাজকুমারও সেই স্থানে শীকার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা নাছির মাহাম্মদ জ্ঞাত ছিলেন না। ঘটনাক্রমে ও অজ্ঞাতসারে নাছির মাহাম্মদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে রাজকুমার হত হন। রাজপুত্রের অনুচরগণ উল্লেখিত আকস্মিক ঘটনার বিবরণ অবগত হইয়া নাছির মাহাম্মদকে বধ করিতে উদ্যত হইল। নাছির নিরুপায় হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান নুর মাহাম্মদ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করত ত্রিপুরেশ্বর সমক্ষে প্রেরণ

করিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ নাছির মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্যের সমীপে সরলভাবে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম পরায়ণ ধর্ম্ম মাণিক্য তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক জমিদার পুত্রকে মুক্তি প্রদান করিলেন। নাছির মাহাম্মদ মুক্তিলাভ করত করজোরে বলিলেন, "মহারাজ! এজগতে আমার স্থান নাই, যে পিতা আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, আমি সেই পিতার নিকট আর যাইব না। হয় মহারাজ আমাকে বধ করুন, না হয় মহারাজ আমাকে আশ্রয় দান করুন!" সেই করুণ বাক্য শ্রবণে ত্রিপুরেশ্বর তাঁহাকে হর্ষপুর ডিহি দান করেন। নাছির মাহাম্মদ যে স্থানে স্বীয় বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন তাহা "নাছিরাবাদ" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার আধুনিক অপভ্রংশ নাম "নিদারাবাদ"। অদ্যাপি সেই স্থানে প্রাচীন অট্টালিকা ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। *

দেওয়ান নজর মাহাম্মদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ দেওয়ান নুরুমদ্দিন হিং ।।/০ আনা এবং কনিষ্ঠ দেওয়ান বক্সআলী

* নাছির মাহাম্মদের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য যে সকল লোক (ঘরামি) নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের থাম (ঠুনি) পুতিবার কালে পরিশ্রান্ত হইয়া বলিয়াছিলঃ—

"রাজারে পাইল ভূতে।
ঠুনি বহাইয়া মারে।
নুর মাহাম্মদের পুতে।"

হিং ।৶০ আনা প্রাপ্ত হন। এইরূপে প্রথমত সরাইল পরগণা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎকালে কোন নৌকার ও বিভাগ হইয়াছিল, তদনুসারে ॥৴০আনার জমিদারি ২৩ কোসা ও।৶০ আনা জমিদারি ১৭কোসা আখ্যা প্রাপ্ত হয়

দেওয়ান নজমদ্দিনের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। সেই ॥৴০আনা অংশ তাঁহাদের মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পুত্র দেওয়ান জাফরআলী হিং ।৴১২ গণ্ডা ও ১৪॥সারে চৌদ্দ কোসার জমিদার হইলেন এবং সেই কন্যার স্বামী দেওয়ান সুলতান মাহাম্মদ হিং ৶৮ গণ্ডা ও সারে আট কোসার জমিদার হইলেন। দেওয়ান সুলতান মাহাম্মদের পুত্র (দেওয়ান নজমদ্দিনের দৌহিত্র) দেওয়ান মাহাম্মদ হুদ্দির নাম ১১৭০ সালের বন্দোবস্তী কাগজে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং দেখাযাইতেছে, যে সময় সরাইল শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হইয়া ঢাকা নেয়াবতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে এই পরগণা উল্লেখিত তিনটি অংশে বিভক্ত হইয়াছিল।

ব্রিটিসাধিকারের আরম্ভে সরাইল পরগণা ময়মনসিংহ জেলা ভুক্ত হইয়াছিল। প্রচলিত শতাব্দী আরম্ভে মুরশিদাবাদ কাশিমবাজার নিবাসী বাবু জগবন্ধু রায় ময়মনসিংহ কালেক্টরিতে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান নাগরআলীর হিং।৴১২ গণ্ডা অংশ বাকী

রাজস্বের জন্য নিলাম হয়, তৎকালে সেরেস্তাদার মহাশয় কৌশলক্রমে যোগীরাম চৌধুরী নামক জনৈক মোক্তার দ্বারা অল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার তিন বৎসর অন্তে তিনি স্বীয়পুত্র রামবাবু ও জয়বাবুর নাম আশ্চর্য্য উপায়ে সংযুক্ত করত "রামজয় রায়" নামে সেই মোক্তার হইতে একটি কবালা করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বতন জমিদার সেই নিলাম রদের নালিস করিয়া জেলাকোর্টে জয় লাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সদর-দেওয়ানী আদালত বাদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সরাইল পরগণা ত্রিপুরাজেলা ভুক্ত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হিং।৵ আনী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে জগবন্ধু বাবুর পৌত্র বাবু নরসিংহ রায় তাহা ক্রয় করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মছলন্দ আলী পরলোক গমন করেন। ৵৮ গণ্ডা অংশ তাঁহার দুই পুত্র বিভাগ করিয়া লইয়া ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দেওয়ান মনহরআলী ৵৹ আনা ও কনিষ্ঠ দেওয়ান ছমদদ্আলী।৹ আনা প্রাপ্ত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান ছমদদ্আলীর।৹ আনা হিস্যা তাঁহার স্ত্রীর কাবিনের দাবিতে বিক্রয় হইলে মুনসী নাছিরদ্দীন ক্রয় করেন। তদনন্তর তাহা বাবু মোহিনীমোহন বৰ্দ্ধন প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে। দেওয়ান মনহর আলীর মৃত্যুর পর

তাঁহার স্ত্রীর কাবিনের দাবিতে ৶০ আনা অংশ বিক্রয় হইলে বাবু আশুতোষ নাথ রায় নাবালকের পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের মেনেজার ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং খারিজা তালুক ও নিষ্কর ভূমি ব্যতীত বাবু জগবন্ধু রায়ের বংশধর বাবু আশুতোষনাথ রায় এক্ষণ এই পরগণার ৶৴৩ গণ্ডা হিস্যার অধিকারী হইয়াছেন। অবশিষ্ট ১৭ গণ্ডার মালীক বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বটেন।

সতরখণ্ডল, সরাইলের অন্তর্গত হইলেও তাহা এক্ষণ একটি খারিজা মহাল হইয়াছে।

মির হবিব ধর্ম্মমাণিক্যকে জয় করিয়া যৎকালে জগৎ মাণিক্যকে চাকলে রোসনাবাদের আধিপত্য প্রদান করেন, সেই সময় বলদাখালের জমিদার আকা সাদেক ত্রিপুরার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হন। আধুনিক মেজেষ্ট্রেট কালেক্টরের ন্যায় রাজস্ব ও শান্তিরক্ষা উভয় কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্যের শাসন কালে (১১৪৬ বঙ্গাব্দে) সামরিক জায়গীর ও হস্তী ধৃত করার খরচ ৪৫০০০৲ টাকা বাদে ৩৩৩০৫৲ টাকা রোসনাবাদের রাজস্ব ধার্য্য হয়। উক্ত রাজস্ব ব্যতীত মহারাষ্ট্রা চৌহত ও খাসনবিসী আবওয়াব উল্লেখে ৮৭০০৲ টাকা অতিরিক্ত কর অবধারিত হইয়াছিল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কাদম্বা

ও চরপাতা নামক স্থানে দুইটি বাণিজ্যাগার সংস্থাপন করেন। ত্রিপুরা পর্ব্বতজাত কার্পাস নির্ম্মিত বাপ্তা বস্ত্রের বাণিজ্যই উল্লেখিত কুঠি স্থাপনের অভিপ্রায়। অনূন ১২ লক্ষ টাকার বাপ্তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা প্রতি বৎসর বিদেশে প্রেরিত হইত। * এই বাপ্তা বস্ত্রের দালালী দ্বারা লৌগ-গাড়ার সাহা পরিবার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ইঁহারা দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত হন। † বিলাতী শিল্পিগণ আমাদের বাপ্তা বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বাপ্তার বহির্ব্বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা ২৫।৩০ বৎসর

---

* *Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. VI. p. 288.*

† লৌগগাড়া চাঁদপুর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। যিনি বঙ্গে দ্বিতীয় জগৎশেঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; তাঁহার বাসভবন দর্শন করিবার জন্য আমরা ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তথায় গমন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা দেশে এরূপ একটি প্রকাণ্ড বাড়ী বোধ হয় আমরা অন্য কুত্রাপি দর্শন করি নাই। অট্টালিকার পতনাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। সেই বিনাশোন্মুখ অট্টালিকার মধ্যে তাঁহাদের ধনাগার স্থান দর্শন করিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। ধান্য তণ্ডুলাদির গোলার ন্যায় এক সময় যাঁহাদের টাকার গোলা ছিল, সেই পরিবারের একটি স্ত্রীলোক এক্ষণ পরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা।

পূর্ব্বেও বাপ্তা বস্ত্র দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বাপ্তা বস্ত্র বয়ন কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরায় ব্রিটিসপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। * ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ প্রথমত ত্রিপুরাকে নবাবের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্ত প্রদেশ চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথম বৎসর চাকলে রোসনাবাদের বার্ষিক রাজস্ব ১০০০০১ টাকা নির্ণয় করেন।

১১৭০ বঙ্গাব্দের (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের) বন্দোবস্তে বাঙ্গালার অন্যান্য অংশের ন্যায় ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রের অন্তর্গত মহাল সমূহের রাজস্ব অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মাহাম্মদ রেজা খাঁর বন্দোবস্তে (১১৭২ বঙ্গাব্দে) রোসনাবাদের রাজস্ব ১০৫০০০ টাকা নির্ণীত হয়। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ১৩৩০০১ টাকা এবং ১১৮৮ বঙ্গাব্দে ১৬৮০০১ টাকা রোসনাবাদের রাজস্ব অবধারিত হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ত্রিপুরা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরার রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার অর্পিত হয় ; কিন্তু ত্রিপুরা ও নওয়াখালীর অন্তর্গত অন্যান্য মহাল ঢাকার (জালালপুরের) রাজস্ব কর্ম্মচারী রাজা হেমাৎ সিংহ ও যশরৎ খাঁর

* ১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শাসনাধীনে ছিল (১৭৬৫ হইতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ)। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কেলসেল হেরিস, ও লেম্বার্ট রোসনাবাদ ব্যতীত অন্যান্য অংশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায় ও সর্ব্বপ্রকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য কালেক্টর উপাধিধারী জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব আদায় জন্য দেশীয় নায়েব নিযুক্ত হয় এবং সাধারণ শাসন কার্য্য ইংরেজ রাজপুরুষ নির্ব্বাহ করিতেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে (সরাইল পরগণা ব্যতীত) ত্রিপুরা ও নওয়াখালীর সমতলক্ষেত্র দ্বারা একটি জেলা গঠিত হয়। এই জেলা প্রথমত "রোসনাবাদ ত্রিপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই জেলাকে দুই অংশে বিভক্ত করিতেন; এক্ষণ যেমন বাঙ্গালা বলিতে গেলে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও চুটিয়ানাগপুর বুঝায় এবং "বাঙ্গালা প্রপার" খাস বাঙ্গালাকে বুঝায়, তদ্রূপ প্রথম অবস্থায় জেলা ত্রিপুরা বলিলে সমগ্র ত্রিপুরা ও ভুলুয়াকে বুঝাইত। কিন্তু "টিপারা-প্রপার" বলিলে কেবল চাকলে রোসনাবাদকে বুঝাইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলা গঠিত হইলে, রেসিডেন্ট লিক্ সাহেবের হস্তে ইহার শাসনভার সমর্পিত হয়। কিন্তু ফৌজদারি সংক্রান্ত কার্য্য তাঁহার হস্তে অর্পিত না হওয়ায় দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। ডাকাইতেরা দলবদ্ধ হইয়া

দিবা দ্বিপ্রহরেও নরহত্যা, গৃহদাহ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্য অবাধে সম্পাদন করিত। তদানীন্তন জমিদারগণ মধ্যে কোন্ কোন ব্যক্তি ডাকাইতের আশ্রয় দাতা ছিলেন। ডাকাইত দলের সাহায্যে তাঁহারা আত্মরক্ষা ও পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রাজ-পুরুষগণ ডাকাইতি অত্যাচার নিবারণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তদবধি শান্তিময় ব্রিটিস শাসনে দেশের উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ব্রিটিস পলিটিকেল এজেণ্ট সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে কুকিগণ ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্রে আপতিত হইয়া সময় সময় কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে জজ মাজেষ্ট্রট প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিয়োগদ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই জেলার উন্নতি বিধান করিয়াছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সকল বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরা জেলা হইতে নওয়াখালীকে কিরূপে কোন সময়ে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, তাহা যথা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরার অন্তর্গত অধিকাংশ ভূমি অদ্যাপি ঢাকা ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

জেলা ত্রিপুরা (পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

অধিবাসী :—ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মনুষ্যের বাসোপযোগী হইলে কোন্ জাতীয় মানব সর্ব্বপ্রথম এস্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন। অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, কোচগণ এপ্রদেশের আদিম নিবাসী। এজেলার কোন কোন স্থানের প্রাচীন পরিত্যক্ত বাস্তু-ভূমি ও পুষ্করিণীকে অদ্যাপি লোকে "কোচের বাটী ও কোচের পুকুর" বলিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় চণ্ডালগণ কোচদিগকে উত্তরবাহিনী করিয়াছিল। * বলা বাহুল্য যে, কোচ এবং চণ্ডাল উভয়ই লৌহিত্য বংশের এক শাখা হইতে উদ্ভূত। মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া "আদম সুমারি" দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে ত্রিপুরাবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডালজাতির সংখ্যা সর্ব্বাধিক। দ্রাবিড় বংশীয় কৈবর্ত্তগণ চণ্ডালদিগকে উত্তরবাহিনী করিয়াছিল। "আদম সুমারি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে, চণ্ডালদিগের সংখ্যা চট্টগ্রাম হইতে নওয়াখালী জেলাতে অধিক এবং ত্রিপুরা

* ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারিতে দৃষ্ট হইবে যে, অদ্যাপি প্রায় ৩০০ কোচ এই জেলায় বাস করিতেছে।

জেলাতে সর্ব্বাধিক। এজন্যই বলিতেছিলাম যে, জল-বিহারী কৈবর্ত্তগণ, চণ্ডালদিগকে দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে প্রেরণ করিয়াছিল। উল্লেখিত ঘটনা সমূহের পর, লৌহিত্য বংশের অন্যান্য শাখা উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে ত্রিপুরায় উপনীত হয়। কিন্তু ইহারা পর্ব্বত শ্রেণী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতলক্ষেত্রে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিল কি না তৎপক্ষে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিপুর-রাজবংশ শ্যানজাতি হইতে উদ্ভূত এবং ইঁহারা কামরূপের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আরাকানী মগেরা চট্টগ্রামের নিকট তাঁহাদের গতিরোধ না করিলে তাঁহারা যে; দক্ষিণদিকে কতদূর অগ্রসর হইতেন তাহা কে বলিতে পারে। ত্রিপুরাজাতির গতি পরিবর্ত্তন করত মগেরা স্বয়ং উত্তরবাহিনী হইয়াছিল। চট্টগ্রাম মগে পরিপূর্ণ। নওয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলাতেও মগ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর্য্যগণ কোন সময় ত্রিপুরায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট জেলায় যে কয়েক খণ্ড তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার এক খণ্ডও শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে; কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্ব্বে যে আর্য্যগণ ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া

গিয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল উন্নতির সময়ে ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনার্য্য ভূমিতে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। ত্রিপুরায় বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। শৈবধর্ম্ম ত্রিপুরার আদি ধর্ম্ম। পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ কিরাতদিগকে শৈব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ যে শৈব ছিলেন, রাজমালায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৈবধর্ম্মের পর আগমোক্ত ধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রচারিত হইয়াছিল। কামরূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। আমাদের বোধ হয় তথা হইতে এক দল ব্রাহ্মণ পঞ্চমকারের বীজ লইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। চট্টলাচলের চন্দ্রশেখর এবং ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী বহুকালের প্রাচীন না হইতে পারেন, কিন্তু "দেবতামূড়ার" পর্ব্বত গাত্রে ক্ষোদিত দেবী ভগবতীর, দশভুজা-মহিষাসুর-মর্দ্দিনী-মূর্ত্তি, যাহা উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইলোরা কিম্বা ধউলীর পর্ব্বত গাত্র-ক্ষোদিত গুহা এবং মূর্ত্তি সমূহের ন্যায় দেবতামূড়ার পর্ব্বত গাত্র ক্ষোদিত দেবমূর্ত্তি সমূহ প্রাচীন কিম্বা উৎকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে প্রাচীন আর্য্যদিগের সূক্ষ্মশিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ভাস্কর কার্য্যের বয়ঃক্রম দেড় সহস্র বৎসরের ন্যূন বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে

পারি না। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে আর্য্যগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের বীজ লইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তান্ত্রিক ধর্ম্মের পর ভাগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। চট্টগ্রামের তাম্র শাসনে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ঘটনার দীর্ঘকাল পরে চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম বীজ ত্রিপুরার উর্ব্বর ক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্রিপুরায় প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ প্রায় সকলেই শাক্ত। গোস্বামী মহাশয়গণ নিম্ন শ্রেণীতে কিঞ্চিৎ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিলেও তাহাদের রুধির স্রোত প্রবাহকারী কালী ও দুর্গা পূজা বন্ধ করিতে পারেন নাই। ত্রিপুরার রাজবংশ অল্পকাল যাবৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে ঘোর শাক্ত শ্রেণীতে স্থান প্রদান না করিয়া বিরত হইতে পারি না।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় "ইছলাম" ধর্ম্মের বীজ সংরোপিত হয়। খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান নছরদ্দিন নছরৎ সাহ দ্বারা ত্রিপুরা প্রদেশে সেই ধর্ম্মের পূর্ণ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সময় নিম্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক হিন্দু মাহাম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই প্রদেশের জমিদার ও তালুকদার শ্রেণীতে ইছলাম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু স্তানের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে।

ব্রাহ্মণ—ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় ৩১ সহস্র হইবে।* বল্লালের শ্রেণী বিভাগের বহুকাল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়াছিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাইতেছি না। দুই তিন শতাব্দী মধ্যে যাঁহারা ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সকল ব্রাহ্মণগণ যদিচ পরিচয় প্রদান কালে রাঢ়ী, বারেন্দ্র কিম্বা বৈদিক প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতে তাঁহারা বিরত নহেন। ত্রিপুরাবাসী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা সম্পত্তি ও শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারাই সম্ভ্রান্ত বা কুলীন। সর্ব্ববিদ্যা ঠাকুরের সন্তানগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ—সেই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষের নামে সম্মানিত হইয়াছেন। মহীচাল ও শ্যামগ্রামের রায় † মহাশয়গণ জমিদারি দ্বারা সম্মানিত। কালীকচ্ছের রায় ও তলাপাত্র মহাশয়গণ বিষয় কর্ম্মদ্বারা সম্মানিত। চাপীতলা (কাশ্যপ), কালীকচ্ছ (মৌদ্‌গুল্য ও অগ্নিবশ্য), বুড়িচঙ্গ (ভরদ্বাজ) এবং বিদাকুট (কাশ্যপ) প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য্য

---

*নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের পুরোহিত, যাঁহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, উক্ত গণনায় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

† শ্যামগ্রামের রায় মহাশয়গণ বটব্যাল বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

মহাশয়গণ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই রাঢ়ী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এইবাক্য সম্পূর্ণ সঙ্গত কিনা তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। উল্লিখিত ভট্টাচার্য্য বংশ সমূহে অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালীকচ্ছের মৌদ্গল্য বংশে দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার, হরিহর তর্কবাগীশ, কৃষ্ণজীবন বিদ্যাভূষণ ও চুণ্টার সাবর্ণ্য বংশে শ্রীকান্ত বিশারদ জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে ভাতুঘর গ্রামে শঙ্কর তর্কালঙ্কার ও কালীকচ্ছে (অগ্নিবশ্য) রামধম শিরোমণি এবং বুড়ীশ্বর গ্রামে (কাশ্যপ) শিবকিঙ্কর বিদ্যাভূষণ আবির্ভূত হন। ইঁহারা সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

উল্লিখিত শঙ্কর তর্কালঙ্কার জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়, ব্যাকরণ ও কাব্যে শঙ্করের অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। এস্থলে তৎপ্রণীত দুই খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল। তৎপ্রণীত "বৈষ্ণব নির্ণয়" একখানা চমৎকার কাব্য। আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়াছি। জয়দেবের পর অন্য কোন বাঙ্গালীর লেখনী এরূপ মধুর পদাবলী প্রসব করেনাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কবির সম্পূর্ণ শক্তি সম্প্রদায় বিশেষের কুৎসায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নেড়া

নেড়ী সম্প্রদায়ের ঘৃণিত চরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব নির্ণয় লিখিত হইয়াছে। এই কাব্যের আদ্যোপান্ত শ্লেষ ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত এবং শাক্ত বিদ্বেষী জমিদারের আচরণে মর্ম্মপীড়িত হইয়া শঙ্কর এই কাব্য রচনা করেন এবং অবশেষে তর্কযুদ্ধে বৈষ্ণবদিগকে জয় করিয়া সেই জমিদারকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

তিনি কলাপ পরিশিষ্টের গোপীনাথ কৃত টীকার "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।*

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, খাণ্ডব ঘোষের সহিত তাঁহার পুরোহিত সাবর্ণ্য গোত্রজ তরণি মিশ্র ত্রিপুরার উপনিবিষ্ট হন। সরাইল ও নুরনগর পরগণার সাবর্ণ্য ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই তাঁহার সন্তান সন্ততি। সেই সাবর্ণ্য বংশে চুণ্টাগ্রামের

---

* শঙ্কর কৃত প্রবোধচন্দ্রিকার প্রথম দুইটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

প্রণম্য মাতা পিতরৌ শ্রিয়া শঙ্কর শর্ম্মণা।
গোপীনাথস্য কিয়তী বাক্ প্রণালী প্রকাশ্যতে ॥১॥
অস্তং গতবতী গুরুতরণৌ
গ্রন্থার্থোপদেশ ভানুনা সহিতে।
অকলঙ্ক প্রবোধ চন্দ্রিকেয়ং
সমরত্ন তমঃ কলাপ চারাণাম্ ॥২॥

শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক তথায়ই অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। *

চাপিতলা ভট্টাচার্য্য বংশে নরসিংহ বাচস্পতি এবং তৎ পুত্র হরিনারায়ণ তর্কবাগীশ প্রাচীন কালের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বিগত শতাব্দীতে উক্ত বংশে স্মার্ত্ত রুক্মিনীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার এবং তৎ পুত্র কালীদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত বংশে রঘুদেব তর্কবাগীশ ও বৈদ্যনাথ তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন।

বুড়িচঙ্গ নিবাসী গঙ্গাধর পঞ্চানন একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল; তিনি বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

বিদ্যাকুটের (বশিষ্ঠ গোত্রজ) কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি চণ্ডীর এক খণ্ড উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত

---

* সংস্কৃত কালেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ছাত্র।

কলাপের টিকাও সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইহা "কাশী নাথী পাত্রা" বলিয়া আখ্যাত হয়।

মাইজখার নিবাসী (পাকড়াসী) বিশ্বনাথ তর্কবাচস্পতি এবং বাউরখাড় নিবাসী বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহারা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তদনন্তর আমরা লেসীয়ারা নিবাসী পণ্ডিত প্রবর তারানাথ সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখ করিতে পারি। অল্পকাল হইল তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ত্রিপুরা নিবাসী জীবিত পণ্ডিতদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটাই নিবাসী পীতাম্বর তর্কভূষণ অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন। নয়াদেল নিবাসী স্মার্ত্ত পণ্ডিত রাম দুলাল বিদ্যাভূষণ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্যবহার তত্ত্ব প্রকাশিকা (দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি) এবং রাজ ধর্ম্ম সংগ্রহ নামে দুই খানা সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্যবহার-তত্ত্ব-প্রকাশিকা মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পুস্তক অমুদ্রিত অবস্থায় আছে।*

---

* পরহিতাব্রত পরায়ণ নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর যৎকালে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, নড়াইলের জমিদারগণ

বুড়ীশ্বর নিবাসী কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর * এবং ইছাপুরা নিবাসী কৃষ্ণসুন্দর দর্শন-শিরোরত্ন সুপরিচিত দার্শনিক পণ্ডিত। অন্যান্য শাস্ত্রেও ইঁহাদের অধিকার আছে। আমরা নবীন পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিব না। ভবিষ্যৎলেখক তাহা সম্পাদন করিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া নানা প্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ত্রিপুরা নিবাসী ব্রাহ্মণগণ ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে কায়স্থ এবং বৈদ্যের পশ্চাৎগামী হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় তাঁহারা কায়স্থ ও বৈদ্যের সমশ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে পারিতেছেন না।

তৎকালে তাঁহার প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালার প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ হইতে বিধবা বিবাহের প্রতিকুল ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গভীর শাস্ত্র জ্ঞানের অবমাননা করিয়া উক্ত অন্যায় ব্যবস্থা পত্রে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

* ইনি পূর্ব্বোল্লিখিত শিবকিঙ্কর বিদ্যাভূষণের পৌত্র। ভাদুগড় নিবাসী শঙ্করের সহিত ভিন্ন জেলাবাসী লোকনাথ নামক অন্যএক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বিচারকালে শিবকিঙ্কর মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বিচারের পর শিবকিঙ্কর বলিলেন :—

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ লোকনাথঃ স্বয়ং হরি।
দ্বয়োর্ব্বিবাদয়োর্ম্মধ্যে কিঙ্করঃ কিং করিষ্যতি॥

উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার হিন্দুর পুরোহিত একমূল হইতে উদ্ভূত; কিন্তু যুগী জাতির পুরোহিত তাহাদের স্বজাতি হইতে সমুৎপন্ন।

কায়স্থ ও বৈদ্য :— ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে দৃষ্ট হইবে যে, ত্রিপুরা জেলায় ৭২৫৫৪ কায়স্থ এবং ৪৭২৩ বৈদ্য বাস করিতেছেন। আমরা এই গণনাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় ত্রিপুরা জেলায় প্রকৃত কায়স্থ ও বৈদ্যের সংখ্যা ইহার অর্দ্ধেকের অধিক হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গে নবশাখ বংশীয় অনেকেই কায়স্থ আখ্যায় পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেজেষ্ট্রেট ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের, সেই সেই জেলার আদম সুমারির বিজ্ঞাপনীতে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। * বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের আর একটী শ্রেণী, (যাহারা ভদ্রলোকদিগের "সেবক" বা "ভাণ্ডারি" বলিয়া পরিচিত এবং ইহারা শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। তাহারা) মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। আদম সুমারির কর্ত্তাগণ ইহাদিগকেও কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন। ত্রিপুরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রকৃত কায়স্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। চৌদ্দগ্রামের পাল্কী বাহক বেহারাগণও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

---

* *Census of India. 1891. Vol. III. P. 267.*

আমরা ইহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি যে, বঙ্গীয় কায়স্থ এবং বৈদ্য এক বর্ণ বৃক্ষের দুইটী শাখা মাত্র।* প্রকৃত বঙ্গদেশে ইহারা দুই শাখায় বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে, কতকগুলি কায়স্থ এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্যই ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানে কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হইতেছে। চাঁদপুর উপবিভাগের কায়স্থ ও বৈদ্যগণ অল্পকাল হইল প্রকৃত বঙ্গদেশ হইতে আগমন করত পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। সদর এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের নবাগত কায়স্থ ও বৈদ্যগণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বাগত কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। চাঁদপুরের কায়স্থ কিম্বা বৈদ্যগণ এজন্য গৌরবের ভান করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগ নিবাসী কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বিদ্যা শিক্ষার দ্বারা এইরূপ উন্নত হইয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে ত্রিপুরা জেলা অন্ধকার হইয়া পড়ে। সেই প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের কায়স্থ ও বৈদ্যগণ বিদ্যালোচনায় আত্ম প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সদর ও চাঁদপুর চিরকাল তাঁহাদের পশ্চাদ্গামী। সুন্দরবনের প্রথম কমিসনর সেন বাহাদুর (উমাকান্ত সেন) সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কেবল তিনিই সদর

* নব্যভারত, ষষ্ঠ খণ্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা।

উপবিভাগের অন্তর্গত চৌদ্দগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতিত সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ¶ ত্রিপুরা নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের এবং জেলাকোর্টের প্রধান উকিলগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগ নিবাসী। যে সকল ত্রিপুরাবাসী প্রতিযোগী পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবিন্সিয়াল সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগ নিবাসী কায়স্থ ও বৈদ্য বংশজাত। সমগ্র সরাইল ও নুরনগর পরগণা এবং বলদাখাল পরগণার কিয়দংশ লইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপবিভাগ গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সরাইলবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা চিরকাল ত্রিপুরার শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছেন। বল্লাল ও দেবীবর তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সদর উপবিভাগ নিবাসী কতকগুলি কায়স্থ আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং তদ্রূপ কতকগুলি বৈদ্য বংশজাত ব্যক্তিও বৈদ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আর কতকগুলি ভদ্রলোক সুবিধা

¶ The most educated and influential men in the district hail from Brahmanbaria.

Census Report of Tippera 1891, page 17.

ও প্রয়োজন অনুসারে কথন বা কায়স্থ এবং কথনও বৈদ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।* আমরা নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না।

ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জেলার ভদ্রলোকের মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা "কৃষ্ণপক্ষ" আখ্যা বিশিষ্ট একটি

---

*ইহার তিনটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি:—

(১) দুই খণ্ড রেজেষ্টরী দলিলে আমরা এই রূপ একটি আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়াছি। প্রথম দলিলের বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর। ইহাতে দত্ত বংশীয় এক ব্যক্তি দলিল দাতার সেনাক্তকারী ছিলেন। তিনি স্বয়ং কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। দ্বিতীয় দলিলের বয়ক্রম ৫ বৎসর। এই দলিল দাতা পূর্ব্বোক্ত সেনাক্তকারীর পুত্র। তিনি বৈদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল দত্ত বংশীয় জনৈক অশীতি পর বৃদ্ধ পরলোক গমন করিয়াছেন। ৪৩ বৎসর গত হইল তিনি কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করেন। সেই কালে উক্ত দত্ত মহাশয় স্বয়ং কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সপিণ্ডজ্ঞাতিগণ অধুনা বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

(৩) দাস বংশীয় জনৈক কায়স্থ ভিন্ন জেলাবাসী এক বৈদ্য পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বিবাহকালে গোত্রদ্বারা জানা গেল তিনি কায়স্থ, সুতরাং দাস মহাশয় গোত্রটি পরিবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু তাঁহার সপিণ্ড জ্ঞাতিগণ গোত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই।

প্রাচীন প্রবাদ বাক্য প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন কর্ত্তাগণ শূদ্র জাতীয় বালিকাদিগকে দাসীরূপে গ্রহণ করত তাহাদের সহিত স্বামী স্ত্রীবৎ ব্যবহার করিতেন। সেই সকল রমণীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে "কৃষ্ণপক্ষ" এবং পাণি গৃহীতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে "শুক্লপক্ষ" বলা হইত। "কৃষ্ণপক্ষের" সন্তানগণও তাঁহাদের পিতার উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন। কালক্রমে অবস্থার উন্নতি দ্বারা কোন কোন বংশের কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। ভুলুয়ার একটি প্রধান বংশ শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই শাখায় বিভক্ত। সরাইল ও নূরনগর পরগণায় আমরা কতকগুলি নামজাদা কৃষ্ণপক্ষের দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। নামোল্লেখ দ্বারা তাহাদিগকে মর্ম্ম পীড়িত করা ইতিহাস লেখকের অভিপ্রেত নহে।

ত্রিপুরা নিবাসী কায়স্থ ও বৈদ্য জাতীয় মানবগণ সকলেরই (ন্যূন কিম্বা অধিক পরিমাণ) কিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি আছে। পূর্ব্বে ইহাদ্বারা তাঁহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হইতেছে না, এজন্য তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বিষয় কর্ম্ম করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন।

ক্ষত্রিয় ও ভাট :— ত্রিপুরা জেলায় ক্ষত্রিয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বোধ হয় দুই সহস্রের অধিক হইবে না। অত্র জেলাবাসী ভাটগণ "বর্ম্মণ" আখ্যা দ্বারা আত্ম পরিচয়

প্রদান করত ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং আদমসুমারি কর্ত্তাগণের পক্ষে ক্ষত্রিয় ও ভাটদিগকে পৃথক্ করা অসাধ্য কর্ম্ম হইয়াছে। জমিদারি ও তালুকদারি হইতে সামান্য পেয়াদার কার্য্য ক্ষত্রিয়দিগের অধিকৃত। ছত্র ও পাটি বিক্রেতা কতকগুলি লোক আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাধারণে ইহারা ভাট বলিয়া আখ্যাত। কিন্তু ইহারা স্বয়ং নামের অন্তে "বর্ম্মণ" শব্দ সংযুক্ত করত ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিতেছেন। চট্টগ্রাম নিবাসী ছত্র ও পাটিবিক্রেতাগণ তথাকার আদম সুমারির কর্ত্তাগণ দ্বারা ভাট আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন। আর ত্রিপুরার অন্তর্গত "ভাটপাড়া" গ্রামনিবাসী ব্যক্তিগণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইহারা ক্ষত্রিয় কি ভাট কুলোদ্ভব তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

বৈশ্য :—ত্রিপুরা জেলায় বৈশ্য আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি; কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের যে সকল জাতি বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত, ত্রিপুরায় সেই সকল জাতি নিতান্ত বিরল নহে।

অবশিষ্ট হিন্দুদিগকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। ১—জলাচরণীয় হিন্দু। ২—জল-অনাচরণীয় হিন্দু। জলাচরণীয় হিন্দুদিগকে আমরা শূদ্র আখ্যায় পরিচিত করিব। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ

যাহাদের স্পৃষ্ট জলপান করেন, তাহারা পবিত্র শূদ্র। যাহাদের স্পৃষ্ট জল উচ্চশ্রেণীর অপেয়, তাহারা অনাচরণীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে।

শূদ্র :—ইহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রশাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১—শূদ্র, ২—নাপিত, ৩—গোপ ৪—কর্ম্মকার, ৫—কুম্ভকার, ৬—তৈল-পাল, ৭—গন্ধবণিক, ৮—তন্তুবায়, ৯—লতাবৈদ্য বা বারুই, ১০—মোদক(হাউলাই, কুড়ি প্রভৃতি।) ১১—শঙ্খকার, ১২—কাংস্যকার, ১৩—স্বর্ণকার, ১৪—মালাকার।

শূদ্র—উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের ক্রীত দাস দাসী* হইতে এক শ্রেণীর লোক উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ত্রিপুরা-জেলায় বোধ হয় ২৫।৩০ হাজারের ন্যূন হইবে না। আমরা ইহাদিগকেই বিশেষ ভাবে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

* নবশাখ বংশ হইতে এই সকল দাস দাসী ক্রয় করা হইত। প্রায় ৬০ বৎসর গত হইল জনৈক ভদ্রলোক দময়ন্তী নামক একটি বালিকাকে ক্রয় করেন। তাহার খরিদা কবালা আমরা দর্শন করিয়াছি। সেই বালিকা দময়ন্তী অদ্যাপি জীবিত আছে। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল ইতিহাস লেখকের ৺ পিতৃ দেবতা মহাশয় শ্রীহট্ট হইতে একটি দাস ও একটি দাসী ক্রয় করিয়া আনেন। এই প্রথা অধুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

থাকি।*১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে ইহাদের সংখ্যা ২৫১৩ মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারিতে ৮১৬২ জন শূদ্র গণিত হইয়াছে। এই বিংশতি বৎসর মধ্যে ইহাদের বংশ কখনই এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় আরও বহুসংখ্যক শূদ্র কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের বসনাভ্যন্তরে লুকায়িত রহিয়াছে। উচ্চশ্রে-ণীর হিন্দুদিগের দাস্যতা ইহাদের জীবিকা ছিল। বিবাহ কালে বর ও পাত্রীকে পাটে উঠান এবং কুটুম্বালয়ে সন্দেশ (তত্ত্ব) লইয়া যাওয়া ইহাদের দুইটী প্রধান কার্য্য ছিল। কিন্তু অধুনা ইহা নিতান্ত অপমান জনক বোধে শূদ্রগণ এই কার্য্য পরি-ত্যাগ করিতেছে এবং এই জন্য তাহাদের চিরপ্রতিপালক কায়স্থ ও বৈদ্যের সহিত তাহাদের বিষম কলহ চলিতেছে। শূদ্রগণ তাহাদের প্রভুগণ হইতে নিষ্কর কিম্বা অল্পকরে জায়গীর স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভূমি প্রাপ্ত হইত। এক্ষণ তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেছে বলিয়া তাহাদের প্রভুগণও সেই সকল জায়গীর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবম্প্রকার দুই একটি ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। শূদ্রগণ নূতন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আদালত তাহাদের এই অন্যায় আবদার শ্রুতিযোগ্য বলিয়া বিবেচনা

* উড়িষ্যায় ইহারা "সাকৃরেৎপেসা" বলিয়া পরিচিত।

করেন নাই। সুখের বিষয় এই যে, শূদ্রগণ ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা, তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য যত্নবান হইয়াছে। আমরা ভরসা করি তাহারা এই পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক উন্নতির সোপানে আরোহন করিবে। কিন্তু জাতীয় আখ্যাটি পরিত্যাগ করা তাহাদের কর্ত্তব্য নহে।

পশ্চিম বঙ্গে নানা প্রকার গোপ দৃষ্ট হয়। উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা যাহারা রোগাক্রান্ত গোকুলের চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহারা গোপকুলে ঘৃণার্হ। তাহাদের জন্যই পশ্চিম বঙ্গে গোপকুলের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। ত্রিপুরা কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্য কোন জেলাতে উল্লেখিত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের গোপ নাই। ত্রিপুরাবাসী গোপ বা গোয়ালাদিগকে আমরা সদ্‌গোপ শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিতে পারি। পশ্চিম বঙ্গের সদ্‌গোপ জাতি গব্যরস বিক্রেতা নহে সত্য, কিন্তু ত্রিপুরা জেলাবাসী গোপগণ তাহাদের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের সামান্য ভৃত্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেনা। ইহা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত ঘৃণার্হ কার্য্য।

অন্যান্য শূদ্রগণ সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় ত্রিপুরাবাসী গন্ধবণিকগণ বৈশ্য আখ্যায় পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। তন্তুবায়গণ আপনাদের জাতীয় ব্যবসা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা কলিকাতা ও ঢাকা নিবাসী বসাক

দিগের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। লতাবৈদ্য ও তেলীপাল (কুণ্ড)দিগের মধ্যে সামাজিক অত্যাচার নিতান্ত যন্ত্রনাদায়ক ও ঘৃণার্হ। তেলীপালগণ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়াছে। লতাবৈদ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি "জাতিবারুই" দ্বিতীয় "শিক্ষাবারুই।" জাতিবারুইগণ বলেন, তাহারা এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণ এক মূল হইতে উদ্ভূত, এজন্য তাহারা পানের ব্যবসা করিয়া লতাবৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যদিগের কুল-পদবি তাহাদের মধ্যে আছে। শিক্ষাবারুই শূদ্রজাতীয়। মোটের উপর আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে ত্রিপুরা বাসী শূদ্রগণের অবস্থা অনুন্নত।

অনাচরণীয় হিন্দু ঃ—ইহাদিগকে নিম্ন লিখিত উপশাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১ চণ্ডাল, ২ কৈবর্ত্ত, ৩ পাটনি, ৪ সাহা, ৫ যোগী, ৬ যুগী, ৭ কপালী, ৮ সুত্রধর, ৯ রজক ১০ নট, ১১ মালী, ১২ চামার, ইত্যাদি। এই সকল জাতির মধ্যে অনেক প্রকার শাখা প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে যে গুলি ব্যবসা দ্বারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

১। চণ্ডাল ঃ—আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে শূদ্র পুরুষ ও ব্রাহ্মণ রমণীর সংযোগে এই জাতীর উৎপত্তি।

এই বাক্য যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রামাণ্য তাহা আমরা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। * শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত (সি,এস) মহাশয়ের বর্ণনা দ্বারা ও আমাদের মত সমর্থিত হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় চণ্ডালগণ ভারতের আদিম নিবাসী। নরজাতি-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে লৌহিত্য বংশের একটী শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ত্রিপুরাবাসী চণ্ডাল দিগকে দুইটি প্রশাখায় বিভক্ত করা যাইতেছে। (১)—নমশূদ্র। কৃষিকার্য্য ও নৌকাবাহন দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। (২)—চণ্ডাল (বেহারা বা পাল্কীয়া) ইহারা প্রধানত পাল্কী বাহক. প্রয়োজন অনুসারে ইহারা কৃষি এবং অন্যান্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হিন্দু জাতির মধ্যে চণ্ডালই ত্রিপুরার প্রধান অধিবাসী।

২। কৈবর্ত্ত (ধীবর):— স্মৃতি ও পুরাণে ইহাদের উৎপত্তি বৃত্তান্ত দুই প্রকার বর্ণিত আছে। নিষাদ পুরুষ ও বৈদেহ রমণী সংযোগে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারা কৈবর্ত্ত দাস। মতান্তরে গোপ পুরুষ ও শূদ্রারমণীর গর্ভে ধীবর জাতির উৎপত্তি; কিন্তু নরজাতি-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতদিগের মতে কৈবর্ত্তগণ ভারতের আদিম নিবাসী. দ্রাবিড় বংশের

* "বর্ণভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (নব্যভারত, ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)।

একটী প্রধান শাখা। ইহারা অনেকগুলি প্রশাখায় বিভক্ত। (১) হালুয়াদাস:— পশ্চিম বঙ্গে ইহারাই জলাচরণীয় কৈবর্ত্ত। শ্রীহট্ট নিবাসী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করেন। ত্রিপুরায় হালুয়াদাসদিগের অবস্থা পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। নুরনগর পরগণায় হালুয়াদাসগণ তালুকদার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মুনি-অঙ্কের চৌধুরীগণ বিশেষ ধনাঢ্য ও পরাক্রমশালী ছিলেন। অধুনা হালুয়াদাসগণ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। (২) জাল-জীবিদাস:—ইহারা পূর্ব্ব বঙ্গে প্রকৃত কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত। জালদ্বারা মৎস্য ধৃত করা ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। নৌকা-বাহন এবং শুক্না মৎস্য প্রস্তুত করিয়া, জীবিত ও শুক্না মৎস্য বিক্রয় করা ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। হালুয়া এবং জালজীবিদাস উভয়ই পরাশর দাস বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করে। ইহা সুখের বিষয় যে, বিদ্যালোচনার দ্বারা ইহারা উন্নতির পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। (৩) ঝাল (ঝল্ল), (৪) মাল (মল্ল), * (৫) তিয়র

* মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ণিত ঝল্ল, মল্লগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। মহা-ভারতে মল্ল ক্ষত্রিয় দিগের উল্লেখ আছে। ভগবান শাক্য-সিংহের অভ্যুদয় কালে মল্লরাজগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন নরপতিগণ মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন।

(তিবর) ইহারা সকলেই মৎস্যজীবী। অধুনা ইহারা সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

৩। পাটনিঃ—আমাদের বিবেচনায় পাটনিগণ কৈবর্ত্তবংশের একটী স্বতন্ত্র শাখা। ইহারা প্রধানত নৌকাজীবী। ত্রিপুরার পাটনিগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মাঝি, ইহারা খেয়া নৌকা বাহিয়া থাকে বলিয়া মাঝি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) বাদ্যকারক, ইহারা ঢোল, কাড়া প্রভৃতি বাদ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। (৩) শিকারী, ইহারা টেঁটা, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার মৎস্য কুম্ভীরাদি সুকৌশলে শিকার করিয়া থাকে। আমরা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, চুরি ডাকাতি পাটনি মাঝিদিগের একটি প্রধান ব্যবসায় ছিল। ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে ক্রমে ইহারা এই ব্যবসায়টি পরিত্যাগ করিতেছে।

৪। সাহাঃ—সাহাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) সাহা শৌ। (২) শুঁড়ি। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে গোপ পুরুষের ঔরসে ও শূদ্রা রমণীর গর্ভে শৌণ্ডিক জাতির উৎপত্তি। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বৈশ্য পুরুষ এবং তিবর রমণীর সংযোগে শুণ্ডিজাতির উৎপত্তি। শুঁড়ি সেই শৌণ্ডিক বা শুণ্ডি শব্দের অপভ্রংশ। আকৃতি দ্বারা ইহাদিগকে অনার্য্য বংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা যাহারা মদ্য প্রস্তুত করে, তাহারাই শুঁড়ি। যাহারা সেই ঘৃণিত ব্যবসায়

পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্বভাব হইয়াছে, তাহারাই সাহা বা সৌ। ত্রিপুরা জেলাবাসী সাহাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা:— আঠারচূড়া (বারেন্দ্র), ছকুলিয়া এবং পাঁচকুলিয়া (রাঢ়ী)। সাহাগণ নানা প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ক্রমে তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি "জমিদারি" ও তালুক প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। সাহাগণ সম্পত্তিশালী হইলে স্বয়ংই "রায়", "চৌধুরী" প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা জেলার মধ্যে সাহা জাতি ধনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। লোহা গাড়ার দ্বিতীয় "জগৎশেঠ" পরিবারের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অধীন হরিপুরের সাহাগণ ত্রিপুরা জেলায় তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। অন্যান্য বিবিধ স্থানে ধনবান সাহা জাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এই প্রাচীন বাক্যের ইহারাই সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।

অর্থদ্বারা দরিদ্র কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা শূদ্র কন্যা ক্রয়করিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার রোগ শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরার সাহাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা বাসী কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা শূদ্রগণ উল্লিখিত কন্যা বিক্রয় কার্য্যে সম্মত নহেন, বলিয়া এই আশ্চর্য্য রোগাক্রান্ত সাহাগণ শ্রীহট্ট হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া আনয়ন করে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু

হইতে কন্যা ক্রয় করিয়া কিম্বা উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালককে নানা প্রকার প্রলোভনে বাধ্য করিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়া শ্রীহট্টের সাহাদিগের একটী আশ্চর্য্য রোগ। * ইহা দ্বারা তাহাদের কিছু মাত্র লাভ হইতেছে না, কারণ সেই কন্যা ও বালক উভয়ই জাতি চ্যুত হইয়া সাহা জাতি প্রাপ্ত হয়।

৪ যোগী :— ইহারা খেলাস্ত-যোগী (কৃত্রিম-যোগী) বা সন্ন্যাসী বলিয়া আখ্যাত। আদমসুমারির কর্ত্তাগণ যে, ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী বেশে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ইহাদের জাতীয় কার্য্য। দূর দেশে ইহারা প্রকৃত সাধু বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করত অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সবডিবিসনের কাশীরামপুর ও মুনি-অন্ধ প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস আছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

---

* শ্রীযুক্তা রমাবাইএর স্বামী ৺বাবু বিপিনচন্দ্র দাস কলিকাতা নিবাসী একটী কুলীন কায়স্থ যুবককে কৌশলে ও প্রলোভনে বাধ্য করিয়া স্বীয় পরিবারের একটী বালিকার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। শ্রীহট্টের সাহাগণ পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলা হইতে আরকাটিদিগের কুলি ধরার ন্যায় পাত্র সংগ্রহ করিত, এক্ষণ ইহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে।

৫ যুগী :— পুরাণে ইহারা যুঙ্গী বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে বেশধারীর (খেলাস্ত যোগীর) ঔরসে এবং গঙ্গাপুত্র (মুর্দ্দাফরাস) রমণীর গর্ভে এই জাতীর উৎপত্তি। এই সকল পৌরাণিক বর্ণনা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যুগী জাতির উৎপত্তি যে রূপই হউক না কেন, চণ্ডাল এবং কৈবর্ত্তদিগকে পরিত্যাগ করিলে ত্রিপুরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা অন্যান্য জাতি হইতে অধিক। ইহাদের আচার ব্যবহার সকলই হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত কিন্তু ইহারা মৃত দেহ দাহ না করিয়া, নাম মাত্র অগ্নিসংস্কার করত কবরস্থ করিয়া ফেলে। হিন্দুর ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরহিত্য স্বীকার না করায় ইহারা আপনাদের স্বজাতি হইতে কতকগুলি লোককে পুরোহিত করিয়া লইয়াছে। সেই সকল পুরোহিতগণ "মহন্ত" বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করে। অধুনা কোন কোন মহন্ত "গোস্বামী" আখ্যা ধারণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে যুগীগণ বস্ত্র বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্তুবায় ও যুগীগণ আমাদের বহির্বাণিজ্যের প্রধান সহায় ছিল। কিন্তু বিলাতী শিল্পিগণ ইহাদের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এজন্য যুগীগণ অন্যান্য প্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছে। ত্রিপুরাবাসী কোন কোন যুগী

জমিদারি ও তালুক ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু সাধারণ যুগীগণ বস্ত্রবয়ন, বিক্রয়, বিলাতি বস্ত্রের বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

৭। কপালী:— ইহারা সাধারণত কাওয়ালী বলিয়া পরিচিত। পাট দ্বারা ছালা, চট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। কিন্তু অধুনা ইহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বিলাতী শিল্পিগণ ইহাদেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

৮। সূত্রধর:— ত্রিপুরা বাসী সূত্রধর দিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক সুনিপুণ কারু আছে। ইহারা গজদন্ত দ্বারা গোলদান, চেয়ার, দেবতার আসন প্রভৃতি নানা প্রকার বহুমূল্য বস্তু প্রস্তুত করিতে পারে।

৯। রজক দিগের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

১০। নট:— ইহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের গায়ক, বাদক ও নাট্যকার। ত্রিপুরাবাসী নটদিগের মধ্যে অনেক সুগায়ক ও কলাবৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে, এই জাতিটি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাজ লক্ষণসেনের মন্ত্রী উমাপতি ধর রাজ সভার প্রধান নটকে "জায়াজীবী" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহারা নিতান্ত ঘৃণিত ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিত।

১১। মালী:— মালীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা, ভুইমালী অর্থাৎ মাটির কার্য্য করে, দ্বিতীয়ত হাড়ি অর্থাৎ মেথর।

১২। পোঁদ:— অনার্য্য পৌণ্ড্র। ইহারা উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসী। ইহাদের নাম অনুসারে প্রাচীন কালে বরেন্দ্র ভূমি পৌণ্ড্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

১৩। চামার। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১)চামার (২)মুচি। উভয়ই চর্ম্ম ব্যবসায়ী। মুচিগণ শ্রেষ্ঠ, চামার নিকৃষ্ট।

অনাচরণীয় জাতি সমূহের পুরোহিত দিগের মধ্যে সাহা দিগের পুরোহিতগণ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থাপন্ন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ রূপে শাস্ত্রালোচনা দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে কাশীকচ্ছ নিবাসী পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি সর্ব্বপ্রধান। তিনি ভগবৎ-গীতার একটি সুন্দর সংস্করণ বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রধরদিগের পুরোহিত দগ্ধাচার্য্যের নাম তদনন্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা কলাপ অধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকে। পাইটকাড়া পরগণার অন্তর্গত চুতলা নিবাসী অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত মৃত রামজীবন (রামজী) বিদ্যাসাগর ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অন্যান্য বর্ণের

ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই মূর্খ, ইহারা যজমান দিগের রক্ত শোষণ করিয়া আত্ম উদর পরিপূর্ণ করেন।

ত্রিপুরায় জাত বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩০৪৬, তন্মধ্যে পুরুষ ১৩৩১ এবং স্ত্রী ১৭১৫। এই স্ত্রী বৈষ্ণবের অর্দ্ধাংশই বোধ হয় প্রকৃত বেশ্যা হইবে। প্রেমাবতার চৈতন্যের ধর্ম্মের ঈদৃশ বিকৃতি নিতান্তই কষ্টকর।

ত্রিপুরা জেলায় ত্রিপুরা জাতির সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ তিন সহস্র হইবে। তাহার তৃতীয়াংশ বোধ হয় খাটি ত্রিপুরা; ইহারা প্রধানত কুকির অত্যাচারে পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতল ক্ষেত্রে স্থিত বনজঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে ও লালমায়ী পর্ব্বতে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে। অবশিষ্ট ত্রিপুরাগণ জাতিচ্যুত হিন্দু। ইহারা প্রধানত ত্রিপুরা দাস ও রাজবংশী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। নুরনগরের জনৈক (কায়স্থ) দাস বংশীয় তালুকদার ঘটনা ক্রমে জাতিচ্যুত হইয়া উক্ত সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত অধিকাংশই শূদ্র ও নবশাখ শ্রেণী হইতে পতিত।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম স্ুমারিতে ত্রিপুরা বাসী ব্রাহ্মের সংখ্যা ১১১ দেখা যাইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু কুলজাত।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি দৃষ্টে কতকগুলি হিন্দুজাতির লোক সংখ্যা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

জাতির নাম	পুরুষ।	রমণী	মোট
ব্রাহ্মণ	১৬৩৮৬	১৪৫৮৪	৩০৯৭০
কায়স্থ	৩৫২০৮	৩৭৩৪৬	৭২৫৫৪*
বৈদ্য	২৩৪৩	২৩৮০	৪৭২৩*
	৪১৪৮	৪০১৪	৮১৬২*
গোপ … …	৬০৫১	৪৯৩০	১০৯৮৪
নাপিত … …	১১৫৭৬	১১১৬০	২২৭৩৬
কুম্ভকার (রুদ্রপাল)	৫২৫৩	৫০৮৫	১০৩৩৮
লতাবৈদ্য	৪৮৮১	৪৫৬৬	৯৪৪৭
তৈলপাল (কুণ্ড) …	৩৮০০	৩৬৩৮	৭৪৩৮
গন্ধবণিক … …	১৫৩০	১৪৩৭	২৯৬৭
বণিক … … …	৩২৯৭	৩০২৭	৬৩২৪
কর্ম্মকার (লোহার)	২৯০৩	২৭৬০	৫৬৬৩
মালাকার (মালী) †	২১৭৬	২১১৪	৪২৯০
চণ্ডাল (নমশূদ্র এবং চঙ্গ)	৫০১২২	৪৬০৩৮	৯৬১৬০
কৈবর্ত্ত :—			
দাস (হালুয়া) …	১২৭৫	১২৪৯	২৫২৪
দাস (জেলে)	৩০২০৩	৩০৩৪৪	৬০৫৪৭
ঝল্ল (ঝাল) …	১৩৯২	১২১৫	২৬০৭
মল্ল (মাল) …	২৪১২	২৩৫২	৪৭৬৪

* কায়স্থ, বৈদ্য এবং শূদ্রের সংখ্যা কিরূপ অবিশুদ্ধ তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

† মালাকারদিগের মধ্যে ভূইমালী প্রবিষ্ট হইয়াছে, বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে।

জাতির নাম।	পুরুষ	রমণী	মোট
সাহা (শুঁড়ি সহ)	১৮৬৫০	১৯৫৩৫	৩৮১৮৫
যুগী (মহন্ত সহ)	৩৪৮০৯	৩৪৬৩২	৬৯৪৪১
কপালী ...	৪৭৩৬	৪৬৩১	৯৩৬৭
সূত্রধর ...	৮৩৩৩	৮০৬৭	১৬৪০০
রজক	৯১১৭	৮৫১৯	১৭৬৩৬
মালী (ভূঁইমালী)	৩৭৭৯	৩৭৬১	৭৫৪০
হাড়ি (মালী)	৬৬৮	৬৭৭	১৩৪৫
চামার ও মুচি ...	৪৬৬১	৩৬৭০	৮৩৩১

এই সকল ব্যতীত অন্য কোন জাতির সংখ্যা এক সহস্রের অধিক নহে। সর্ব্বপ্রকার কৈবর্ত্তের সংখ্যা ৭০৮৪২ হইলে, তন্মধ্যে তিবর (তিয়র) চারি শতের অধিক হইবে না। বোধ হয় তিয়রগণ জেলে কৈবর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় সর্ব্বপ্রকার হিন্দুর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে) ৫৫৭০৭৯ নির্ণীত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গনণা অনুযায়ী ৫০৯০৬৬ হিন্দু। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দশ বৎসরে ৪৮০১৩ জন হিন্দু বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগে হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও কসবা থানার অন্তর্গত স্থানে শতকরা প্রায় ৪৬ জন হিন্দু অবশিষ্ট মুসলমান। সদর ও চাঁদপুর উপবিভাগে হিন্দুর সংখ্যা তদনুপাতে নিতান্ত ন্যূন। সদরের

অন্তর্গত লাকসাম থানায় মুসলমানের পঞ্চমাংশ হিন্দু। চাঁদপুরের অন্তর্গত স্থানে প্রায় তৃতীয়াংশ হিন্দু।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে ত্রিপুরা জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ১২২৪৩৩৬ নির্ণীত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গনণানুসারে এই জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ১০০৭৪২২ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দশ বৎসরে ত্রিপুরা জেলায় ২১৬৯১৪ জন মুসলমান বর্দ্ধিত হইয়াছে। আদমসুমারির কর্ত্তাগণ এই বৃদ্ধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "নওয়াখালী ঢাকা ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ হইতে অনেক মুসলমান মেঘনাদের নূতন চরে বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে।" এই বর্ণনা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারেনা। কারণ সেই সকল জেলাতেও মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস দেখা যাইতেছেনা। আমাদের বিবেচনায় বিধবা বিবাহই ইহার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে চণ্ডাল, মালী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহারাও বিধবা বিবাহের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছে। পক্ষান্তরে কৃষিজীবি-মুসলমানগণ তাহাদের কৃষিকার্য্যের সাহায্যের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া সংসার বৃদ্ধি করিতেছে। আবার হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর পুরুষগণ অর্থের অভাবে দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেছেনা। হিন্দু বাল বিধবাগণের সন্তান উৎপাদিকা

শক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিরুদ্ধ হইয়াছে। অপর পক্ষে পুত্র কন্যাবতী মুসলমান বিধবাগণ দ্বিতীয়, তৃতীয় কিম্বা চতুর্থবার স্বামী গ্রহণ করত সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং হিন্দুর হ্রাস ও মুসলমানের বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

আদমসুমারির কর্ত্তাগণ ত্রিপুরাবাসী মুসলমানদিগকে ছৈয়দ, পাঠান, সেখ, এবং অনির্দ্দিষ্ট এই ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছৈয়দ, পাঠান ও সেখের সংখ্যা বোধ হয় ৪।৫ সহস্রের অধিক হইবে না, অবশিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট। আমরা মুসলমানদিগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি যথা, উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ যে বংশ মর্য্যাদায় কেবল ত্রিপুরা জেলায়ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত এমত নহে, বাঙ্গালা ও বিহার দেশে যে স্থানে যে সকল সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ আছে, তাঁহারা সকলই ত্রিপুরাবাসী উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান দিগের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা যথা স্থানে ত্রিপুরার প্রাচীন মুসলমান জমিদার দিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল জমিদার বংশ ব্যতীত আরও কতকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশ ত্রিপুরায় বাস করিতেছেন। ব্রিটসাধিকার কালে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা আপনাদের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। ত্রিপুরার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা কায়স্থ ও বৈদ্যের সম শ্রেণীতে

দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যদিচ ত্রিপুরার তিনটি উপবিভাগেই সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান বাস করিতেছেন; কিন্তু ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের ন্যায় তথাকার সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণও ইংরেজী শিক্ষাদ্বারা সেই উপবিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে রূপ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপ-বিভাগ নিবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "পণ্ডিত সদর আমিন" পদে নিযুক্ত হইতেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগের সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত মুসলমানগণ সদর-আমিন, আলা-সদর-আমিন ও ডিপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সদর উপবিভাগের দুই একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান কদাচিত তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছেন।

মধ্যশ্রেণীঃ—সামান্য তালুকদার, ইজারাদার ও গ্রাম্য পাট-ওয়ারীদিগকে, আমরা মধ্য শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিলাম। ইঁহাদের মধ্যে সময় সময় দুই একটি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীঃ—সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবি সম্প্রদায়। ইহারা অবশ্যই, আফগানিস্থান, কিম্বা তুরস্ক দেশ হইতে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হয় নাই। নানা প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তনে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ "ইছলাম" ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ফলত ত্রিপুরাবাসী উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এই তিন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই বহুসংখ্যক হিন্দুসন্তান রহিয়াছে।

ত্রিপুরাবাসী মুসলমানগণ অধিকাংশ স্থন্নি; সিয়া সম্প্রদায় নিতান্ত বিরল। ফেরাজি সম্প্রদায় ত্রিপুরায় বিশেষ প্রবল। "ওহেবি" সম্প্রদায় নিতান্ত অল্প। ত্রিপুরার মুসলমানগণ হিন্দু-বিদ্বেষ্টা নহেন। প্রাচীন মুসলমান জমিদারগণ অকাতরে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্মরাণ প্রভৃতি দান করিয়া গিয়াছেন। আর নবীন (ক্রেতা) জমিদার(হিন্দু)গণ সেই সকল বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ফাঁক তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। ত্রিপুরায় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ যে কেবল হিন্দুদিগকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন, এমত নহে; অনেক মুসলমানকেও তাঁহারা শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অনেক মুসলমান কালীর মন্দিরে পাঠা বলি প্রদান করিয়া থাকে। মেহার কালীবাড়ীর মেলা উপলক্ষে যাঁহারা তথায় গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শক্তি উপাসক জমিদার মির্জা হুসনআলীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সরাইলের মুসলমান জমিদার দেওয়ান সাহেবগণ বৃষ্টির জন্য প্রতি বৎসর কালীকচ্ছের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞ করাইতেন। প্রাচীন মুসলমান জমিদারগণ সকলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের টোলের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ভূমি ও বৃত্তি দান করিতেন। ফলত

ত্রিপুরার ন্যায় হিন্দু মুসলমানে এরূপ ভ্রাতৃভাব অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

জেলা ত্রিপুরা—(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)।

কৃষি:—ব্রিটিসাধিকারের প্রারম্ভে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাকে "নিবিড় অরণ্য পূর্ণ ও বিরল মনুষ্য বসতি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন,—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বন্য মহিষ ও বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ যে সমতল ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বিচরণ করিত,—অধুনা সেই ত্রিপুরা শ্যামলশস্যশালী একটি সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তন্মধ্যে ধান্য, পাট ও গুবাক প্রধান।

ধান্য:—ত্রিপুরায় নানা প্রকার ও উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৪০ লক্ষ মণ তণ্ডুল অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

ত্রিপুরায় উৎপন্ন ধান্যকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; ১—আউশ, ২—শালী, ৩—বর্ষাল, ৪—বরো। আউশ,—উপযুক্ত সময়ে বপন করিতে পারিলে ৬০ দিবস মধ্যে

এই ধান্য উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে "ষাইট্টা" বলে। প্রকৃত পক্ষে চৈত্র মাসের শেষ ভাগে আউশ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ইহা সুপক্ক হইয়া থাকে। আউশের মধ্যে কাঁচালনী চুইচাশাইল ও বোয়ালধারা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। শালী—প্রথমত উচ্চ ক্ষেত্রে এই ধান্যের বীজ বপন করিয়া তৎপর তাহা উঠাইয়া লইয়া শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এই ধান্য সুপক্ক হইয়া থাকে। শালীধান্যের মধ্যে চাপলাইস, খইয়াপাক্রী, গোবিন্দ-ভোগ, কালজিরা, কুটিচিকন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। বর্ষাল—ফাল্গুণ চৈত্র মাসে নিম্ন ভূমিতে এই ধান্য বপন করিতে হয়। বর্ষার জল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইলে এই ধান্য নষ্ট হয় না। ২০। ২৫ হস্ত নিম্ন হইতে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক জলের উপর ভাসিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ অতিরিক্ত পরিমাণ জলপ্লাবন হইলে ধানের গাছগুলি মরিয়া যায়। অগ্রহায়ণ মাসে এই ধান্য সুপক্ক হইয়া থাকে। সরাইল ও নুরনগরের বিল সমূহে এই ধান্য প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আউশ কিম্বা শালিধান্য এক বিঘা ভূমিতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, বর্ষাল ধান্য প্রায় তাহার দ্বিগুণ হইয়া থাকে। বর্ষাল ধান্যের মধ্যে, আমন, পরচুন, ভইসাথীর, কালামাণিক, দিঘা প্রভৃতি সুপরিচিত। বরো—পৌষ মাঘ মাসে বিল ও নদীর চরে এই ধান্য বপন করা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহা সুপক্ক হইয়া থাকে। কিন্তু

শিলাবৃষ্টি এই ধান্যের বিষম শত্রু। বরো ধান্যের তণ্ডুল কেবল মাত্র নিম্নশ্রেণীর মানবদিগের খাদ্যোপযোগী।

বার্ষিক জলপ্লাবনই ত্রিপুরাকে শস্যশালিনী করিয়াছে, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় জলপ্লাবন হইলে ত্রিপুরার সমস্ত শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে দুইবার এরূপ সর্ব্বসংহারক ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছে। ১২৬০ এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দের বর্ষা আমরা ভুলিতে পারিব না।

২৫। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার কৃষকগণ শস্যক্ষেত্রে সার দেওয়া নিস্প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিত। কিন্তু অল্প কাল মধ্য কোন কোন স্থানের উর্ব্বরতা শক্তি এরূপ হ্রাস হইয়াছে যে, গোময়, ছাই, পুষ্করিণী ও খাল সমূহের পলিমাটি না দিলে উপযুক্তরূপ শস্য জন্মে না।

পাটঃ—ইহা নালিতা গুল্মের ত্বক্। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দর্শন করিয়াছি যে, ত্রিপুরাবাসী কৃষকগণ কেবল নিজ প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অল্প পরিমাণ নালিতার চাষ করিত। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নালিতার চাষে ধান্যের উৎকৃষ্ট ভূমি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রতি বৎসর দুই লক্ষ মণেরও অধিক পাট ত্রিপুরা হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। নালিতার চাষ দ্বারা এ দেশের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, ইহা নির্ব্বোধ কৃষক গণ বুঝিতে পারিতেছে না। প্রথমত দুফসলী জমিতে নালিতার চাষ হইয়া থাকে; সুতরাং

একটি ফসলের জন্য দুইটি ফসল নষ্ট করা হয়। দ্বিতীয়ত নালিতা ক্ষেত্রে যে রূপ সার দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাতে যেরূপ অধিক পরিমাণ পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়, সেই রূপ সার প্রদান করত সেই পরিমাণ পরিশ্রম ও যত্ন করিলে যে কোন ক্ষেত্রে সেই মূল্যের ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। তৃতীয়ত নালিতা দ্বারা নানা প্রকার রোগ ত্রিপুরায় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যখন বর্ষার জলে দেশ প্লাবিত হয়, তখন নালিতা গুল্ম ছেদন করত স্রোত বিহীন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ২০।২৫ দিন পরে যখন সে গুলি পচিয়া তাহার ত্বক্ (পাট) গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তখন জল দূষিত ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া পড়ে। অল্প সংখ্যক বাঁধা পুষ্করিণী ব্যতীত সমস্ত খাল, বিল, নদী ও পুষ্করিণীর জল তদ্দ্বারা দূষিত হইয়া পড়ে। সেই জল পান করিয়া রোগের যন্ত্রণায় ত্রিপুরাবাসী ছট ফট করিতে থাকে। তদ্দ্বারা কত লোক অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। বাঙ্গালা দেশ মধ্যে জেলা ত্রিপুরা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। কিন্তু নালিতার চাষ দ্বারা সেই স্বাস্থ্যের নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত হইতেছে।

প্রধানত চৈত্র, বৈশাখ মাসে নালিতার বীজ বপন করা হয়। তৎপর চারা উঠিলে বারংবার তাহা বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ভালরূপ বাছিয়া দিলে ও উপ

বৃক্ত রূপ বৃষ্টির জল পাইলে নালিতা গুল্ম গুলি ৮। ১০ হস্ত উচ্চ হইয়া থাকে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সেই সকল গুল্মগুলি কাটিয়া জলে ভিজাইতে হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে তাহা হইতে পাট গ্রহণ করিয়া, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে সেই পাট বিক্রয় করত একবারে কতকগুলি টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই কৃষক গণ বিশেষ সুবিধাজনক বিবেচনা করে।

ত্রিপুরা জেলার মধ্যে নালিতার চাষে বলদাখাল পরগণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তদনন্তর সরাইল ও নুরনগরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের তীরবর্ত্তী অন্যান্য পরগণায়ও নালিতার চাষ হইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অতি অল্প পরিমাণ নালিতার চাষ হইয়া থাকে।

গুবাক ঃ—ধান্য ও পাটের পরেই গুবাকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উপবিভাগে সুপারি বৃক্ষ নিতান্ত বিরল। সদর উপবিভাগের অন্তর্গত কোন কোন স্থানে সুপারি বাগান দৃষ্ট হইয়া থাকে। চাঁদপুর উপবিভাগ সুপারি বৃক্ষে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে, বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। এক বিঘা ভূমিতে এক সহস্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই এক সহস্র বৃক্ষের গুবাক বিক্রয় করিয়া বৎসর ২৫০ হইতে ৪ কিম্বা ৫ শত টাকা লাভ হইতে পারে। সম্প্রতি সুপারি বৃক্ষের যে রূপ মড়ক উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দারা অনেক কৃষক ও ভূম্যধিকারীকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রায়

৪০ বৎসর পূর্ব্বে আরও একবার এবম্প্রকার সুপারিমড়ক উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে অনেকগুলি জমিদারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা নিতান্ত অল্প মূল্যে ক্রয় করেন।

তদ্ব্যতীত আরও নানাপ্রকার শস্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের জলপ্লাবনে সমস্ত ধান্য বিনষ্ট হইলে চীনা ও কাওন নামক শস্য বপন করিয়া দরিদ্র কৃষকগণ প্রায় দুই তিন মাস ইহা ভক্ষণে জীবন যাপন করিয়াছিল। অল্প পরিমাণ গম, যব, ভুট্টা ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ত্রিপুরায় খেসারি, মুগ, মসুরি, মটর, বুট, কলাই ও অরহর প্রভৃতি দাইল জন্মে। ত্রিপুরার অরহর অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণ অরহরের চাষ করিয়া তাহা বিদেশে প্রেরণ করত ত্রিপুরার কৃষকগণ বিশেষ রূপ অর্থ লাভ করিতে পারে। কারণ এরূপ উৎকৃষ্ট অরহর অন্য কোন জেলায় জন্মে না।

নানা প্রকার তিল, সর্ষপ প্রভৃতি তৈলাক্ত শস্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফল :—ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণ আম্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই পোকায় অখাদ্য করিয়া ফেলে। অল্প পরিমাণ উৎকৃষ্ট কমলালেবু ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়, কিন্তু

তাহার ব্যবসায় চলিতে পারে না। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার সুগন্ধি ও সুখাদ্য লেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়। প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট কাঠাল এই জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীন পরিব্রাজক হিয়ান্ সাঙ অদ্য জীবিত থাকিলে কামরূপবাসীর ন্যায় তিনি ত্রিপুরাবাসীকে "কাঠাল ও নারিকেল" ভুক্ মনুষ্য বলিয়া বর্ণনা করিতেন। তদ্ব্যতীত আরও নানা প্রকার ফল ত্রিপুরায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নীলের চাষ :—জিঃ পি ওয়াইজ সাহেব মেঘনাদের তীরবর্ত্তী শ্রীমদ্দি, দুলালপুর, ব্রাহ্মণচর, মাছিমপুর, ভাঙ্গারচর এবং আকানগর নামক স্থানে কুঠি সংস্থাপন করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। ক্রমে নীলকুঠির আয় ও অত্যাচার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা ভীষণ ভাব ধারণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী জমিদার ও কৃষকগণ দলবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইল। * তাহাদের দৃঢ় একতার বলে অত্যাচারী নীলকর পরাজিত হইল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় নীলকরের পূর্ণ-উন্নতি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাহার বিনাশ সাধিত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ত্রিপুরায় নীলের চাষ বন্ধ হইয়া

* ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ উভয় পক্ষের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু নীলকর প্রপীড়িত কৃষকগণের হৃদয় বিদারক-করুণ সঙ্গীত স্মরণ করিলে অদ্যাপি পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

গিয়াছে। নীলকরের অত্যাচার কালে ত্রিপুরাবাসিগণ যে রূপ একতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছে, বাঙ্গালার অন্য কোন জেলার লোক তাহা দেখাইতে পারে নাই। * নীলকরের দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ও তাহাদের বিনাশ সাধন জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ওয়াইজ সাহেবের জমিদারির প্রজাগণ ও তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

শিল্পঃ—বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডি. ফো বলিয়াছিলেন, "ভারতের শিল্পিগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল"। এক্ষণ আমরাও বলিতে পারি যে, ইংরেজ শিল্পিগণ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কার্পাস বস্ত্র বয়ন ত্রিপুরার প্রধান শিল্প কার্য্য ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বিদ্যালোচনায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগবাসিগণ ত্রিপুরার শীর্ষ স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তদ্রূপ শিল্প কার্য্যের জন্যও তাহারাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সরাইলের তন্তুবায়গণ কার্পাস সূত্রদ্বারা উৎকৃষ্ট তঞ্জেব, ধুতি, চাদর ও সাড়ি প্রস্তুত করিত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যাহা দর্শন করিয়াছি এক্ষণ তাহাও লোপ পাইতেছে। প্রাচীন "ঢাকাই মজলিন"

* The opposition to the industry on the part both of the neighbouring *Zamindars* and of the planters' tenants was so desperate, that none of the factories could hold out against it.

Statistical Account of Bengal Vol. VI. p. 425

জগতে অতুলনীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই মস্‌লীনেরই স্থানীয় নাম তঞ্জেব। যে তঞ্জেবের পোষাক পরিধান করত আওরংজেব বাদসাহের এক কন্যা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাকে "উলঙ্গ" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, সেই তঞ্জেব প্রচুর পরিমাণে সরাইলে প্রস্তুত হইত;* কিন্তু তাহা ঢাকাই তঞ্জেবের সহিত বিদেশে প্রেরিত হইত বলিয়া বিদেশবাসিগণ সরাইলের নাম জ্ঞাত ছিলেন না।† সরাইলের তন্তুবায়গণের প্রস্তুতি ২০।২৫৲ টাকা মূল্যের ধুতির জোড়া আমরা দর্শন করিয়াছি। পাইরের সূক্ষ্ম কার্য্যের জন্য এই সকল বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইত না,

---

* In the north of the District, in the Fiscal Division of Sarail, a very fine description of *Muslin* is made, called *tanjib*, which is said to be nearly as good in texture and quality as the *shabnam* muslins of Dacca. The thread is spun by hand, and the muslin is not usually made by the weavers unless they have a special order.

Statistical Account of Bengal Vol. VI. p. 418.

† সরাইলের পনির "ঢাকাই" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু ঢাকা জেলায় বোধ হয় এক তোলা পনিরও কদাকস্মিন্ কালে প্রস্তুত হয় নাই। সাউদারলেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেনঃ—Some of our readers my not perhaps know that the so-called Dacca Cheeses, are really all made at Sorail. When made to particular order they are very good

Calcutta Review. Vol. XXXV. p. 326.

কারণ সরাইলের তন্তুবায়গণ পাইরের কার্য্যকে অতি তুচ্ছ বিবেচনা করিত। সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা তাহারা অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিত।

ত্রিপুরার যুগীগণ নানা প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিত। বিলাতী শিল্পিগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বাপ্তা বস্ত্রের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বলদাখাল পরগণার অন্তর্গত বাঁসকাইট নামক স্থানে মধ্যবিধ গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় সাড়ী ও ধুতি প্রস্তুত হইত। এক্ষণ তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে। তন্তুবায় ও যুগীগণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যে ময়নামতী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী যুগীগণ এক প্রকার ছিট বস্ত্র বয়ন করিয়া অল্প হইলেও কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ছিটদ্বারা পিরণ, সার্ট, কোঠ ও পেণ্টুলন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। লেপ, তুষক, বালীস ও পর্দা প্রস্তুত উপ-যোগী নানা প্রকার ছিট তাহারা প্রস্তুত করিতেছে। এই ছিটের মধ্যে কতকগুলি বিলাতী "এঙ্গোলার" ন্যায় পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিপুরাবাসী সূত্রধরগণ যে শিল্পকার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ গজদন্তের কারুকার্য্যের দ্বারা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে গজদন্ত দ্বারা নানা প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হইত, দেশীয় মহিলাগণ স্বর্ণ

রৌপ্যের পরিবর্ত্তে সেই সকল অলঙ্কার পরিধান করিতেন। ইংরেজ ভ্রমণকারী রলক্ কিছু সেই সকল অলঙ্কার দর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রস্তরের শিল্পকার্য্য ত্রিপুরায় লুপ্ত হইয়াছে। লোহার শিল্পকার্য্যের নিতান্ত অবনতি হইয়াছে। সরাইল পরগনায় পূর্ব্বকালে নানা প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। বিলাতী কাগজের আমদানী দ্বারা দেশীয় "কাগজি" গণ কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সরাইল পরগনার অন্তর্গত হর্ষপুর নিবাসী কুম্ভকারগণ মাটীর কার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেশীয় সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যের ক্রমেই বিনাশ সাধিত হইতেছে।* বিলাতী শিল্পিগণ দেশীয় শিল্পীদিগের ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিলাতী শিল্পীদিগকে জয় করিতে না পারিলে এদেশের মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত।

বাণিজ্য:— বিবার্লি সাহেব বলিয়াছেন:— "পৃথিবীর

* All the old indigenous *industries* of this provinces are decaying. Such as the *muslins* and other of the finest cotton fabrics the coarser cotton cloths, the brass wars, the wicker work, and others. • •

Bengal Administration Report. 1874-75.

ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে, আদত দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা বিলাতের কারখানায় প্রেরণ করাই ভারতের একমাত্র বৈধকার্য্য হইয়াছে।"

এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ সত্য। যে দেশের শিল্প কার্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে, সে দেশের বাণিজ্যের আশা দুরাশা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উন্নতির সময়ে এদেশের বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ বাণিজ্যের শিরে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা "বণিক্-বৃত্তি ও "সমুদ্রযাত্রা"কে পাপময় ঘৃণিতকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যায় শাসনে হিন্দুগণ বিলাতী শিল্পী ও বণিকদিগের "নগদা মুটে" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলাবাসীর খাটি বাণিজ্য এই দেখা যাইতেছে যে তাহারা কতকগুলি তণ্ডুল ও পাট বিদেশী বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর হেঙ্কি সাহেব লিখিয়াছেন, "চট্টগ্রাম হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মণ তণ্ডুল সমুদ্রপথে বিদেশে প্রেরিত হয়, তৎসমস্তই ত্রিপুরা ও নওয়াখালী হইতে আইসে।" ত্রিপুরা ও নওয়াখালীর কৃষকগণ চট্টগ্রামে তণ্ডুল প্রেরণ না করিলে তাহার বহির্বাণিজ্য এককালে বন্ধ হইয়া যাইবে। উত্তর ও মধ্য ত্রিপুরা হইতে অধিক পরিমাণ তণ্ডুল নারায়ণগঞ্জে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরার সমস্ত পাট নারায়ণগঞ্জের দেশী ও বিলাতি আড়তদারগণ ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

অন্যান্য বস্তু অল্প পরিমাণ অন্যান্য জেলায় প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা হইতে মাছরাঙ্গা পক্ষীর পালক চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়, তথা হইতে এসকল দ্রব্য সমুদ্রপথে ব্রহ্মা ও চীন-দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরা হইতে শুক্না মৎস্য চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রেরিত হয়। ত্রিপুরা হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ সুপারি অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। তিন লক্ষের অধিক নারিকেল এই জেলা হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

অন্যান্য স্থান হইতে ত্রিপুরায় যেসকল দ্রব্য আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই প্রায় বিলাতি। তন্মধ্যে কার্পাসবস্ত্র, লবণ ও কেরোসীন তৈল প্রধান। কার্পাসবস্ত্র দ্বারা বিলাতি বণিকগণ ত্রিপুরা জেলা হইতে প্রায় ৩। ৪ লক্ষ টাকা বার্ষিক আদায় করিয়া লইতেছেন।

আচার ব্যবহার ঃ—ত্রিপুরাবাসী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বল্লাল ও দেবীবর ত্রিপুরাবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। এজন্যই কৌলিন্যের বিষময়-ফলে তাঁহারা জর্জ্জরিত হয়েন নাই, ১০। ১৫ কিম্বা ২০। ৫০টি বিবাহ করিয়াছেন এরূপ লোক কদা কস্মিন্‌কালে ত্রিপুরায়

জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিম্বা একটি বালক বরের সহিত অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধার বিবাহ এ জেলায় হয় নাই। যাহারা অর্থলোভে বৃদ্ধ বরে বালিকা কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সামাজিক বন্ধনের বীভৎস অভিনয় ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কখনও অভিনীত হয় নাই। কায়স্থ জাতির "আদিরস" ত্রিপুরায় অপরিজ্ঞাত। এই সকল জঘন্য সামাজিক অত্যাচার হইতে ত্রিপুরা চিরকাল মুক্ত রহিয়াছে। আরও সুখের বিষয় যে, ত্রিপুরায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ "সম্মতি বিধির" জন্য ভয়ে ম্রিয়মাণ নহেন; অর্থলোভী কন্যাবিক্রেতা ব্যতীত প্রায় কেহই দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যা দান করেন না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শিশুবিবাহ বন্ধ হইয়া যাইতেছে।* কেবল নিম্ন শ্রেণীতে বাল্যবিবাহের প্রতি কিঞ্চিৎ আগ্রহ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহারাও ১০। ১১ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ করেনা। তাহাদের মধ্যে ১৩। ১৪ বৎসরের অবিবাহিতা বালিকা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে।

চণ্ডাল, মালী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু বিধবা বিবাহকারী ব্যক্তি ও তাহার সন্তানগণ সমাজে কিঞ্চিৎ হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

* বিগত দশ বৎসর যাবৎ সমাজের গতি আমরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই কাল মধ্যে আমাদের

পঞ্চম অধ্যায়।

জেলা ত্রিপুরা—(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)।

ত্রিপুরা জেলা অধুনা তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত, যথা—সদর (কুমিল্লা), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এবং চাঁদপুর। সম্ভবত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চাঁদপুর উপবিভাগ গঠিত হইয়াছে।

সদর মহকুমা ৬টি থানায় বিভক্ত, যথা—কতোয়ালী, চাঁদিনা মুরাদনগর, দাউদকান্দি, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম। সদর মহকুমার লোক সংখ্যা ৮২১২৮৫ জন নির্ণীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা তিনটি থানা ও দুইটি ফাঁড়িতে (আউটপোষ্টে) বিভক্ত, যথা—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ও ফাঁড়ি নাছিরনগর; কসবা, এবং নবিনগর, ও ফাঁড়ি বাঞ্ছারামপুর। এই মহকুমার লোক সংখ্যা ৫৯০০৯৭ জন নির্ণীত হইয়াছে।

পরিচিত যে সকল বালক বালিকার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা বোধ হয় দুই শতের ন্যূন হইবে না। তন্মধ্যে দুইটি বালিকা বিবাহ কালে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা ছিলেন। ১৩। ১৪ বৎসরের বালিকার সংখ্যা অধিক, ১৫। ১৬ বৎসরের বালিকা বোধ হয় মোট সংখ্যার চতুর্থাংশ হইবে। ১৭। ১৮ বৎসরের বালিকার সংখ্যা ৩।৪টি মাত্র হইতে পারে।

চাঁদপুর মহকুমা তিনটি থানায় বিভক্ত, যথা—চাঁদপুর মতলব, এবং হাজিগঞ্জ। এই মহকুমার লোক সংখ্যা ৩৭১৫৭৩ নির্ণীত হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলা নিম্নলিখিত পরগণা ও মহলে বিভক্ত, কতকগুলি পরগণার ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অংশ নওয়াখালী, ঢাকা, ও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কতকগুলি পরগণা সম্পূর্ণরূপে এই জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্য জেলাভুক্ত হইয়াছে। কোন পরগণা বা তাহার ভগ্নাংশের রাজস্ব অন্য জেলার ধনাগারে অর্পিত হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার সম্বন্ধে তাহা এই জেলার অধীন, যথা—কাদবা রুস্তমপুর প্রভৃতি। শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরা হইতে গৃহীত। মুসলমানগণ দ্বারা ইহার সূত্রপাত হয়। অল্প কাল গত হইল ইংরেজ কর্তৃপক্ষগণ মতলা পরগণাটি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

পরগণা বা মহালের নাম।	ভূমির পরিমাণ।		মহালের সংখ্যা।	রাজস্ব।
	একর	বর্গ মাইল।		
১ অমরাপুর	১০৩	০·১৬	১	৩
২ আমিরাবাদ	৭৩১৪	১১·৫৩	২১	৫৮১৮
৩ বৈকুণ্ঠপুর	১১৯৮	১·৮৭	১	৩১৩
৪ বলদাখাল	২৩১০৯৩	৩৬৪·১৮	২৯৫	২৩৬৯২৪

পরগণা বা মহালের নাম।	ভূমির পরিমাণ।		মহালের সংখ্যা।	রাজস্ব।
	একর।	বর্গ মাইল।		
৫ বরিকান্দা	১৪১৮৯	২২.১০	১১	৭১৪৭
৬ বিক্রমপুর	৬৭০	১.০৫	১	১৯৫
৭ চরপাতা	১৫০৬	২.৩৫	৬	৩১৭৩
৮ চৌদ্দগাঁও	১৬২৭৭	২৫.৪৩	৬	৫৬৫৮
৯ দক্ষিণসাহাপুর	৩৭১৬	৫.৮০	৩	৫৬৯
১০ দাউদপুর	১১৫৫৫	১৮.০৫	৪৩	৩১১৯
১১ দৌলতপুরতপা	৩২৯	০.৫১	২	৯৩
১২ ডুল্লাই	৪৫০৩৬	৭০.৩৭	১৮	৪০১৪০
১৩ দুর্গাপুর, দাউদকান্দী	৩৭৫৭	৫.৮৭	৬	২৯৩৭
১৪ দুর্গাপুর তপা	২৮১৫	৩.৪১	৫	৩২১৯
১৫ একতাদপুর, কাশিমপুর, মাছুয়াখাল	৯২০৩	১৪.৩৮	৮	৪৩৫৩
১৬ করকাবাদ	২০৭৬২	৩২.৪৪	১২৭	১৭৯০৩
১৭ গঙ্গামণ্ডল	৭৮৫৭৬	১২২.৭৭	১৩	৫৭৭০৬
১৮ গোবিন্দপুর	৪২০০	৬.৫৬	১২	৪৪১
১৯ গোপালনগর	৫১৪৭	৮.০৪	৩	২১৩৪
২০ গোপালনগর তপা	১০৬	০.১৬	২	৩৯
২১ গুণানন্দী	১৭৯৯২	২৮.১১	১৭২	১১৯৪৯
২২ হরিপুর বেজুরা	২০১১	৩.১৪	৪০	৪০৪

পরগণা বা মহালের নাম।	ভূমির পরিমাণ।		মহালের সংখ্যা।	রাজস্ব।
	একর।	বর্গ মাইল।		
২৩ হোমনাবাদ	১৪৬৩৯১	২২৮·৭৭	৭২	১০৬৬৭০
২৪ ইব্রাহিমপুর	২৩৪	০·৩৭	৩	৭৯
২৫ ইব্রাহিমপুর তপা	৭৬৬৮	১১·৯৮	৭	২৭৭৭
২৬ জাফরাবাদ বা লৌহগড়	৭৬৭৩	১১·৯৯	২	১৪৭
২৭ জাফরউদ্দল	৫২২	০·৬৬	১	১৯৮
২৮ জোয়ারভাটেরা	১৮৮১	২·৯৪	১	৭২৫
২৯ জোয়ার বামদেবপুর	৮৮১	১·৩৮	১	২৯৮
৩০ কামরাপুর তপা	১৬০৭	২·৫১	৫	১৭৫
৩১ নরদী	২৭৪৩	৪·২৯	১২	৩০১১
৩২ কাশীপুর	৪৬১৯	৭·২৩	১৭	১৮৭৮
৩৩ খিজিরপুর	২৯২	০·৪৬	১	৪৯২
৩৪ লক্ষ্মণপুর	৭১৬৫	১১·২০	২	৪৯১৮
৩৫ লালপুর	৪১০৯	৬·৪২	৩	১৫১৫
৩৬ জোয়ার খাজুরিয়া	৫০৮	০·৭৯	১	১৬৭
৩৭ মহীচাল	১৬৬৬৭	২৬·০৪	৭১	৯৬২৪
৩৮ মইজন্দী	১০২৬৭	১৬·০৪	৪৮	৯৮১৭
৩৯ মেহার	৩৭৬৮৮	৫৮·৮৯	৩০	৩১১২০
৪০ নছরৎপুর	৬৪১৬০	১০০·২৫	২২৫	৩৭৪৬১
৪১ মহম্মদপুর	—	—	—	—

৪২ নারায়ণপুর	৮৫৩১	১১·৩৩	১৩	৪৩৮৭
৪৩ নরসিংহপুর	১·৮৪	২·৭৯	৬	১৬৩৯
৪৪ নয়াবাদ	২৪.৬৯	৩৭·৭৫	৩৫	৪৮২৯
৪৫ নুরুল্লাপুর	৪৬৯:	৭·৩৩	৪	২৩১৭
৪৬ পাইটকাড়া	৫৬৩০৪	৮৭·৯৭	২	৬৫২২৭
৪৭ পুবচণ্ডী	৭৬১১	১১·৮৯	১০৩	৫৮৯৮
৪৮ রায়পুর	২৭৬	০·৪৩	২	১৫
৪৯ রাজনগর	১১৩৬৪	১৭·৭৬	১৫	৪৩৯৬
৫০ রামপুর	৬১৪	০·৯৬	১	২১৪
৫১ রামপুর নয়াবাদ	১৭৯২	২·৭০	৩	৮৬৪
৫২ রণভাওয়াল তপা	৬৮৬৭	১০·৭৩	১২	৩১২০
৫৩ রসুলপুর	১২৫০	১·৯৫	৪	৫২৭
৫৪ সরুদী	১২০৪৭	১৮·৮২	৪৭	১০৮৩৫
৫৫ সহরখণ্ডল	৩৪০৬	৫·৩২	৪৮	২৩৪৮
৫৬ সিঙ্গাইর	২৬৩৫২	৪১·১৭	৪	২৬৪২
৫৭ সিংহেরগাও	২২৫৬৬	৩৫·২৬	১৭৯	২০২৮২
৫৮ সরাইল	১৯৯১৯১	৩১১·২৪	৩৩	৩৮০২৩
৫৯ শ্রীচাইল	৬১৪৯	৯·৬০	৪৫	৩২২২
৬০ শ্যামপুর	১৭০৩	২·৬৬	৪	২৪৮৯
৬১ তৌরা	৭৮০৮৮	১২২·০১	১৩৭	৩১৫২৮
৬২ উত্তরসাহাপুর	৩০৫৬	৪·৭৭	৬	১৬৭০
৬৩ জোয়ানসাহী	২৪৪৩	৩·৮২	—	—
৬৪ চাকলে রোসনাবাদ	৩৭৭১০০	৫৮৯	১	১৫৩৬১৪

গবর্ণমেণ্টের খাসমহাল ব্যতীত জেলা ত্রিপুরার ভূমিকে শ্রেষ্ঠ, মধ্য, অধীন এই তিন স্বত্বে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার এক একটি স্বত্ব অনেকগুলি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ স্বত্ব ঃ—

ক—শাখা,—খেরাজ বা সকর ভূমি।

১। জমিদারি। জমিদারের অধিকৃত ভূমি জমিদারি আখ্যায় আখ্যাত হয়। জমি=ভূমি, এবং দার=অধিকারী, এই দুইটি শব্দ হইতে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। স্থানভেদে এবং অবস্থা ভেদে ইহার নানারূপ অর্থ প্রযোজ্য হইয়াছে। কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে জিম্বাদার শব্দ হইতে জমিদার শব্দের উৎপত্তি। আমাদের বিবেচনায় মুসলমানগণ প্রাচীন সামন্ত নরপতিগণকেই জমিদার আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত ভৌমিকগণ আধুনিক ভারতবর্ষীয় সামন্ত নরপতিগণ হইতে দুর্ব্বল কিম্বা ক্ষমতাহীন ছিলেন না। মোগল শাসনকর্ত্তাগণ সেই পরাক্রমশালী ভৌমিকদিগকে জমিদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন "বিষয়পতি" শব্দটি সম্পূর্ণরূপে জমিদার শব্দের অনুরূপ। লর্ড কর্ণওয়ালিস কৃত দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা স্ব স্ব অধিকৃত একটি পরগণা বা বৃহৎ মহালের রাজস্ব যাঁহারা রাজকীয় ধনাগারে

অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন তাহারাই স্থায়ীরূপে জমিদার পদ বাচ্য হইয়াছিলেন। * ক্রমে সেই সমগ্র জমিদারি কিম্বা তাহার অংশ ক্রেতাগণ ও সেই পদবি লাভ করিতেছেন। মোগল শাসনকালে জমিদারদিগের পদ নিতান্ত অস্থায়ী ছিল, শাসনকর্ত্তাগণ সামান্য কারণে একের জমিদারি অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

২। তালুক। তালুকদারের অধিকৃত মহাল। এই তালুকদার শব্দ আরবি ভাষা হইতে উৎপন্ন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তালুকদার শ্রেষ্ঠ ও জমিদার তাঁহাদের অধীন মধ্য-স্বত্বের অধিকারী। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে জমিদারের অধীন মধ্যস্বত্বের অধিকারীগণ তালুকদার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে অল্প সংখ্যক স্বাধীন তালুক ছিল, অধিকাংশ তালুকদার জমিদারদিগকে তাঁহাদের দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তালুকদারদিগকে স্বাধীন

---

* ১৭৮৯ খৃঃ ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ খৃঃ ১৫ নবেম্বর, এবং ১৭৯০ খৃঃ ১০ ফেব্রুয়ারি যে সকল বিধি প্রচারিত হয়, তদ্বারা একরূপ ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ঐ সকল বিধি দ্বারা ১০ বৎসরের জন্য যে জমা ধার্য্য হইয়াছে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহাই চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইবে। তদনন্তর কোর্ট অব ডাইরেক্টরের মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া ১৭৯৩ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ (১২০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুণ মাসে) লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা প্রচার করেন।

ভূম্যধিকারীর শ্রেণীতে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।* লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারীর মন্তব্য লিপি (মিনিট) প্রচারিত হইলে, ত্রিপুরার জমিদারগণ নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন কোন জমিদার তালুকদারদিগের প্রতি অতিরিক্ত খাজানা ধার্য করিয়া তাঁহাদের জমিদারির রাজস্ব হ্রাস করিবার চেষ্টা করেন।† আর ত্রিপুরার মহারাজ তাঁহার অধীন তালুকদারদিগকে স্বীয় কুক্ষি মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের অন্যায় আচরণে ত্রিপুরা জেলার অতি অল্প সংখ্যক তালুক খারিজ হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খারিজা বা স্বাধীন তালুকের সংখ্যা ১৩৫৬ নির্ণীত হয়। বোধ হয় ইহার চতুর্থাংশও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সৃষ্ট হয় নাই।

---

* লর্ড কর্ণওয়ালিস বলেন, "জমিদারের দেয় রাজকর স্থির রূপে নির্ণীত হইল, এক্ষণ তাঁহারা তালুকদারের খাজানা বৃদ্ধির জন্য কোন রূপ আপত্য করিতে পারেন না। কারণ ভূমিতে তাঁহাদের যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, তালুকদারেরও তদ্রূপ স্বত্ব ও অধিকার রহিয়াছে। রাজকর পরিশোধ সম্বন্ধে তাঁহারা মারফতদার মাত্র। (*Lord Cornwallis minute. 3d. Feb. 1790.*)

† *Hunter's Bengal MS. Records, Vol I*

আর এক শ্রেণীর স্বাধীন তালুক আছে, একশত বিঘার ঊর্দ্ধ নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সকল তালুক সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞাপনীতে এই শ্রেণীর তালুকের সংখ্যা ১৯১টী প্রদত্ত হইয়াছে। পশ্চাৎ নূতন পয়স্তী-ভূমি স্থায়ীজমায় বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১০৩টি মহাল সৃষ্ট করিয়াছেন।

খ—শাখা—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

লা—না, খেরাজ—কর; =না-কর, অর্থাৎ যাহার কর নাই, তাহা লাখেরাজ বা নিষ্কর। ইহার অধিকার ও স্বত্ব জমিদারি হইতেও শ্রেষ্ঠ। * ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রিটীসাধিকারের পূর্ব্বে এই প্রদেশের আধিপত্য লইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নরপতিগণ মধ্যে অবিশ্রান্ত কলহ চলিত। সুতরাং কোন্ জাতীয় নরপতি দ্বারা কোন্ সময়ে জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিষ্কর সমূহ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়াছে। তাহার কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

১১৪১ শকাব্দের (বা নরবঙ্কমল্ল নরপতির ১৭ অব্দের) যে তাম্রশাসনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। † উক্ত শাসনপত্র দ্বারা ইজখণ্ড (বোধ হয় মহীচাল

* *Field's Landholding. &c. p. 517.*

† কোলব্রুক সাহেব এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার পূর্ব্বক

পরগণার অন্তর্গত মাইজখাড়) গ্রামের ২০ দ্রোণ ভূমি (জনৈক ব্রাহ্মণকে) দান করা হয়। যদি সেই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষগণের অধিকারে সেই ভূমি কিম্বা তাহার কিয়দংশ থাকে, তবে তাঁহারা আপনাদের স্বত্বনির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবেন।

প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রায় সকলেই তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছেন। অথচ অতি অল্প সংখ্যক তাম্রশাসন অধুনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণও নানাপ্রকার নিষ্কর প্রদান করিয়াছেন। তাহার সনন্দ কোন কোন স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দস্যু সমসরগাজির নিষ্কর দানের কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণও নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেবের প্রদত্ত নিষ্করের একখণ্ড সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে স্থানীয় জমিদারগণ অনেক প্রকার নিষ্কর দান করিয়াছেন।

স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করেন। *Asiatic Researches. Vol. IX. and Colebrooke's Essays. Vol. II. p. 242.*

লাখেরাজ বা নিষ্কর নিম্নলিখিত আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে।

১। দেবোত্তর—দেবমন্দির ও ভজনালয় সংস্থাপন এবং দেবতার সেবা, পূজা, বলী, চরু (ভোগ), সত্র (অতিথিসেবা) প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দেবোত্তর।

২। ব্রহ্মোত্তর—যাহা ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। মহত্মরাণ বা মহত্তরাণ—কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতিকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই মহত্মরাণ। কোন স্থলে চিকিৎসকদিগকে প্রদত্তভূমি "বৈদ্যোত্তর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহত্মরাণ শব্দটি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের দ্বারা মহত্মরাণ "ইনাম" শব্দে পরিণত হইয়াছে।

৪। বৈষ্ণবোত্তর—বৈষ্ণবদিগকে যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প।

৫। চেরাগী—মুসলমান মহাপুরুষদিগের সমাধি মন্দিরের ও ভজনালয়ের (মসজিদের) পরিচর্য্যা ও প্রদীপ (চেরাগ) প্রদান জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই চেরাগী আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে।

৬। পিরাণ—মুসলমান পিরদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই "পিরাণ" নামে খ্যাত।

৭। ফকিরাণ—মুসলমান ফকিরদিগকে প্রদত্ত ভূমি।

৮। খামার—সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও তালুকদার প্রভৃতিকে নিজ জোতের জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই খামার পদবাচ্য।

৯। খানেবাড়ী—ঐ প্রকার ব্যক্তিদিগকে বসতবাস করিবার জন্য যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

১০। খোসবাস—হিন্দুর খানেবাড়ী ও মুসলমানের খোসবাস এক শ্রেণীর নিষ্কর। *

১১। মদতমাস—ইছলাম ধর্ম্মপরায়ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই মদতমাস।

১২। ইনাম—ইহার অর্থ পুরস্কার। ইহা যে কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩। খএরাত—ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা সাধারণের উপকারার্থে যেভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

১৪। আএমা—মুসলমানদিগের ধর্ম্মার্থে দত্ত ভূমি। †

১৫। নান্‌কার—পদের কিম্বা কার্য্যের বৃত্তি স্বরূপ যে ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই নান্‌কার। জমিদারি নান্‌কার, ‡ তালুকদারি নান্‌কার, চৌধুরাই নান্‌কার প্রভৃতি অনেক

* নওয়াখালীর খোসবাস অন্যরূপ; ৪০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† *Fifth Report. pp. 298, 345.* কিন্তু মেদনীপুর জেলায় আএমা এক প্রকার রায়তী স্বত্বের ভূমি নির্ণীত হইয়াছে। *Field's Landholding &c. p. 710.*

‡ *Fifth Report. p. 345.*

প্রকার নান্‌কার দৃষ্ট হয়। নূরনগর পরগণার অন্তর্গত মাইজখাড় ও কৃষ্ণপুরের ঘোষ বংশের বংশাবলীতে লিখিত আছে, মহারাজ (আদি) রত্নমাণিক্য তাহাদিগের আদিপুরুষকে জমিদারি নান্‌কার প্রদান করেন। চৌধুরাই নান্‌কারের অনেকগুলি প্রাচীন সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। এই সকল নান্‌কারের নাম ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যবর্গকে কোন কার্য্যের জন্য যেভূমি প্রদত্ত হয়, তাহাই অধুনা নান্‌কার বলিয়া পরিচিত। কোন কোন স্থানে "চাকরান" বা "মোজরাই" ভূমি ও নান্‌কার বলিয়া আখ্যাত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই সকল ভূমি নান্‌কার শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেনা। কারণ চাকরান মোজরাই ভূমির অস্তিত্ব কার্য্যের সহিত বিলুপ্ত হয়; কিন্তু প্রাচীন ও প্রকৃত নান্‌কার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব হইতে অধিকারীগণ পুরুষানুক্রমে নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

জমিদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তের কালে সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর ভূমির কর ধৃত হয় নাই। কেবল মাত্র জমিদারগণের "নান্‌কার, খামার" ও চাকরান ভূমির জমা সকর ভূমির রাজস্বের সহিত গণনা করা হয়। লাখেরাজ রাজেস্রাপ্তের বিধি দ্বারা এরূপ অবধারিত হয় যে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত ভূমি নিষ্কর স্বরূপ ভোগ করা হইতেছে তাহাকে সিদ্ধনিষ্কর বলিয়া

জ্ঞান করিতে হইবে। তৎপরবর্ত্তী কালের প্রদত্ত নিষ্কর যাহা কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত কিম্বা মঞ্জুরী গৃহীত হয় নাই তাহাই অসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এরূপ অসিদ্ধ নিষ্কর বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে এবম্প্রকার নির্ণীত হয় যে ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধ পরিমাণ নিষ্কর কেবল গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। এবং তাহার ন্যূন পরিমাণ অসিদ্ধ নিষ্কর জমিদার-গণ বাজেয়াপ্ত করিয়া স্ব স্ব জমিদারি ভুক্ত করিতে পারিবেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কোনরূপ অতিরিক্ত কর দিতে হইবে না।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৮ আইনের ৩৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ৭৮ টি ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধ পরিমাণ মহাল ত্রিপুরা জেলার মধ্যে সিদ্ধ-নিষ্কর বলিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন। এবং তাহা "খালাসী লাখেরাজ" বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধ পরিমাণ অন্যান্য অসিদ্ধ নিষ্কর যৎকালে গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় চাকলে রোসনাবাদের জমিদার (ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর) অতি আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি প্রথমত গবর্ণমেণ্টের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আত্মকুক্ষি মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। মহারাজ বলিলেন, "চাকলে রোসনাবাদ মধ্যে যত নিষ্কর আছে, তাহা

আইন অনুসারে অসিদ্ধ হইলেও আমার পূর্ব্ব-পুরুষের প্রদত্ত। গবর্ণমেন্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে বিরত হউন; আমি ঐ সকল ভূমির জন্য গবর্ণমেন্টকে বার্ষিক ৮ সহস্র টাকা অতিরিক্ত কর প্রদান করিব।" গবর্ণমেন্ট মহারাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, অধিকন্তু বলিলেন, "মহারাজ ঐ সকল লাখেরাজ ভূমি হইতে কোনরূপ করগ্রহণ করিতে পারিবেন না।" তদনুসারে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টের সহিত মহারাজের এক এগ্রিমেন্ট লিখিত হয়।* উক্ত এগ্রিমেন্ট অনুসারে চট্টগ্রামের কমিসনর সাহেব ১৮৪৪

* ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজ লালমাই ময়নামতী পর্ব্বতে তাঁহার স্বত্ব স্থির রাখিবার জন্য ভারত সচীবের সমীপে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। সেই আবেদনপত্র ও তৎসঙ্গীয় দলীলাদির ইংরেজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। (Printed at the "Minarva" Press. 2. Uckoor Datta's Lane, Calcutta.) আমরা সেই মুদ্রিত পুস্তকের ১০ এবং ১১ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত এগ্রিমেন্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

2. In behalf of Government, other proceedings for the resumption of all sorts of rentfree lands, *towfeer*, reclaimed lands from jungle and churs newly formed, &c. appertaining to the landed estate Chakla Roshnabad, have been stopped and at no time shall any proceedings be instituted in behalf of Government, for the purpose of resu-

খৃষ্টাব্দের ২রা অাগষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমীপে লিখেন যে, চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত যেসমস্ত লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবিস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার রাজস্ব উক্ত ৮০০০ টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ট টাকার জন্য মহারাজের সহিত বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত অসিদ্ধ নিষ্কর গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন, সেই সমস্ত ভূমি হইতে মহারাজ কোনরূপ কর কিম্বা রাজস্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। উল্লিখিত এগ্রিমেণ্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা যেরূপ নিষ্কর ছিল চিরকাল সেইরূপ থাকিবে। সেই সকল লাখেরাজদারগণ নিকট রাজা কোন রূপ কিছু দাবি করিলে তাহা "জুলুম জবরদস্তী" (একৃটবসন)

ming or assessing new rent on any kind of land appertaining to Chakla Roshnabad.

3. Under thi[s] [de]e[d] of settlement, save and except the right and powers vested in the Zemindar under the Regulations, no new right or powers have been granted to him; that is to say, in reference to the rent which, under this agreement is become payable by the Moharaja, *the Raja shall have no power or right to demand any rent from a rentfree holder on account of the rent free tenure held by him before the execution of this deed of settlement between the Moharaja and Government, as it was improper to demand or realize any rent from any rentfree holder it will be so still.*

স্বরূপ গণ্য হইবে।* এই সকল হেতুবাদে কমিসনর সাহেব উক্ত বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী প্রার্থনা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর বাহাদুর তাহার মঞ্জুর করেন।† তদনুসারে মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ৮০০০ টাকার মধ্যে বাজেয়াপ্তী মহালের অবধারিত জমা বাদে অবশিষ্ট ৪৬২৬৷৶৯পাই চাকলে রোসনাবাদের জমার সহিত ভুক্ত করত এক নূতন কবুলিয়ত লিখিয়া দেন।‡ এই বন্দোবস্তের দ্বারা চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ১০০ বিঘার উর্দ্ধ পরিমাণ অসিদ্ধ নিষ্কর গুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধ নিষ্কর স্বরূপ গণ্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জমিদার কাহারও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

মধ্যস্বত্ব :—

ক :—খেরাজ বা সকর।

শ্রেষ্ঠ স্বত্বের অধিকারীগণকে রাজস্ব পরিশোধ করিয়া

---

* *Letter No. 525. From the Commissioner and Sodar Board 16th Division. To the Secretary to the Government of Bengal. 2nd August 1844.*

† *Letter No. 222. From the Under Secretary to Government of Bengal. To the Commissioner of Chittagong Division. 16th September 1844.*

‡ মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রদত্ত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১ মে মোতাবেক ১২৬২ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠের কবুলিয়ত দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের অধীনে যে সমস্ত ভূমি ভোগ করা হয়, তাহাই মধ্যস্বত্ব। মধ্যস্বত্বের ভূমি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও ইহাকে সাধারণত তালুক বলা যাইতে পারে। ত্রিপুরা জেলায় এরূপ তালুক অনেক আছে, যাহা জমিদারী সৃষ্টির পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে। নূরনগরের তালুক সমূহ তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ও অনেক তালুক সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যস্বত্বের তালুকগুলি প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী তালুক ও অন্যান্য আখ্যাবিশিষ্ট ভূমির জমা অপরিবর্ত্তনীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর তালুক প্রভৃতির জমা পরিবর্ত্তনশীল।

প্রথম শ্রেণী :—

(১) মকররী তালুক, (২) কায়েমি তালুক, (৩) পত্তনি তালুক, (৪) সিকিনী তালুক, (৫) (হাওলা) (৬) কায়েমী হাওলা (৭) মিরাস, (৮) মসকনী (৯) মকররী-খানেবাড়ী, (১০) খোসবাস মকররী, (১১) কারকোণা, *

দ্বিতীয় শ্রেণী :—

(১) তালুক বা মেয়াদী তালুক। কোন কোন জমিদার এই তালুককে "তকসিসি" বা "তসখিসি" আখ্যায়

* সরাইলের প্রাচীন জমিদারগণ তাঁহাদের আমলা প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণকে অল্প জমায় যেভূমি দান করিয়া গিয়াছেন তাহাই কারকোণা নামে পরিচিত।

পরিচিত করিবার জন্য নিতান্ত লালায়িত। তদ্ব্যতীত হাওলা গিরাস ও মসকুরী তালুকের মধ্যে কোন কোনটির জমা পরিবর্ত্তনশীল।

মধ্যস্বত্বের অধীনে কতকগুলি ভূমি আছে যাহা অধীন বা প্রজাস্বত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ; যথা দরতালুক, আগত তালুক, পেটাও তালুক, সামিলা তালুক, ওসত তালুক, নিম হাওলা প্রভৃতি এইগুলি মধ্যস্বত্বের অধীন হইলেও মধ্যস্বত্ব শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে।

খঃ—লাখেরাজ বা নিষ্কর।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণ দ্বারা যে সমস্ত নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত হইতে পারে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নিষ্করকেও মধ্যস্বত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ জমিদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কালে সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর বাদ রাখা হইয়াছিল।

অধীন স্বত্ব :—

আমরা রায়তী স্বত্বের ভূমিকে অধীনস্বত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থলে রায়তীস্বত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী কোন কোন জমিদারের অধিকৃত জমিদারীতে বহুকাল পূর্ব্ব

হইতে রায়তীস্বত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে। গঙ্গামণ্ডল ও লৌহ-গড় পরগণা ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পর হইতে সমগ্র ত্রিপুরায় রায়তীস্বত্ব প্রবল হইয়াছে।

ত্রিপুরাবাসী শ্রেষ্ঠ ও মধ্যস্বত্বের অধিকারী হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোকদিগের প্রায় সকলেরই খামার বা নিজজোত ভূমি আছে। পূর্ব্বে তাঁহারা ভৃত্য দ্বারা হলকর্ষণ করাইতেন, কিন্তু এক্ষণ অনেকেই "বর্গা" দ্বারা খামার ভূমি ভোগ করিতেছেন। বর্গা দুই প্রকার, এক প্রকার বর্গা দ্বারা উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশ স্বত্বাধিকারী প্রাপ্ত হন, অপরার্দ্ধ কৃষিকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার বর্গা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গীকৃত ফসল স্বত্বাধিকারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু ফসলের বীজ স্বত্বাধিকারী কৃষককে প্রদান করেন। অতিরিক্ত পরিমাণ জলপ্লাবন কিম্বা অন্য কারণে শস্য বিনষ্ট হইলে স্বত্বাধিকারী কিছুই প্রাপ্ত হন না।

ভূমির পরিমাণ :—

৩ ক্রান্ত ... ... (১) কড়া।
৪ কড়া ... ... (১) গণ্ডা ৻১
২০ গণ্ডা ... ... (১) কাণী ৴০
১৬ কাণিতে ... (১) দ্রোণ ১

অতি প্রাচীন কাল হইতে, শ্রীহট্ট ব্যতীত, সমগ্র বাঙ্গালা

দেশে এই নিয়মে ভূমির পরিমাপ হইত। গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মুসলমান শাসনকালে বিঘা, কাঠা দ্বারা ভূমির পরিমাপ প্রথা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অদ্যাপি সেই প্রাচীন প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে দ্রোণ মাপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৪ আড়ক বা আড়ীতে ১ দ্রোণ ধান্য। সেই ১ দ্রোণ বা ৮ মণ শস্য বীজ (ধান্য) যে ক্ষেত্রে বপন করা যাইত, তাহাই দ্রোণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালার কোন কোন অংশে রশি বা দড়ি দ্বারা ভূমির পরিমাপ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গালায় "নল" নামক গুল্ম দ্বারা ভূমির পরিমাপ করা হইত। অধুনা সেই নলের অভাবে মূলি কিম্বা অন্য প্রকার বাঁশ দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু তাহার নাম পরিবর্ত্তন হয় নাই। এজন্য অধুনা ভূমি পরিমাপক বংশদণ্ডকে নল বলা হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে ভূমির পরিমাণ সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। প্রধানত জমিদারদিগের লোভে অধুনা সেই পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ইন্দ্র মাণিক্যের ১১৫৩ ত্রিপুরাব্দের (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ) ৭ই আশ্বিনের সনন্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে ভূমির পরিমাণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

৩২ অঙ্গুষ্ঠে ...	...	... ১ ডাঙ্গ (হস্ত)।
১৭ ডাঙ্গে ...	...	... ১ নল।
১০ × ১২ নলে	...	... ১ কাণী।
১৬ কাণিতে (বা ১৯২০ বর্গ নলে)	...	... ১ দ্রোণ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যৎকালে রেসিডেণ্ট বুলার সাহেব চাকলে রোসনাবাদ জরিপ করেন। তৎকালে তিনি উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বন করেন; তিনি যে ডাঙ্গ দ্বারা নলের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ত্রিপুরার কালেক্টরিতে রক্ষিত হইয়াছে, ইহা আধুনিক ১৯ ইঞ্চি হইতে কিঞ্চিৎ অধিক। প্রবাদ অনুসারে ইহাই ইন্দ্র মাণিক্যের লিখিত ৩২ অঙ্গুষ্ঠের ডাঙ্গ বা হস্ত; মতান্তরে রোসনাবাদের তদানীন্তন দেওয়ান কালীচরণ সিংহের মস্তকের পরিধি পরিমাণ দ্বারা এই ডাঙ্গ প্রস্তুত করা হয়।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রেবিনিউ বোর্ড জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত পরগণা সমূহের ভূমির পরিমাণ অবগত হইতে ইচ্ছা করেন।* তদনুসারে তদানীন্তন কালেক্টর যে নক্সা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় রিপোর্ট † সহ চট্টগ্রামের কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

* *Board's Circular No. 76. Dated 26th Sept. 1837.*
† *Letter from W. J. H. Money. Esq. Collector of Tippera, to the Commissioner of the Chittagong. No. 6. 4th may. 1838.*

পরগণা বা মহালের নাম।	নলের পরিমাণ।	এক দ্রোণে কত বর্গ নল	এক দ্রোণে কত একর
মৌজে ভাটেরা পং চৌদ্দগাঁও পং হোমনাবাদ তপে ইব্রাহিমপুর পং মহীচাল	১৯ ইঞ্চি ১ হাত ১৬ হাতে ১ নল	১৯২০	২৮
পং একতাদপুর- মাছুয়াখাল	১৯ ইঞ্চি ১ হাত ১৮ হাতে ১ নল	”	৩৫
পং শ্যামপুর পং পাইটকাড়া	১৯ ইঞ্চি ১ হাত ১৫ হাতে ১ নল	”	২৫
চাকলে রোসনাবাদ	১৯ ইঞ্চি ১ হাত ১৬ হাতে ১ নল	”	২৮
পং গঙ্গামণ্ডল	১৯ ইঞ্চি ১ হাত ৭ হাতে ১ নল	”	৫

ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, ত্রিপুরার অন্তর্গত বলদাখাল, সরাইল প্রভৃতি পরগণা সমুহের পরিমাপের কথা মনি সাহেব উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক আধুনিক জমিদারগণ প্রায় সকলেই দ্রোণের আয়তন খর্ব্ব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন।

ত্রিপুরার জমিদার মণ্ডলী :—জেলা ত্রিপুরার আধুনিক প্রধান জমিদারগণ প্রায় সকলেই ভিন্ন দেশ-বাসী। ইহা দ্বারা ত্রিপুরাবাসিগণের নানা প্রকার অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। দেশবাসিগণ জমিদার মণ্ডলী হইতে যে সকল বিষয়ে সাহায্য পাওয়ার প্রত্যাশা করিতে পারেন ; সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা অনেক সময়ে উপযুক্তরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হন না।

জেলা ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রধান জমিদার ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদুর। তাঁহাকে বিদেশী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে না ; কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজ ত্রিপুরাবাসী সম্বন্ধে বিদেশী অপেক্ষাও অধিকতর উদাসীন। ত্রিপুরার রাজসরকার জরাজীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ত্রিপুরার মহারাজের পরেই ঢাকা নিবাসী,—বলদাখালের প্রধান জমিদার নবাব আবদুলগণি খাঁ বাহাদুর* ও সরাইলের জমিদার বাবু আশুতোষ নাথ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের উভয়ের জমিদারির লভ্য সমতুল্য হইবে। নবাব সাহেবের দানশীলতার পরিচয় গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রায়ই বিঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু গরীব ত্রিপুরা-বাসী তাহার বড় একটা খোঁজখবর পাইতেছে না।

* এই অংশ যৎকালে মুদ্রিত হইতেছিল, সেই সময় আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম যে, এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ পরলোকগমন করিয়াছেন।

সরাইলের জমিদার বাবু আশুতোষ নাথ রায়, বাবু জগবন্ধু রায়ের বংশধর। তাঁহাদের বংশাবলী এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

জগবন্ধু রায়।
|
নরসিংহ রায়।
|
রাজকৃষ্ণ রায়।
|
অন্নদাপ্রসাদ রায়।
|
আশুতোষ নাথ রায়।

ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই রায় পরিবার মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কাশীমবাজার নিবাসী। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রজাহিতৈষী ভূম্যধিকারী বটেন; ইঁহাদের সাহায্যে সরাইল পরগণার মধ্যে দুইটি এণ্ট্রান্স স্কুল ৫টি মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি স্কুল ও কতকগুলি পাঠশালা পরিচালিত হইতেছে। ৺ রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর দয়ালু, দাতা ও প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সরাইলবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহার পত্নী রাণী আন্নাকালীদেবী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও দয়া দাক্ষিণ্যে সরাইলবাসীর বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি তাঁহার পুত্র স্বীয় পিতামাতার গুণরাশি ও কার্য্য কলাপের অনুকরণ করিবেন।

তদনন্তর গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড়ের জমিদার, শোভাবাজার রাজবংশ; পাইটকাড়ার জমিদার, ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণ; কাদবা প্রভৃতি পরগণার নবীন জমিদার মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড়, শোভাবাজার রাজপরিবারের অবিভক্ত সম্পত্তি। ইহা রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর কিম্বা তৎসদৃশ অন্য কোন মহাত্মার নিজ সম্পত্তি হইলে প্রকৃতিবর্গের উপকারের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু এক্ষণ সে আশা দুরাশা মাত্র। পাইটকাড়ার অদৃষ্টে প্রায় তদ্রূপই ঘটিয়াছে।

স্থানীয় জমিদার :—স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন জমিদারগণ প্রায় সকলেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। অদ্যাপি যাঁহারা জমিদার আখ্যা দ্বারা পরিচিত হন, তন্মধ্যে হোমনাবাদের অন্যতম জমিদার সৈয়দ বসরত আলী চৌধুরী সর্ব্বপ্রধান। আমরা দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, সৈয়দ সাহেব উন্মাদ, তাঁহার সম্পত্তি জজ সাহেবের অধীনে মেনেজার দ্বারা শাসিত হইতেছে।

হোমনাবাদের প্রাচীন জমিদার বংশজাত ইউছুফ্ আলী চৌধুরী সাহেব দানশীল ও প্রজাহিতৈষী জমিদার বটেন। স্বীয় অবস্থা অনুসারে তিনি মুক্তহস্তে সৎকার্য্যে অর্থদান করিয়া থাকেন। তাঁহার ভগিনী নবাব ফয়জন্নেছা সাহেবা ভ্রাতার উপযুক্তা বটেন। উক্ত নবাবসাহেবা "রূপজালাল"

নামক একখানি উপখ্যান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। এই প্রাচীন ও দানশীল জমিদার বংশের বংশাবলী এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

মির্জা আগোয়ান খাঁ।
|
আমির মির্জা আক্রু খাঁ।
(প্রকাশ্য ভুরু খাঁ)
|
আমির মির্জা মাছিম খাঁ।
|
আমির মির্জা আবদুল মতাহের খাঁ।
|
মির্জা সুলতান।
(প্রকাশ্য গোরাগাজি চৌধুরী।)

- গাজি চৌধুরী।
  - কন্যা
    - বক্স আলী চৌধুরী*
- হোসেন আলী চৌধুরী
  - আহাম্মদ আলী চৌধুরী
    - এরাকুব আলী চৌধুরী
    - ইউছফ আলী চৌধুরী (স্ত্রী মহাম্মদী বেগম।)
      - মাহাম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী
        - মাহাম্মদ জাহাঁগীর চৌধুরী
    - কন্যা নবাব ফয়জন্নেছা সাহেবা
- দৌলত গাজি চৌধুরী*
- জালাল বক্স চৌধুরী*

* ৪৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হোমনাবাদের নবীন জমিদার ৺তিলকচন্দ্র সিংহের পৌত্র বাবু আনন্দচন্দ্র সিংহ রায় সদাশয়, বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী। তিনি নিজ ব্যয়ে কুমিল্লানগরে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল চালাইতেছেন।

মধ্যশ্রেণী :—প্রধানত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান দ্বারা এই শ্রেণী গঠিত। মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকগণই দেশের জীবনস্বরূপ। মধ্যশ্রেণী জ্ঞানে ও শিক্ষায় দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছেন। প্রতিযোগিতায় উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইতেছেন। উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি উন্নত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যশস্বী হইতেছেন। অপর দিকে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষারগতি প্রতিরোধ হয় নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থার অবনতি, অবস্থাবৈপর্য্যায় মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই শ্রেণীর আর্থিক অবনতি দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অধিকাংশ স্থলে ইঁহারা মধ্যস্বত্বের অধিকারী। দেশের প্রধান জমিদারগণ অধিকাংশ ভিন্ন দেশবাসী। জমিদার শ্রেণীর সহিত প্রাচীনকালে মধ্যশ্রেণীর বিশেষরূপ সদ্ভাব ছিল; নবীন ক্রেতা ভিন্ন দেশীয় জমিদারগণের সহিত মধ্যশ্রেণীর সেই ভাব, ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। স্বদেশী ও বিদেশী প্রবল জমিদারগণ মধ্যে কোন

কোন ব্যক্তি মধ্যশ্রেণীর বিনাশসাধন জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাধারণ প্রজাগণের মঙ্গলসাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সুদৃঢ় বিধি প্রণয়ন করিতেছেন, মধ্যশ্রেণীর রক্ষার জন্য তদ্রূপ কোন বিধি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রণীত হয় নাই। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পর হইতে মধ্যস্বত্বের তালুকের ভূমির মূল্য হইতে প্রজাস্বত্বের ভূমির মূল্য আশাতীতরূপ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। তালুকীস্বত্বের /০ কাণী ভূমির মূল্য ২০ টাকা হইলে, তদ্রূপ প্রজাস্বত্বের /০ এক কাণী ভূমির মূল্য ৪০। ৫০ টাকার ন্যূন হইবে না। স্থান ও অবস্থাভেদে তাহার মূল্য শতাধিক টাকা হইয়া থাকে। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে কোন কোন স্থলে মধ্যস্বত্বের বিনাশ অনিবার্য্য। ত্রিপুরা জেলা এক একটি বৃহদায়তন জমিদারিতে বিভক্ত, এজন্যই দেশের যাঁহারা জীবনস্বরূপ, তাঁহারা মস্তকোত্তলন করিতে পারিতেছেন না; এবম্প্রকার অবস্থায় মধ্যস্বত্বের বিনাশ সাধিত হইলে, দেশের ভয়ানক অকল্যাণ সাধিত হইবে। মধ্যস্বত্বের অধিকারীর সহিত প্রজাসাধারণের যেরূপ সদ্ভাব ও প্রীতি বৰ্ত্তমান আছে, জমিদার শ্রেণীর সহিত প্রজাসাধারণের তাহার বিপরীত ভাব সৰ্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আপদে বিপদে মধ্যশ্রেণী প্রজাসাধারণের অগ্রজের ন্যায় সাহায্যকারী; কিন্তু যেস্থানে মধ্যস্বত্বের অভাব সেই স্থানে প্রজাসাধারণের

মর্ম্মবিদারক ক্রন্দনধ্বনি প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে শূন্যমার্গে বিলীন হইয়া যাইতেছে। জমিদারবৃন্দের বিলাসভবননিবাসী অপ্সরা কিম্বা কলাবত সমূহের মধুরনাদে প্রজাবৃন্দের কাতরনিনাদ ঢাকিয়া ফেলিতেছে, কিম্বা রাবণ সদৃশ পরাক্রমশালী "মেনেজার" "নায়েব" প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিবৃন্দের পরাক্রমে প্রজাসাধারণে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ প্রাপ্ত হইলেই "নায়েব হত্যা" "তহশীলদার হত্যা" "কাছারি বাড়ী দাহ" ও "নরহত্যা" প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হয়। তৎকালে জমিদারগণ ইহার কারণ অনুসন্ধান করত অত্যাচার নিবারণের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া "দুর্দ্দান্ত" প্রজাকুলের দমন জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে থাকেন।

প্রজা সাধারণ :—ত্রিপুরার প্রজাগণ মধ্যে নির্দ্দয় ও নিরীহ উভয় প্রকারের লোক দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরাবাসী দুষ্ট প্রজাগণ অত্যাচারগ্রস্ত হইলে অনলক্রীড়া দ্বারা তাহার প্রতিশোধ লয়। পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরাবাসী দুর্দ্দান্ত প্রজাগণ এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য না করিয়া যষ্ঠি হস্তে সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া থাকে। জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষ, ইহাদিগকে প্রাচীন "নবাবসৈন্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পাটের চাষ দ্বারা প্রজাসাধারণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন দ্বারা ইহাদের অবস্থা বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চাকলে রোসনাবাদ।

ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র মুসলমানগণ ক্রমে ক্রমে কিরূপে অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ১১৪২ ত্রিপুরাব্দে মির হবিব দ্বারা ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র শেষ বার সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়। এই সময় তাহাকে রোসনাবাদ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। এই রোসনাবাদ চাকলা তৎকালে ২৪টি পরগণায় বিভক্ত ছিল। দাউদপুর পরগণা তাহার অন্যতম। অল্পকাল পরে দাউদপুরের মুসলমান জমিদারগণ তাহা রোসনাবাদ হইতে খারিজ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং মির হবিবের ত্রিপুরা বিজয়ের পর ত্রিপুরেশ্বর ২৩টি পরগণা মাত্র জমিদারী স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে রোসনাবাদ ৫৩ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রধানত রাজ-পরিবারের যৌতুক (যুলাই) দ্বারা এবং ত্রিপুরেশ্বরের প্রাচীন কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক (স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য) এক একটি বৃহৎ পরগণার কিয়দংশ দ্বারা (স্বয়ং তালুক স্বরূপ গ্রহণ

করত স্ব স্ব নামে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী পরগণা সৃষ্ট হইয়াছিল। যুবরাজ চম্পকরায় মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময়ে নুরনগরের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নুরনগরের কিয়দংশ দ্বারা চম্পকনগর সৃষ্টি করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের উজির জয়দেব, নুরনগরের কিয়দংশ দ্বারা জয়দেবনগর নামক পরগণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে রোসনাবাদ মধ্যে নুরনগর, মেহেরকুল, বগাসাইর, তীক্ষ্ণা, ও খণ্ডল এই ৫টি মূল ও বৃহৎ পরগণা ছিল। এই ৫টি দ্বারা মির হবিবের সময় ২৪টি পরগণা গণনা করা হয়। এই ২৪টি হইতে দাউদপুর খারিজ হইয়া ২৩টি ছিল। ১৮৬১—৬৪ খৃষ্টাব্দের রেবিনিউ সার্বে কালে* রোসনাবাদ মধ্যে ৫৩টি পরগণা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত সার্বে কাগজ দৃষ্টে পরগণা সমূহের নাম ও তাহার ভূমির পরিমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

রেবেনিউ সার্বেয়ার স্মার্ট সাহেব স্বীয় রিপোর্টে পরগণা সমূহের ভূমির যে পরিমাণ লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সংগৃহীত কাগজের সহিত অনৈক্য হইতেছে।† এজন্য এস্থানে উভয় পরিমাণ প্রদর্শিত হইল।

*১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ত্রিপুরা জেলার সার্বে কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

† *Smart's Report of the District of Tippera.* pp. 15, 16.

পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ।			স্মার্ট লিখিত পরিমাণ।	
	একর	রুড	পোল	একর	ডিসিমেল
উত্তর বিভাগ।					
১ নুরনগর	৯৬৮৫৬	২	৩২	৯৪৪৪৮	৩৭
২ শিবনগর *	—	—	—	—	—
৩ মাদলাচম্পাকনগর	৮৭০	২	২	৮৭০	৫১
৪ ধর্ম্মনগর কাশীরামপুর	১৫৯৭	০	৩৪	১১০৭	২৮
৫ জাহ্নবীনগর	১১০৯	০	৩৭	১১৫৯	৭১
৬ চাকলে বিশালগড় নিজ বিশালগড়	১৭৩১	১	৩	১১৭১	৫৩
৭ ধর্ম্মপুর	৭০৩	১	২৯	১১৯৩	৩৬
৮ উত্তর গোপীনাথপুর	৮৬	০	৩	১১৫৯	৭১
৯ দক্ষিণ গোপীনাথপুর	৭১৯	৩	২৭		
১০ অষ্টজঙ্গল	১৭০১	০	১৯	১৭০১	১৩
১১ ধলেশ্বর	১০৫৩	২	৩১	১৬৬৪	৫৬
১২ চম্পকনগর	৫৯০৯	২	২৭	৭৫৫৮	৬৩
১৩ উত্তর গঙ্গানগর	১২৩০২	১	২২	১১৯৯৮	৫৯
১৪ মন্তলা †	৬৭১১	২	৩৮	—	—
১৫ মন্তলা গঙ্গানগর †	২৩৯০	৩	২	—	—
১৬ মণিপুর †	১৬২৩	১	৩২	—	—

* এই ক্ষুদ্র পরগণা নুরনগরের অন্তর্ভুক্ত।

† স্মার্টের তালিকায় এই সকল পরগণার নাম নাই।

১৭	রত্নেনগর *	—	—	—	—	—
১৮	বামুটিয়া	৭৮০	১	১৩	৭৮০	৩৩
১৯	জয়দেবনগর	৩৫৩৫	০	২৭	৩৫৩৫	১৭
২০	জয়দেবপুর †	—	—	—	—	—
২১	পাথরঘাটা	১৪১৪	০	১৫	১৬৯৭	১৬
	মধ্য বিভাগ।					
২২	মেহেরকুল	৭৮৩১৯	৩	৩২	৯১৫৯৯	৮৯
২৩	ধর্ম্মনগর	৩২১১	৩	২৪	৮৪৩	৯৮
২৪	পিপলীয়া গঙ্গানগর	৫৫০	১	১৮	৫৫০	৩৬
২৫	ফুলতলী ‡	২২৭১	১	১৩	—	—
২৬	বলরামপুর ‡	২০৩৬	২	২৬	—	—
২৭	বগাসাইর	২২২৩৬	১	৩৩	২৫৫৯৯	২৩
২৮	চৌদ্দগ্রাম	৬০৬৭	৩	১৭	৬১৯	২৫
২৯	রাজামতী	২৪৬১	১	৩৮	১৯১৮	৫০
	তীক্ষারাজামতী	—	—	—	৫৪৮	১৮
৩০	তীক্ষা	১৭৬২৬	০	৪	১৮১০৭	৫৮
৩১	তীক্ষা দড়ি রাজধরনগর	৪২৫৬	১	২৩	৩৩১৭	৫৩
৩২	তীক্ষা খামার	২৬৬৬	৩	৩০	৩৭৯৯	৩৮
	তীক্ষা বগাসাইর	—	—	—	৩৩৫	০৮
৩৩	তীক্ষা রাজধরনগর	১২৬	১	৩৮	১২৬	৪৯

* মন্তলা, মণিপুরের সহিত পরিমাপ হইয়াছে।

† জয়দেবনগরের সহিত পরিমাপ হইয়াছে।

‡ স্মার্ট এই দুইটি পরগণা মেহেরকুল ভুক্ত করিয়াছেন।

৩৪ তাঁক্ষা গঙ্গানগর	৬৬৫	২	২১	৬৬৫	৬৩
তাঁক্ষা ধনঞ্জয়নগর	—	—	—	১০৩৫	৮৫
৩৫ কৃষ্ণনগর চকবস্তে ভঙ্গরায়	১৮৭৮	১	২৬	—	—
দক্ষিণ বিভাগ।					
৩৬ দক্ষিণ শিক	১৬৯৮২	৩	২৪	১৫৬১৪	৯২
দক্ষিণশিক কাশীপুর	—	—	—	২১৮০	৯১
৩৭ দক্ষিণশিক গঙ্গানগর	৪৫৪১	৩	১২	৪৫৪১	৮৩
৩৮ জগৎপুর	৯৯৬৪	৩	২১	১০৭৭০	৪৩
৩৯ সাবেক রতননগর	১১৭৭২	০	০	১১৭৭১	৯৯
৪০ যুলাই দুর্জ্জয়নগর	২৫০৩	২	১৬	২৫০৩	৬০
৪১ যুলাই রতননগর	৩২০৭	০	৩৫	৩২০৭	২২
৪২ যুলাই গঙ্গানগর	৪২৭	৩	৩৪	১৮৮	৪৩
৪৩ যুলাই রাজধরনগর	১৬৭৯	৩	২৫	১৬৭৯	৯০
৪৪ গদানগর	২০৬৩	১	৬	১৬৫২	৮৫
৪৫ কোলাপাড়া	৯২৯	১	৩৭	৯২৯	৪৮
৪৬ গদাধরপুর	১২৬৫	২	৩৬	১২৬৫	৭৩
৪৭ কালিকাপুর	২২০৫	২	৩৮	২৪৬১	৩১
৪৮ যশোদানগর	২৪২৭	২	১২	২৪২৭	৫৮
৪৯ খণ্ডল	১৬৩৮২	১	৩৮	১৬৬০৮	৩৯
৫০ রাজধরনগর	৩৪০৫	০	২	২১২	০০
রাজধরনগর, গদানগর ও যশোদানগর	—	—	—	৪৯৯	৭২

৫১ রাজমণিপুর	৯৪৫	১	৩৮	১৪৯৭	৯৯
৫২ চন্দ্রনগর	৩১৪৭	২	৩	৩১৪৭	৫২
চন্দ্রনগর মণ্ডল	—	—	—	৪৫০	৬০

ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের লিখিত রিপোর্ট সমূহে চাকলে রোসনাবাদের পরিমাণ ৩৭৭১০০ একর বা ৫৮৯ বর্গমাইল লিখিত আছে। আমাদের সংগৃহীত সার্বে কাগজ অনুসারে ভূমির পরিমাণ এইরূপ হইতেছে :—

বিভাগ।	একর	রুড	পোল	
উত্তর বিভাগ। সদরকাচারী মোগড়া	১৭১০৯৭	৩	১৩	
মধ্যবিভাগ। সদরকাচারী কুমিল্লা	১৪২৩৮৫	৩	২৩	
দক্ষিণ বিভাগ। সদরকাচারী ফেণী	৮৩৮৫১	২	১৭	
	৩৬৭৩৩৫	১	১৩	

উমাকান্ত বাবুর মন্ত্রীত্ব কালে, তিনি ১৩০০ ত্রিপুরাব্দের যে বার্ষিক বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজের জমিদারির ভূমি ও স্থিতের তালিকা নিম্নলিখিত রূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিভাগ	সদরকাচারী।	ভূমির পরিমাণ একর	স্থিত টাকা
দক্ষিণবিভাগ	ফেণী	৭৯৫০২	২০০৩৬৪.৵৮
মধ্যবিভাগ	কুমিল্লা	১৪৬১৮৬	২৯৭১২৫।৶৫
উত্তরবিভাগ	মোগড়া	১৪০৯৪৩	১২১৬৫৭।০৩
শ্রীহট্টবিভাগ	লাহারপুর	২৯০০০	২৫৬৫৫॥০৭
সর্ব্বশুদ্ধ ...	... ...	৩৯৫৬৩১	৬৪৪৮০২॥৴১১

ফেণী অর্থাৎ দক্ষিণ বিভাগ নওয়াখালী জেলার অধীন। চাকলে রোসনাবাদ ব্যতীত নওয়াখালী জেলার মধ্যে মহারাজের অতি অল্প পরিমাণ অন্য জমিদারী আছে।

মধ্যবিভাগ মধ্যে জেলা ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লা অবস্থিত। এই বিভাগ সম্পূর্ণ ত্রিপুরা জেলার অধীন।

উত্তর বিভাগের অধিকাংশ ত্রিপুরা জেলার মধ্যে অবস্থিত। মন্তলা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

লাহারপুর কাচারির অধীন শ্রীহট্ট বিভাগ, চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত নহে। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য কিরূপে শ্রীহট্টের অন্তর্গত জমিদারী ক্রয় করেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে। তদনন্তর মহারাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর কয়েকটি মহাল ক্রয় করত তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের শাসনকালে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মুরনগর (কসবা)

নগরে প্রথম ব্রিটীস বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। এই সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রোসনাবাদের শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। রেসিডেণ্ট লিক সাহেব রোসনাবাদের প্রথম শাসনকর্ত্তা। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ রোসনাবাদের রাজস্ব ১০০০০১ টাকা ধার্য্য করেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট সম্রাট সাহা আলম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ প্রদান করেন। তদনন্তর কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রোসনাবাদের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বলরাম মাণিক্যের হস্তে রোসনাবাদের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরে পুনর্ব্বার কৃষ্ণ মাণিক্য স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে (১১৯২ ত্রিপুরাব্দে) রেসিডেণ্ট লিক সাহেব স্বহস্তে রোসনাবাদের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র (ত্রিপুরার ভাবী নরপতি) “রাজধর ঠাকুর” কোম্পানীর প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন বলিয়া রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন।* যদিচ নানাবিধ কারণে এবম্প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রকৃতপক্ষে

* *Hunter's Bengal Ms. Records Vol. I. p. 38.*

তদ্রূপ কোন ঘটনা হয় নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পরলোক গমন করেন। তদনন্তর কিছুকাল তাঁহার পত্নী জাহ্নবী দেবী রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি মতে রেসিডেণ্ট লিক সাহেব মৃত রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র উল্লিখিত রাজধর ঠাকুরকে ত্রিপুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের (১২০২ ত্রিঃ অঃ পূর্ব্বে রোসনাবাদের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে অর্পিত হয় নাই।

প্রায় দশবৎসর কাল লিক্, কেম্পবল, বুলার প্রভৃতি রেসিডেণ্ট সাহেবগণের হস্তে রোসনাবাদের শাসনকার্য্য ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহারা মহারাজ ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের যোগে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রেসিডেণ্ট সাহেবগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে চাকলে রোসনাবাদ জরিপ হইয়াছিল।

তৎকালে চাকলে রোসনাবাদের অন্তর্গত নুরনগর, বিশালগড়, ধর্ম্মপুর, গোপীনাথপুর, উত্তরগঙ্গানগর ও চম্পকনগর প্রভৃতি পরগণার অধিকাংশ অরণ্যপূর্ণ ছিল। মহারাজ তাহার বনকর প্রভৃতি (শুল্ক) দ্বারা বার্ষিক প্রায় ৩০৭৬২ টাকা "সায়রাত" জমা প্রাপ্ত হইতেন। রেসিডেণ্ট বুলার সাহেবের যত্নে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উল্লিখিত সায়রাত জমা বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট সেই মর্ম্মে বুলার সাহেব এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন।*

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত চাকলে রোসনাবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ রোসনাবাদের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। তৎকালে উল্লিখিত সায়রাত জমা ২৮০০০ টাকা বাদে শিক্কা ১৩৭০০১ টাকা রোসনাবাদের রাজস্ব অবধারিত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল (১২১২ বঙ্গাব্দের ৭ই বৈশাখ) মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য হইতে রোসনাবাদের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কবুলিয়ত গ্রহণ করেন, তাহাতে শিক্কা ১৩৯৬৭৬ টাকা বার্ষিক রাজস্ব লিখিত আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ (১২৩৬ বঙ্গাব্দের ২০শে ফাল্গুন) মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য রোসনাবাদের জন্য এক কবুলিয়ত দাখিল করেন, তাহাতে রাজস্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তৎপর একশত বিঘার অধিক পরিমাণ অসিদ্ধ নিষ্করের জন্য (৮০০০—৩৩৭৩৷৷০৩=) ৪৬২৬৷৵৯ পাই টাকা এবং শিক্কা ১৩৯৬৭৬ টাকার পরিবর্ত্তে কোম্পানীর মুদ্রা ১৪৮৯৮৭৷৷৵৯ পাই টাকা সংযুক্ত করত সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩৬১৪৴৬ পাই টাকায় মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে (১২৬২ বঙ্গাব্দে ৮ই জ্যৈষ্ঠ) “কোম্পানী বাহাদুর” সমীপে একখানা কবুলিয়ত প্রদান করেন। অধুনা তদনুসারে রোসনাবাদের রাজস্ব পরিশোধ হইতেছে।

রোসনাবাদ মধ্যে অনেক প্রকার নিষ্কর ও মধ্যস্বত্বের তালুক আছে। উত্তর বিভাগস্থিত নূরনগর ও তৎসামিলা

পরগণা সমূহ ব্যতীত মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগের অধিকাংশ ভূমি মহারাজের খাস। মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগে তালুকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। মকররী তালুকগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। দুর্ব্বল ও অনভিজ্ঞ লাখেরাজদারবর্গের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া বিপিনবিহারী গোস্বামী কতকগুলি পত্তনি তালুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তদনন্তর বর্ত্তমান মহারাজ আরও কতকগুলি পত্তনি তালুক প্রদান করিয়াছেন। কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুক আছে, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও তাহার প্রকৃতি নুরনগর পরগণার ঐ শ্রেণীর তালুকের সদৃশ।

পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে যে, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে, গুরু বিপিনবিহারী গোস্বামী রোসনাবাদের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তৎকালে (১৮৬১ খৃঃ) তিনি প্রকৃতপক্ষেই লোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সিদ্ধ, অসিদ্ধ কিম্বা ১০০ বিঘার ঊর্দ্ধ নিষ্কর বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিলনা। "লাখেরাজ" আঘ্রাণ পাইলেই তাহা কিরূপে বাজেয়াপ্ত করিবেন, সেই চিন্তায় তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। কতকগুলি দুর্ব্বল, অনভিজ্ঞ লাখেরাজদারকে ছলে বলে ও কৌশলে করতলস্থ করিয়া সেই সকল লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করত কতকগুলি তালুক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল

লাখেরাজদার করদানে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন, তাঁহাদের নামে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য প্রায় লক্ষাবধি টাকা খরচ করিয়া অনেকগুলি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁহার আশা সফল হইলনা। কতকগুলি এক তরফা ব্যতীত বিতর্কিত মোকদ্দমায় রাজসরকার পরাজিত হইলেন।

এই শ্বাপদ সঙ্কুল, অনার্য্যপ্লাবিত অরণ্যময় প্রদেশে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন জন্য প্রাচীন নরপতিগণ যে মুক্তহস্তে নিষ্কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্তে যেরূপ ত্রিপুরা অবস্থিত, তদ্রূপ বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট রাজ্য অবস্থিত ছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চকোটের নাম অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সেই পঞ্চকোটের পরিমাণ তিনটি চাকলে রোসনাবাদের সমান হইবে। সেই পঞ্চকোট রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ ভূমি লাখেরাজদার ও জায়গীরদারদিগের অধিকৃত। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর যৎকালে ত্রিপুরাজাতির জলাচরণ জন্য দেশবাসীর সহিত কলহ করিতেছিলেন, তৎকালে জলতরঙ্গের পৃষ্ঠপোষক স্বীয় অনুচর দ্বারা "সাময়িক সমালোচনার সমালোচনা ও মীমাংসা" নামক এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, উক্ত গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—"ত্রিপুররাজগণ পুরুষানুক্রমে দেবতা

দ্বিজ এবং গুরুভক্তি পরায়ণ। ত্রিপুর রাজত্বের প্রায় অর্দ্ধাংশ-ভূমি দেবত্র ব্রহ্মত্র এবং পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" এই বর্ণনা অত্যুক্তিপূর্ণ হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণকে উপনিবিষ্ট করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা রাজবংশীয়-দিগের প্রকৃতি অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা তাঁহা-দের পূর্ব্বপুরুষদত্ত লাখেরাজ কিরূপে বাজেয়াপ্ত করিবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন। কৃত্রিম লাখেরাজের দোহাই দিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। গুরু বিপিনবিহারী যে সমস্ত লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সিঙ্গারবিল নিবাসী উজির বংশধর শিবজয় ঠাকুর, চৌদ্দগ্রাম নিবাসী উমাকান্ত সেন বাহাদুর, বানাসুয়া নিবাসী উদয়চন্দ্র বিশ্বাস এবং লেসীয়াড়া নিবাসী গৌরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নামীয় মোকদ্দমা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।* এই সকল মোক-

* এই সকল মোকদ্দমার মধ্যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩৬নং বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ২৩৬ নং মোকদ্দমার সুদীর্ঘ নিষ্পত্তিপত্রে ত্রিপুরার প্রধান সদর আমিন বাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-

দ্দমা বিশেষ তর্কের সহিত আপীল আদালত পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং সমস্ত গুলিতে লাখেরাজদায়গণ জয়লাভ করেন।

যে সকল মোকদ্দমা একতরফা সূত্রে রাজসরকারের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি মোকদ্দমায়

ছেন।* আপীল আদালত তাঁহার নিষ্পত্তি বহাল রাখেন। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের অনেকগুলি মোকদ্দমায় লাখেরাজদার কালেক্টরির মহাফেজখানায় রক্ষিত মিনাহি তেরিজের নকল দাখিল করেন। রাজসরকার পক্ষে এই সকল কাগজ অপ্রামাণ্য বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য, রামলোচন বর্দ্ধন প্রভৃতির নামীয় জমানিসাস্তের মোকদ্দমায় ১২৪৯ সনের ১০ই পৌষ এক দরখাস্ত দ্বারা উক্ত মিনাহি কাগজ প্রকৃত ও বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকগুলি মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ উক্ত মিনাহি কাগজ অনুসারে রাজসরকারের প্রতিকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মোকদ্দমার নিদর্শন এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুরার জজ আদালত, আপীল নং ২৭, সন ১৮৬৩ ইং। ত্রিপুরার প্রধান সদর আমিন শ্রীযুক্তবাবু জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন ১৮৬৩ইং ১৯শে জানুয়ারির নিষ্পত্তি অস্বীকারে আপীল।

বীরচন্দ্র ঠাকুর আপীলান্ট। রামজয় বর্ম্মণ গং রেস্পাণ্ডেণ্ট।

১৮৬৩ ইং ১৮ই আগষ্ট আপীল ডিসমিস হইয়াছিল।

* বীরচন্দ্র যুবরাজ বাদী, উদয়চন্দ্র বিশ্বাস গং বিবাদী, ১৮৬১ ইং ৩৭৪ নং, ১৮৬২ ইং ২৯শে ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি পত্র দ্রষ্টব্য।

বাজেয়াপ্ত ভূমিতে কর ধার্য্য হয়। অবশিষ্ট গুলির তদ্বির চালাইতে রাজসরকার বিবিধ কারণে সঙ্কোচিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই সকল "একতরফা" মোকদ্দমা গুলিকে বর্ত্তমান মহারাজ পুনর্জ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ সেই পন্থা রুদ্ধ করতঃ গরিব লাখেরাজদারদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। *

সপ্তম অধ্যায়।

পরগণে নুরনগর।

চাকলে রোসনাবাদ মধ্যে নুরনগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উন্নত পরগণা। ইহার পরিমাণ অধুনা ১৫১ বর্গমাইল হইতে ও কিঞ্চিদধিক। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার পরিমাণ বোধ হয় তাহার দ্বিগুণ ছিল। সরাইলের কিয়দংশ এই পরগণা হইতে গৃহীত। তদ্ব্যতীত এই পরগণার খণ্ড অংশ দ্বারা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা সৃষ্ট হইয়াছে।

* *Indian Law Reports. Calcutta Series. Vol. XVI. pp. 449, 450.*

এই পরগণা সরাইলের প্রকৃতি বিশিষ্ট; ইহার পূর্ব্বাংশ পর্ব্বতের উপত্যকাস্থ বলিয়া তাহার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, সরাইলের ন্যায় এই পরগণাটিও নদী স্রোতে প্রবাহিত কর্দ্দমরাশী দ্বারা গঠিত। জলাভূমি সকল প্রথমত নানা প্রকার তরুগুল্মে আচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ এই পরগণাটিও তরুগুল্মে আচ্ছাদিত ছিল।

এই তরুগুল্ম সমাচ্ছন্ন পরগণাটি কাহার যত্ন ও পরিশ্রমে সুন্দর শস্য শ্যামল সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে? কে "তাগাবি" আখ্যাবিশিষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া এই "বিরলমনুষ্য বসতি" পরগণাকে লোকালয়ে পরিপূর্ণ করিয়াছে? প্রাচীন সনন্দাদি দর্শনে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, তালুকদার ও লাখেরাজদারগণ বহু অর্থ ব্যয় ও শরীরের রক্ত জল করিয়া পরগণে নুরনগরের আবাদ উন্নতি করিয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও "তাগাবি" দিয়া প্রজা বসত করাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যৎকালে রোসনাবাদ কোম্পানী বাহাদুরের খাসে ছিল, সেই সময় কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই পরগণার আবাদের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আইন আকবরীতে বাঙ্গালার যে ওয়াসীল তুমর জমা সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতে এই পরগণার নাম লিখিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের অধিকারের

পূর্ব্বে এই পরগণা মুসলমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে বর্ণীত হইয়াছে যে, তৎকালে এই পরগণা "হিউং, বিউং ও কৈলারগড়" এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

১০০৯ হইতে ১০৩৫ ত্রিপুরাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে মোগলগণ ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করেন। মোগলদিগের অধিকৃত প্রদেশ "সরকার উদয়পুর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সরকার উদয়পুর ৪টি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন মোগল শাসনকর্ত্তা হিউং, বিউং, ও কৈলারগড় নামক প্রদেশত্রয়কে সম্মীলিত করত স্বীয় নামানুসারে "নুরনগর" পরগণা গঠন করেন। তৎকালে নুরনগরের অধিকাংশ ভূমি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য মোগল শাসনকর্ত্তা নুরুল্লা খাঁ (বা নুরুল্লাবেগ) তালুকদারি প্রথা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক নুরনগরের আবাদ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নুরুল্লা খাঁ কায়স্থ রামধর (প্রকাশ্য কায়েত রামধর) কে নুরনগরের চৌধুরীর পদে নিযুক্ত করেন।* প্রাচীনকালে চৌধুরিগণ স্বীয় পদের বৃত্তিস্বরূপ নান্‌কার প্রাপ্ত হইতেন। তদনুসারে তিনি নান্‌কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকগুলি স্থান তিনি তালুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য

* প্রাচীনকালে প্রত্যেক পরগণায় এক একজন চৌধুরী নিযুক্ত করা হইত। সেই পরগণার শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব সরবরাহ করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল।

স্থান বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে তালুকরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। * সেই সকল তালুকদার হইতে রাজস্ব আদায় পূর্ব্বক রাজকীয় ধনাগারে অর্পণ করা রামধরের প্রধান কার্য্য ছিল।

উল্লিখিত ঘটনার পর মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নুরনগরের তালুকদারগণ সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু নুরনগর পরগণার মধ্যে তিনি তাম্রশাসন দ্বারা নিষ্কর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল শাসনপত্র পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে, এই বনাকীর্ণ পরগণায় আর্য্য উপনিবেশ সংস্থাপনই তাঁহার প্রধান অভিপ্রায় ছিল।

১৫৭৩ শকাব্দের ১৪ই মাঘের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বাউরখাড় গ্রামের জঙ্গলাবৃত স্থানে ৭ দ্রোণ ভূমি মুকুন্দ-বিদ্যাবাগীশকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রাঢ়দেশবাসী ছিলেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে স্বীয় অধিকার মধ্যে সংস্থাপন করিবার জন্য নুর-নগরের অন্তর্গত বাউরখাড় গ্রামে এই নিষ্কর প্রদান করেন।

* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারদিগকে স্থানীয় মানবগণ ভূঁইয়া (ভৌমিক) বলিত। নুরনগর পরগণায় হিন্দু মুসলমান অনেক ভূঁইয়া বংশ বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির তালুক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্ব স্ব সমাজে সম্মানিত।

তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পুরুষ অদ্যাপি সেই গ্রামে বাস করিয়া, পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেছেন।

উল্লিখিত শাসনপত্রের প্রায় তিন মাস অন্তে মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য রতিদেব চক্রবর্ত্তী নামক অন্য একজন ব্রাহ্মণকে তগাবায়েক গ্রামে ৩৪৷৹ দ্রোণ জঙ্গলাবৃত ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করেন।

নুরনগর পরগণা যে তৎকালে কিরূপ অবস্থাপন্ন ছিল তাহা এই সকল সনন্দ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কল্যাণমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের অনেকগুলি তাম্রশাসন আমরা দর্শন করিয়াছি। গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসনগুলির অপর পৃষ্ঠে তাঁহার উজির "শ্রীবিশ্বাস নারায়ণের" নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন নুরনগর অপেক্ষা মেহেরকুল পরগণায় অধিক পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গোবিন্দ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ রামমাণিক্যের ১০৯৩ ত্রিপুরাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠের * একখণ্ড সনন্দের প্রতি-লিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীসংগ্রাম নারায়ন চৌধুরী" কে মুনিঅন্ধ গ্রামে ৫১ দ্রোণ ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হইল।

* রামমাণিক্যের মৃত্যুকাল ১০৯২ না হইয়া ১০৯৩ ত্রিপুরাব্দ হইবে।

রামমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ রত্নমাণিক্যের অনেকগুলি সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। এই সকল সনন্দ দ্বারা নুরনগরের তালুক সমূহের ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে। একখণ্ড জীর্ণ সনন্দের প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। (এই সনন্দের কথা ৯৭ এবং ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে।)

.........ত্ন মাণিক্য দেব বিষম সমরবিজয়ী রাজনামা......... শ্রীকারকোণবর্গে বিরাজতে হন্যাৎ ....রাজধানী হস্তিনা ....র উদয়পুর নুরনগর পরগণার জমিদার, মজুমদার, তালুকদার রায়তবর্গে ভূমি আবাদ ক.........পাট্টা দিলাম, এহার প্রতি বৎসর এক দস্তর, খোদকাস্ত আমনা দ্রোণ ভূমি ৬ ছয় তঙ্কা, পাইকাস্তা আম......... ৪ চাইর তঙ্কা, ফসলী দ্রোণভূমি ২ দুই তঙ্কা, ভূমি আবাদ হইলে এই দস্তরে জমাবন্দী করিয়া রাজস্ব ....দি বার নাহয়; পরম সন্তোষে ভূমি আবাদ করিয়া রাজস্ব গণিয়া ভোগ করুক, কিন্তু ভেট......... র্চা পরুক পর...গার মুদামদু মহাফীক দিবাএ, আর কোন দিন কার্য্যো ......ক্তি হেনে মাগন করি ....বাদ দুই ....র মাস যে ...... ইতি শকাব্দা ১৬১৮ তারিখ ১১ বৈশাখ সন ১১০৫ ....।*

* এই সনন্দের কমা, সিমিকোলন ও দাঁড়ি ইত্যাদি ছেদ চিহ্ন আমাদের প্রদত্ত।

তৎকালে জঙ্গলা ভূমি আবাদ করিয়া তালুকের উন্নতি করা নিতান্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। ত্রিপুরার রাজ-সরকারি আবাদি তালুক সমূহের যেসমস্ত প্রাচীন পাট্টা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিতেই প্রায় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিত আছে ঃ—"এই চৌহদ্দি মধ্যে খিলা ও বটখিলা ও জঙ্গলা, কুদালকোপ ও কুড়ালকোপ দোরবস্ত জমি বাড়ী আবাদ করিবার তোমারে তালুকদারি পাট্টা দেওয়া গেল।"* এই ভয়ানক কাণ্ড কারখানা করিয়া তালুক আবাদ করিতে যাইয়া কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত। ইহাকে ভং (ভঙ্গ) দেওয়া বলিত। এইরূপ অবস্থায় ফেরারী তালুক অন্য তালুকদারকে "গছাইয়া" দেওয়া হইত। এই "ভঙ্গ" ও "গছানীর" সংবাদ আমরা বাল্যকাল হইতে লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি মহারাজ রত্নমাণিক্য ও তৎপরবর্ত্তী নরপতিগণের কতকগুলি সনন্দে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এবম্প্রকার অবস্থায় কোন তালুকদার "ভং" দিলে যদি তাহার তালুক অল্পকাল মধ্যে বিশেষ লভ্যজনক হইবে, এরূপ

* পং বগাসাইরের অন্তর্গত "দেওয়ানের চকবস্তা" নামক বৃহৎ তালুকের ১২০৫ ত্রিপুরাব্দের ১লা বৈশাখের পাট্টার সহি-মোহরাঙ্কিত নকল হইতে এই সকল কথা উদ্ধৃত হইল।

বিবেচনা হইত তবে মহারাজ তাহা "নিজতালুক" করিয়া লইতেন।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরে বাঙ্গালার নবাব ত্রিপুরার সমতলক্ষেত্র অধিকার করত তাহাতে মোগল জমিদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।* মুরাদবেগ নামক এক ব্যক্তি (বোধ হয় বলদাখালের জমিদারবংশীয়) পরগণে নুরনগর প্রাপ্ত হন। তিনি নুরনগরের নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ইহাকে "মুরাদনগর" আখ্যা প্রদান করেন। তৎপ্রদত্ত একখণ্ড তালুকদারী পাট্টা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

স্বস্তি :— শ্রীলশ্রীযুক্ত মির্জ্জা মুরাদ বেগ……….আনাং শ্রীকারকোণবর্গে সমাজ্ঞেয়ং……পরং মুদাফত নুরনগর (হাল) মুরাদনগর ডিহি কুকি হা…মৌজে সুলতানপুর ও নওয়ামুড়া অজঙ্গল আবাদ করাইবার পাট্টা শ্রীমধুসূদনকে দিলাম পুত্র পৌত্র তার পুরুষানু ক্রোণপ্রতি শিক্কা ৪ চারি রূপাইয়া দিবা এই জমিন আবাদকারি ও খানেবাড়ীর ভোগ স্বত্ব অজঙ্গলী মুরাদনগরের দস্তুর পাইবা আমি ও তৌজি মাফিক পাইব ইতি ১১২৩ † তারিখ ১ কার্ত্তিক।

---

* Dharma Manik succeeded. The Nawab of Murshidabad having deprived him of a large portion of territory on the plains, locating Mogul zemindars in them. (*J. A. S. B. Vol. XIX. p. 553.*)

† ১১২৩ বঙ্গাব্দ ১১২৬ ত্রিপুরাব্দ।

এই সনন্দোক্ত সুলতানপুর অধুনা রুঠী আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত কাগজে ইহাকে "রুঠী ওরফে সুলতানপুর" লেখা হয়। এই মধুসূদন রুঠীর বিখ্যাত গুপ্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ, মধুসূদনের উক্ত তালুক অধুনা "তালুক রাজেন্দ্রগুপ্ত" বলিয়া আখ্যাত হয়। রাজেন্দ্রের অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষগণ এক্ষণ সেই তালুক ভোগ করিতেছেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য মোগলদিগকে জয় করিয়াছিলেন। তৎপর নবাব ত্রিপুরেশ্বর সহিত সন্ধি করিলেন। সেই সন্ধি দ্বারা নুরনগরের তালুক সমুহের জমা পঁচিশহাজার টাকা মহারাজ নবাবকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।* দিল্লীর সম্রাট এই সংবাদ শ্রবণ করত নুরনগরের রাজস্ব পঁচিশ হাজার টাকা সামরিক জায়গীর উল্লেখে বাদ দিয়াছিলেন।

* এই ঘটনাটি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারীর একখণ্ড নিষ্পত্তিপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "জাহাঙ্গীর নগর সহরে চৌধুরীয়ান (নুরনগরের) খাজানা সরবরাহ করাইতেন। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের আমলে অনন্ত, মধুসূদন চৌধুরী খাজানা বাকী রাখিয়াছিল, রাজা গোবিন্দমাণিক্য বাকী খাজানা আপন জিম্বা রাখিয়া পরগণা মজকুর আপন এলাকাতে আনিয়াছিল।" রাজকীয় বংশাবলীর সহিত ধর চৌধুরী দিগের বংশাবলী ঐক্য করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এস্থলে গোবিন্দমাণিক্য না হইয়া ধর্ম্মমাণিক্য হইবে।* কারণ অনন্ত

সুরনগরের তালুকদারগণ চিরকাল শাস্ত্রবিদ্যা অপেক্ষা শস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগী এবং এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী সরাইলের ভদ্রলোকদিগের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। প্রাচীন কথা উল্লেখের পূর্ব্বে বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাঁহারা যে কয়েকটী কাণ্ড করিয়াছেন তাহার ২।১টী এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

১। ভৈরব বাজারের বিখ্যাত দাঙ্গা একটী ছোট খাট যুদ্ধ বিশেষ। ইহাতে বিটঘরের দেওয়ান পরিবার নর রুধিরে মেঘনার শ্যামসলিল লোহিত করিয়া মুক্তাগাছার জমিদার বাবু ভবানীকিশোর আচার্য্য চৌধুরীকে কিরূপ লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ করিলে অদ্যাপি শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

২। ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ওয়াইজ সাহেব মুক্তাগাছার জমিদার বাবু ভবানীকিশোর আচার্য্যের সহিত একটি জমিদারির অধিকার লইয়া ভয়ানক দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য মহাশয় নিরুপায় হইয়া সুরনগরের তালুকদারগণ নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সুরনগরের লাঠিয়ালগণ দলে দলে যাইয়া আচার্য্য মহাশয়ের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক সাহেবের লাঠীয়ালদিগকে পরাজিত করিল। সাহেব এই সংবাদ

ও মধুসূদন কায়েত রামধরের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইহারা কথনই কল্যাণ মাণিক্যের পুত্রের সমসাময়িক হইতে পারেননা।

অবগত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে লিখিলেন, "মহারাজ! রক্ষা করুন, নুরনগরের তালুকদারগণ আমার সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।" তদনুসারে মহারাজ নুরনগরের প্রধান প্রধান তালুকদারকে লিখিলেন, "তোমাদের লোকদিগকে মুক্তাগাছা হইতে ফিরাইয়া আন, আর কাহাকেও তথায় যাইতে দিওনা।"*

৩। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরও একদিন নুরনগরের তালুকদার নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। †

অধুনা যদিচ তালুকদারগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু ব্রিটীসশাসিত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে যাঁহারা এরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে অনুমিত হইবে।

মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্যের একখণ্ড সনন্দের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার আত্মহত্যার পর রাজবংশে ভীষণ আত্মকলহ উপস্থিত হয়। ইন্দ্রমাণিক্য ও জয়মাণিক্য রাজসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য নররুধিরে ত্রিপুরা রঞ্জিত

---

* মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের "শ্রীরামাজ্ঞা" মোহরাঙ্কিত এরূপ দুই খানি চিঠি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

† হুগাঙ্গির কথাটা বোধ হয় মহারাজ বিস্মৃত হন নাই।

করিতে লাগিলেন। নূরনগরের পরাক্রমশালী তালুকদারগণ ইন্দ্রমাণিক্যের পক্ষ অবলম্বন করেন। মেহেরকুলের তালুকদার হরিনারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি জয়মাণিক্যের সহায় হইয়াছিলেন। ভীষণ যুদ্ধে জয়মাণিক্যকে জয় করিয়া ইন্দ্রমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করেন। জয়মাণিক্যের পতনের সহিত মেহেরকুলের তালুকদারবর্গের অধঃপতন সংসাধিত হয়। নুরনগরের তালুকদারগণের কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইন্দ্রমাণিক্য তাঁহাদিগকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।*

স্বস্তি :— শ্রীশ্রীযুক্ত ইন্দ্রমাণিক্য দেব নিষম সমরবিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানামাদেশোয়ং শ্রীকারকোণবর্গে বিরাজন্তে ইন্যাৎ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে নুরনগরের চৌধুরিয়ান ও নেওগিয়ান ও তালুকদারগণের জঙ্গলবুড়ি মৌরসী নবাবের সেরেস্তার আগত তালুক পরগণা মজকুরের জমা কিরানী (মিলানী) মতে দিতেছে এইক্ষণ চলেনা দরখাস্ত করিল অতএব বত্রিশ অঙ্গুষ্ঠ ডাঙ্গের সতর ডাঙ্গের নলে হাসীলা জমি জরিপ হইয়া সাবেক দস্তুর খানেবাড়ী আবাদী-মিনা কি দ্রোণ ৶৫ তিন কাণি ষোল কড়া বাদে মহাফিক আর নিরেখ মতে বাকীজমি জমাবন্দি হইয়া দশোত্তরা ও

*১৮৪১ খৃষ্টাব্দের একখণ্ড সহিমোহরাঙ্কিত নকল হইতে

সরঞ্জামি সুদামদ মাহাফিক বাদে বাকি জমা লওয়ার জন্য পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই সকল দফার অন্যথা না হইব এবং তাহারগ বিনা দরখাস্তে জরিপনা হইব ইতি সন ১১৫৩ তারিখ ৭ আশ্বিন

আসামী	ফি দ্রোণ	নিরেখ।
বসতবাটী	১	১৬
ইক্ষু	০	৩২
বরজ	০	৩২
চাড়া	০	৪
দেশকুল আমুনা	০	৬
কশলী	০	৩
পারকুল আমুনা	০	৪
পারকুল কশলী	০	২
বরো	০	২
চীনা	০	১
		১০

দশরকম

সনন্দ সমূহ পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, ব্রিটীশাধিকারের পূর্ব্বে নূরনগরের তালুকগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১—মকররী জমার ; ২—নিরেখ মকররী।

মকররী জমার তালুক :— ত্রিপুরেশ্বরগণ স্বীয় প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রায় এই প্রকার তালুক প্রদান করিতেন না। মকররী জমার তালুক প্রায়ই নিজ তালুক হইতে দেওয়া হইত। এই শ্রেণীর তালুকের সংখ্যা অতি অল্প।

নিরেখ মকররী তালুক :— "জঙ্গলবুড়ি" অর্থাৎ "কোদাল কোপ" ও "কুড়ালকোপ" ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা বন জঙ্গল পরিষ্কার করত "তাগাবী" দ্বারা প্রজা বসত করাইয়া এই সকল তালুক গঠিত হইয়াছিল। তালুকের ভূমি আবাদ হইলে রাজসরকারী নির্দ্দিষ্ট নলে তাহা জরিপ হইত। আবাদি ভূমির একপঞ্চমাংশ (দ্রোণপ্রতি ৫/৪ গণ্ডা) মহন, জীবিকা বা আবাদিমিনা উল্লেখে তালুকদারগণ নিষ্কর প্রাপ্ত হইতেন। অবশিষ্ট চারিপঞ্চমাংশ আবাদি ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত নিরেখে ধার্য্য করা হইত। এইরূপে জমাবন্দী করিয়া তালুকদার মালিকানা স্বরূপ শতকরা দশটাকা ও তহশীল খরচ বাদ পাইতেন। অবশিষ্ট রাজস্ব অবধারিত হইত। এই নিয়মে তালুকদারদিগের চারি প্রকার লভ্য ছিল।

১— রাজসরকার হইতে যে নলে ভূমি পরিমাপ হইত। তালুকদারগণ তদপেক্ষা ছোট নলে প্রজা পত্তন করিতেন।

২—আবাদিমিনা বা মতন বা জীবিকা দ্বারা একপঞ্চমাংশ লভ্য ছিল।*

৩—তালুকদারদিগের জন্য রাজসরকার হইতে যে নিরেখ অবধারিত ছিল, তালুকদারগণ তদতিরিক্ত নিরেখে প্রজার নিকট ভূমি পত্তন করিতেন।

৪—এই সকল বাদে অবশিষ্ট মোট স্থিত হইতে তাহারা নির্দ্ধারিত মালিকানা ও তহশীল খরচ প্রাপ্ত হইতেন।

এই নিয়মে কোন তালুকের ভূমি ভাগ করিতে হইলে দ্রোণ প্রতি ।৶৬।/ ক্রান্ত তালুকদারের প্রাপ্য এবং

* যমুনা দেবী নামীয় (তালুক রামজয় ঠাকুরের) ১২৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই আষাঢ়ের পাট্টায় এরূপ আবাদিমিনা দ্রোণ প্রতি ৶৪ গণ্ডার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দেওয়ানের চকবস্তা প্রভৃতি অন্যান্য তালুকের পাট্টাতে আবাদিমিনার কথা লিখিত আছে। অদ্যাপি ত্রিপুরেশ্বর তাঁহার পার্ব্বত্য রাজ্যে যে-সকল জঙ্গল আবাদি তালুক প্রদান করিতেছেন, তাহার পাট্টাতে আবাদি মিনা দ্রোণ প্রতি ৶৪ গণ্ডার উল্লেখ রহিয়াছে (বিরং দফার দেবপ্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতির নামীয় বড় বিলনীয়ার আবাদী তালুকের ১২৮০ ত্রিপুরারাব্দের ১৩ই কার্ত্তিকের পাট্টা দ্রষ্টব্য) এই শ্রেণীর তালুকদারগণ নওয়াখালীতেও এই নিয়মে "মথন" বাদ পাইয়া থাকেন। (*Hunter's Statistical Account of Bengal Vol VI. p. 308.*)

।১৩।/ ক্রান্ত জমিদারের প্রাপ্য অবধারিত হয়। * তদনুসারে ভূমির উপস্বত্ব জমিদার ও তালুকদার মধ্যে ভাগ করিতে হইলে, শতটাকায় ৭০৸/৪ পাই তালুকদারের প্রাপ্য এবং ২৯৵৮ পাই জমিদারের প্রাপ্য অবধারিত হয়। † তদতিরিক্ত নিরেখ মকররীর জন্য তালুকদারগণের আরও কিছু লভ্য ছিল।

---

*১। তালুকদারের প্রাপ্য আবাদিন্দিনা বা মথন ... ৵৪
২। তালুকদারের মালিকানা ও তহশীল খরচ পঞ্চমাংশ ৵৪
৩। তালুকদারী নল ও প্রজা পত্তনী নলের প্রভেদে
কাণী প্রতি ৻৶// হিসাব দ্রোণ প্রতি * ... ।১৮॥//

॥৵৩॥//

জমিদারের প্রাপ্য অবশিষ্ট ... ... ।১৩।/

১৲ দ্রোণ

† নওয়াখালীর অন্তর্গত চরপার্ব্বতীর সেটেলমেণ্ট আফিসার পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুকে জমা নির্ণয় করিতে যাইয়া শত টাকায় ৭০৲ টাকা তালুকদারের প্রাপ্য এবং ৩০৲ টাকা জমিদারের প্রাপ্য অবধারণ করিয়াছেন। See the Decision of Babu Suresh Chandra Sinha, Dy. Collector of Noakhali in Char-Parbati Settlement Cases, 3rd November, 1894.

---

*তালুকদার ও প্রজার মধ্যে এইরূপ নলের প্রভেদ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেখুন ;—

১। ১৮৭৫ ইং ৩ নং আপীল। জিলে ত্রিপুরার জজ সাহেবের ১৮৭৬ ইং ৩১ শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি। মহারাজ

ব্রিটীসাধিকারের পর যৎকালে রোসনাবাদ ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষগণের শাসনাধীনে ছিল, তৎকালে ইজারাদারি প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারির পত্রে বোর্ড ইজারা বিলীর জন্য রেসিডেণ্টকে অনুমতি করেন। তদনুসারে কখন বা খণ্ডাকারে কখন বা সমগ্র পরগণা এক ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হইত।

রেসিডেণ্টগণের শাসনকালে চাকলে রোসনাবাদের জরিপ হইয়াছিল। এরূপ জরিপ কতবার হইয়াছে তাহা স্থিরভাবে বর্ণনা করা সুকঠিন। দেশের তদানীন্তন অবস্থা অনুসারে বিশুদ্ধ জরিপ নিতান্ত অসম্ভব ছিল। জরিপের দ্বারা যে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাও পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছেনা।

রেসিডেণ্ট সাহেবগণ নুরনগরের আবাদ উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। মনোহর রায়, রামশরণ সেন প্রভৃতি ইজারাদার নামীয় আমলদারির সহি-মোহরাঙ্কিত নকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, "চৌধরিয়ান, নেওগীয়ান ও তালুকদারান*

বীরচন্দ্র মাণিক্য আপীলাণ্ট। ভগবানচন্দ্র ধর গং রেস্পোণ্ডেণ্ট।

২। ৫০৬ নং ১৮৭১ ইং। কসবার মুন্সেফের ১৮৭২ ইং ৩১ শে ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাদী। হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গয়রহ বিবাদী।

*এইরূপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রভৃতিকে "খাতির জমা দিলাসা ও ছল্লি করিয়া" "জমিন আবাদ তরদ্দুদ করাহ"। যেসকল তালুকদার আবাদের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, তাহাদিগকে রেসিডেণ্ট সাহেবগণ নিষ্কর প্রদান পূর্ব্বক উৎসাহিত করিয়াছেন।*

ভূমি আবাদের জন্যই কোম্পানী বাহাদুর সায়রাত জমা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা একটি বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ও কৌতুকাবহ যে, সায়রাত জমা রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আবাদের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন তালুকদারগণ, কিন্তু লভ্যের ভাগী হইলেন মহারাজ বাহাদুর।

ইজারাদারগণের নামীয় আমলদারিতে প্রকাশ যে, জরিপ জমাবন্দী দ্বারা যে জমা ধার্য্য হইত, ইজারাদারগণ তদনুসারে রাজস্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন। অতিরিক্ত হাসিলা জমির জন্য লিখিত হইয়াছে যে, "যে জমিন হাসিলা পাও তাহার নিরেখ পাট্টা বহাল রাখিয়া খাজানা লইবা।"

বুলার সাহেবের জমাবন্দীর পর যৎকালে মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত ৮ সন মেয়াদে চাকলে রোসনাবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তৎকালে যে আদেশপত্র প্রচারিত হয় তাহার একখণ্ড সহিমোহরাঙ্কিত নকল আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে:—

*দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিটঘর নিবাসী গঙ্গাপ্রসাদ নিয়োগীর নামীয় নিষ্কর-সনন্দের কথা উল্লেখ করিতে পারি।

"চাকলে রোসনাবাদ ঃ—

রাজা রাজধরমাণিক্যের দেওয়ান কালীচরণকে হুকুম হইল যে, মেঃ জন বোলহর সাহেব মফস্বল চাকলা মজকুরের যেমতরূপ নিরিখবন্ধী মোকরর করিয়াছে এক্ষণে ইজারাদার সেই মাফিক রাইয়ত গয়রহ স্থানে খাজানা উশুল তহশীল করিবেক কিছু বেশী লইবেক না। কেননা এমসনে ৮ সনা বন্দোবস্তে রাজার সহিত কিছু বেশী বন্দোবস্ত হয় নাই।"

১১৯৭ বঙ্গাব্দে (১২০০ ত্রিপুরাব্দে) মনোহর রায়কে বার্ষিক ২১০০১ টাকা শিক্কা জমায় পরগণে নুরনগর ইজারা দেওয়া হইয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার তালুক জমিদারী হইতে খারিজ করিয়া লর্ডকর্ণওয়ালিস তালুকদারগণ সহিত তাহাদের মহাল বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারির মিনিটে তাহা ঘোষণা করা হয়। নুরনগরের অল্প কয়েকজন তালুকদার খারিজের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। অধিকাংশ তালুকদার আশু লভ্যজনক প্রলোভনে বাধ্য হইয়া কেবল যে খারিজের প্রার্থনা করেন নাই এমত নহে, যাঁহারা খারিজের প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করত মহারাজ রাজধর মাণিক্যের কৃপাভিখারী হইয়াছিলেন। বুলার সাহেব তালুকদারগণের আচরণে বিরক্ত হইয়া রিপোর্ট করেন

যে, "চাকলে রোসনাবাদের উত্তরভাগে খারিজের উপযুক্ত কোন তালুক নাই।"* সুতরাং নুরনগরের হতভাগ্য তালুদারগণের অদৃষ্টে খারিজ হওয়া ঘটিল না। সমগ্র চাকলে রোসনাবাদ মহারাজ রাজধর মাণিক্যের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। উক্ত বন্দোবস্তে নুরনগরের রাজস্ব ১৮৯৩৯৷৷০ টাকা নির্ণীত হয়।

যে সকল তালুকদার খারিজের প্রার্থী ছিলেন। তন্মধ্যে রামমোহন দাস নামক জনৈক তালুকদার খারিজের জন্য মহারাজ রাজধর মাণিক্যের নামে রীতিমত মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। দেশময় এইরূপ প্রবাদ আছে যে, রামমোহনের সাক্ষীগণ রাজসরকার হইতে নিষ্কর ভূমি ও অন্যান্য প্রকার ধন সম্পত্তি লাভ করত রামমোহনের প্রতিকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষী-দিগের মধ্যে কায়েত রামধরের কুলতিলক শ্যামসুন্দর ধর চৌধুরী, থাণ্ডব ঘোষের বংশাবতংশ কৃষ্ণকান্ত ঘোষ মজুমদার এবং লেশীয়ারার দাস বংশজাত চণ্ডীপ্রসাদ মজুমদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। নুরনগরের জনৈক গ্রাম্য কবির গীতিতে ইহাদের নাম এখনও শুনিতে পাওয়া যায়।† যাহা-

---

* *Letter from Mr. J. Buller. To The Collector of Tipperah. 13th January 1793.*

† সেই গ্রাম্য কবির গীতাংশ, যাহা অদ্যাপি নুরনগরবাসী

হউক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি জিলা কোর্ট রামমোহনের মোকদ্দমা তাঁহার প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করেন। তদনন্তর তিনি (ঢাকা) প্রবিনসিয়েল্ কোর্টে আপীল করিলেন। আপীল আদালত ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন নিম্ন আদালতের হুকুম স্থির রাখেন।

বুলার সাহেবের প্রোক্ত চিঠি এবং রামমোহন দাসের মোকদ্দমার জিলা কোর্ট ও প্রবিনসিয়েল কোর্টের নিষ্পত্তি দ্বারা নুরনগর পরগণার জমিদার ও তালুকদারের মধ্যে অনন্ত কলহের বীজ রোপিত হইল। মহারাজ ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভাবিলেন নুরনগরের তালুক রক্ষা করা না করা তাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন। বিদ্যাকুটের বলরাম বর্ম্মণ রামমোহন দাসের সাহায্যকারী ছিলেন। সুতরাং মহারাজ রাজধরের ক্রোধাগ্নি প্রথমত বর্ম্মণ মহাশয়কে ভস্মীভূত করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইল। মহারাজ বলক্রমে তাঁহার তালুক অধিকার করিলেন। বিচার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করত তাহার পুত্রগণ সেই তালুক পুন প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী

দিগের নিকট শ্রুত হওয়া যায়, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।
("কিৰ্ত্তির্যস্য স জীবতি।")

শ্যামা ধরা লক্ষ্মী ছাড়া। কৃষ্ণকান্ত ভাতে মরা॥
চণ্ডীপ্রসাদ অতি বুড়া। তিনজনাতে মিছিল থারা॥
** * সাক্ষী দিয়ে তারা। কল্লে মোদের দফা সারা॥

ব্যাপী মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহন করিয়া তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। এস্থলে আমরা সেই মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করিব।

বলরাম বর্ম্মণ প্রথমত মোকদ্দমা আরম্ভ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রত্রয় রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও রাজকৃষ্ণ সেই মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত হন। বলরামের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের সময়ে এই মোকদ্দমা শেষ হয়। প্রথম আদালত বর্ম্মণ বাদীগণের মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন, আপীলে ঢাকা প্রবিনসিয়েল কোর্ট ১৮১৭ খৃঃ ১৮ই এপ্রেলের নিষ্পত্তি দ্বারা তাঁহারা তালুকটি ডিক্রী প্রাপ্ত হন এবং এরূপ অবধারিত হয় যে, এই তালুকের জমা নুরনগর পরগণার প্রথানুসারে অন্যান্য তালুকের ন্যায় ধার্য্য হইবে। এই তালুকের পূর্ব্ব জমা ৫৯০৲ টাকা ছিল। তালুকদারগণ তাহাই প্রদান করিতে স্বীকৃত ছিলেন। মহারাজের পক্ষে বার্ষিক ১৭৭২৷৶০ আনা খাজানা পাওয়ার প্রার্থনা হইয়াছিল। এই তর্ক মীমাংসার জন্য উক্ত মোকদ্দমা প্রায় ৩২ বৎসর কাল, ত্রিপুরা জেলাকোর্ট, ঢাকা প্রবিনসিয়েল কোর্ট, মুরসিদাবাদ প্রবিনসিয়েল কোর্ট এবং কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতে বারংবার যাতায়াত করিয়াছে। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চ পার্শ্ববর্ত্তী কয়টি তালুকের জমার সহিত "হারাহারি" মতে ৭৪৫৵৮৶/১০ রক্তি শিক্কা অবধারিত হইয়াছিল।*

* ৩১ নং মকদ্দমা সন ১৮৪৮ ইং। ত্রিপুরার জজ মেঃ টমাস

পরিবর্ত্তনশীল জমার তালুকের রাজস্ব অন্যান্য তালুকের সহিত হরাহারি মতে অবধারণ করার প্রথা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রিবিকাউন্সেল ও কলিকাতা হাই-কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ বারংবার এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। *

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নুরনগরের দরইজারাদার, কাইতলা নিবাসী মাণিক্যরাম বর্দ্ধন (প্রকাশ্য বেচুরায়) নামে তাঁহার তালুকের জমা বৃদ্ধির প্রার্থনা করেন; পূর্ব্বে এই তালুকের জমা ৬৩৷৷০ আনা ছিল, দরইজারাদার তালুকের তদানীন্তন স্থিত অনুসারে ৩৫৩৯৫ টাকা বার্ষিক কর ধার্য্যের প্রার্থনা করেন। কিন্তু জেলা ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ উইলিয়ম মার্টিন সাহেব ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর, দরইজারাদারের পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত জমা নুরনগরের তালুক সমূহের উপর হারাহারি করিয়া তদনুপাতে ইজাফা ধার্য্য করত ৮১০ টাকা উক্ত তালুকের বার্ষিক জমা অবধারণ করেন। † এই

ক্রন সাহেবের ১৮৪৯ ইং ২৭ শে মার্চের নিষ্পত্তি (রোবকারি)।
হরসুন্দরী জওজে নীলকণ্ঠ বর্ম্মণ মতোফা ... মজহরা
মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ... তরফছানী

* *Weekly Reporter. Vol. VII. p. 285 ;*
Vol. IX. P. C. p. 3 ; Vol. XIX. p. 142.

† ৩৯৬৬ নং, নিষ্পত্তির তারিখ ১৮১২ ইং ১১ই সেপ্টেম্বর। রামসন্তোষ দে দরইজারাদার বাদী, মাণিক্যরাম বর্দ্ধন বিবাদী।

তালুকের মোট স্থিতের উপর অবধারিত রাজস্ব ভাগ করিলে প্রতীতি হইবে যে, মার্টিন সাহেবের উক্ত নিষ্পত্তি দ্বারা মোট স্থিতের প্রায় পঞ্চমাংশ জমিদারের প্রাপ্য নির্ণীত হইয়াছিল।

মহারাজ দুর্গামাণিক্য, রামগঙ্গা মাণিক্য ও কাশীচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে নুরনগরের তালুকদারগণের সহিত রাজসরকারের উল্লেখযোগ্য বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য সিংহাসন আরোহণ করিয়াই তালুকদারদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কর্মচারী রাজকিশোর দেওয়ান ও কমলাকান্ত বক্সী প্রভৃতির অত্যাচারকাহিনী যাহা আমরা বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রুত হইয়াছি তাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। *

এই সময়ে চারি প্রকার উপায়ে তালুকদারদিগকে জ্বালাতন করা হইয়াছিল। প্রথমত বন্দোবস্তের জন্য অত্যাচার, দ্বিতীয়ত বেবন্দোবস্তী তালুক সমূহে ক্রোক

* হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই ময়না, তোতা প্রভৃতি পক্ষী প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আগ্রহের সহিত সেই পাখীকে ইষ্টদেবতার নাম ("রাধা কৃষ্ণ" "শিবদুর্গা" প্রভৃতি শব্দ) উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু মহারাজ বাহাদুরের বন্দোবস্ত কর্মচারী কমলাকান্ত বক্সীর প্রতিপালিত ময়না শিক্ষা করিয়াছিল "কালিকা! জুতামার, জুতামার, জুতামার!"

সাজোয়াল (খাসতহশীলদার) নিযুক্ত করা, তৃতীয়—তাহুত বন্দোবস্ত, চতুর্থ—জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমা।

বন্দোবস্ত উপলক্ষে যে সকল অত্যাচার হইত, এক্ষণ তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ক্রোকসাজোয়ালগণ গরিব তালুকদার ও প্রজার প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিত। এক ব্যক্তির তালুক অন্য ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াকে তাহুত বলিত। *

এই সময় যে সকল জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে তালুক নন্দকুমার চৌধুরীর অধিকারিণী চন্দ্রকলা চৌধুরাণীর নামীয় † এবং তালুক গৌরীদাস

---

* এই তাহুত প্রথা দ্বারা সর্ব্বদা নররুধিরে ভূরনগর রঞ্জিত হইত, ত্রিপুরার তদানীন্তন জজ মেটকাফের একখণ্ড নিষ্পত্তিপত্র হইতে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :—

"Raj Chandra Biswas holds possession of a Talooq, his right to which dates prior to the Decennial Settlement. Nilcomal Bhattacharjea taking a Patta from the Moharaja of Tipperah which the *latter had no power to grant or the former to accept*, proceeds to oust him. This leads to *hot blood* and mutual aggression on each others Ryats."

† Appeal No. 6475: decided on 2nd August 1843. By the Judge of Tipperah.

ভট্টাচার্য্যের অধিকারী কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়বাগীশ * প্রভৃতির নামীয় মোকদ্দমা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয় মোকদ্দমায় বুলার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত (১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারির) চিঠি এবং রামমোহন দাসের মোকদ্দমার জেলা আদালতের ও প্রবিন্সিয়েল কোর্টের নিষ্পত্তিপত্র অবলম্বন করিয়া আদালত অবধারণ করেন যে, "নুরনগরের তালুক তকসিমী এবং তালুকদার কেবল দশোত্তরার মালিক।"

উল্লিখিত নিষ্পত্তিপত্র দ্বারা যে কেবল পরিবর্ত্তনশীল তালুকের স্বত্বাধিকারিগণ উৎপীড়িত হইতেছিলেন, এমত নহে, মকররী জমার তালুকগুলিকে বিনষ্ট করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারীগণ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলা চৌধুরাণীর নামীয় উক্ত মোকদ্দমায় ত্রিপুরার জজ স্কিপ্‌উইথ্ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে,"বিরোধীয় তালুক তকসিমী ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না, কারণ ইহা নুরনগর মধ্যে অবস্থিত।" কি চমৎকার সিদ্ধান্ত! নুরনগরের মধ্যে হইলেই তাহা তকসিমী তালুক হইবে।

* কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়বাগীশ এবং অন্যান্য আপীলাণ্ট, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রেস্পাডেণ্ট। সদর আমিন রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুরের ১৮৪০ ইং ২৩শে জানুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল। ত্রিপুরার জজ করিনিলিয়াস কার্ডো সাহেবের ১৮৪১ ইং ৩০শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব অবধারণ করিলেন যে,"অত্রস্থ পূর্ব্বতন বিচারপতিগণ যদিচ বুলার সাহেবের চিঠির প্রতি নির্ভর করিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; কিন্তু আমি এই চিঠিকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না।"* ফাউল সাহেবের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহারাজ কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন। মাননীয় বিচারপতি জষ্টীস জেকৃসন ও জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র অবধারণ করেন যে, বুলার সাহেবের চিঠি প্রমাণ সম্বন্ধে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।† এই সময় হইতে মহামান্য হাইকোর্ট ও জেলাকোর্ট দ্বারা চাকলে রোসনাবাদের উত্তর বিভাগের কতকগুলি তালুক মকররী ও অপরিবর্ত্তনশীল জমার সাব্যস্ত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মকররী তালুককে তকৃসিমী শ্রেণীতে আনয়ন করিবার জন্য মহারাজের কর্ম্মচারিগণ যে আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়জনক। কয়েকটি

---

* ২২৬ নং ১৮৬৯ ইং আপীল।
বীরচন্দ্র যুবরাজ আপীলাণ্ট, রামকিশোর দেব গং রেস্পাণ্ডেন্ট ত্রিপুরার জজ সাহেবের ১৮৭০ খৃঃ ২১ শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি।

† খাস আপিল ৯৮২ নং ১৮৭০ ইং। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ রামকিশোরদেব গং রেঃ। ১৮৭০ ইং ৫ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি।

মোকদ্দমায় বিবাদী পক্ষে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের মোহরাঙ্কিত চিঠি দাখিল হইয়াছিল। সেই চিঠি সম্বন্ধে মহারাজের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, ইহা চোরাই মোহর দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিচারাদালত অবশ্যই এরূপ উত্তরে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার জজ ফাউল সাহেব মহারাজের প্রতিকূলে ঐসকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। * হাইকোর্টের আপীলে মাননীয় বিচারপতি কেম্প ও পণ্টিফিক্‌স সাহেব ফাউল সাহেবের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়াছিলেন। †

দীর্ঘকাল যাবৎ ত্রিপুরেশ্বর লাখেরাজদার ও তালুকদারগণ সহিত মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছেন। অনেক মোকদ্দমায় বিবাদী পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজগণের মোহরাঙ্কিত চিঠি দাখিল হইতে দেখা গিয়াছে। আদালত যদিচ অধিকাংশ স্থলে এই সকল চিঠি সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন; কিন্তু একটি মোকদ্দমাতেও রাজসরকার হইতে কোন চিঠির সত্যতা স্বীকার করা হয় নাই। ‡

---

* ১, ২, ৩, ৪নং ১৮৭২ ইং আপীল। জাহ্নবী গং আঃ। বীরচন্দ্রমাণিক্য রেঃ। ১৮৭২ ইং ৩০শে ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি।

† খাস আপীল ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৮৩ নং ১৮৭৩ইং। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, রাধাচরণ লস্কর গং রেঃ। নিষ্পত্তির তারিখ ১৮৭৪ ইং ১২ ফেব্রুয়ারী।

‡ মহারাজের পক্ষে কেম্পবল সাহেব বাদী, শিবদাস

বর্ত্তমান মহারাজের রাজ্যাধিকার হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নুরনগরের তালুকদারগণের সহিত অনেকগুলি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। তাহার কতকগুলি মহারাজের * আর কতকগুলি তালুকদারগণের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছে। † আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণ আমরা বন্দোবস্ত ও ডৌল (কবুলিয়ত) ও চিঠি (পাট্টা) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কি প্রণালীতে জমা ধার্য্য হইত, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের সনন্দে ও রামমোহন দাসের মোকদ্দমার

চক্রবর্ত্তী নামীয় জাল মোহরের মোকদ্দমায় রাজসরকার পক্ষে বিশুদ্ধ মোহর প্রদর্শন জন্য যে সকল চিঠি দাখিল করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেটেলমেণ্ট আফিসার সমক্ষে রাজসরকার হইতে তাহাও কৃত্রিম বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

* যে সকল মোকদ্দমায় মহারাজ জয় লাভ করেন। সে গুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, ১—একতরফা ডিক্রি, ২—যোগসাজেসী ডিক্রি, ৩—বিতর্কিত ডিক্রি। যোগসাজেসী মোকদ্দমা গুলি ডিক্রি হওয়ার পরেই ডিক্রিপ্রাপ্ত জমা হইতে প্রচুর পরিমাণে বাদ দিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব জমায় রাজস্ব পরিশোধ হইতেছে।

† পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নিষ্পত্তিপত্রে তালুকদারের মালিকানা "দশোত্তরা" লিখিত হইয়াছে। এই দশোত্তরা শব্দের অর্থ যে শতকরা ১০ টাকা ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্ত্তী এবং ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী, তালুকদারের সহিত মহারাজের বন্দোবস্তী ডৌল ও চিঠি সমূহে দশোত্তরার পরিবর্ত্তে "দশহিস্যা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দশহিস্যা শব্দের সাধারণ অর্থ,—দশভাগ। এদেশে হিস্যা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা জমি জমার ভাগ করিতে হইলে ১৬ অংশে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং সর্ব্বসাধারণে "দশহিস্যা" শব্দের অর্থ ১৬ ভাগের ১০ ভাগ এরূপ বুঝিয়া থাকেন। *

দশোত্তরার পরিবর্ত্তে কেন দশহিস্যা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না, কিন্তু প্রাচীন

---

* কয়েকটি জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ দশ-হিস্যা শব্দের অর্থ শতকরা দশ টাকা করিয়াছেন। মহারাজ যেরূপ মকররী তালুককে তক্‌সিমী শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, সেইরূপ তক্‌সিমী তালুকের মালিক-গণও স্বস্ব তালুকের জমা বৃদ্ধির মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মকররী অবধারণ জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার তালুক পরিবর্ত্তনশীল জমার সাব্যস্ত হইলে কি নিয়মে জমা ধার্য্য হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন না। সুতরাং মহারাজের আরজি ও তৎপ্রদত্ত বাচনিক প্রমাণ দ্বারা দশহিস্যার অর্থ শতকরা দশ টাকা অবধারিত হইয়া থাকে।

তালুকদারগণ নিকট এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, রামমোহন দাসের খারিজের মোকদ্দমার সময় মহারাজ রাজধর মাণিক্য সমগ্র তালুকদারমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ফসলের পরিবর্ত্তন দ্বারা যৎকালে মকররী নিরেখের পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছিল, তৎকালে সহজ উপায়ে জমা হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপন জন্য মালিকানা দশহিস্যা ও তহশীল খরচ তালুকদারের প্রাপ্য বলিয়া ডৌলে লিখিত হইয়াছিল। এই নিয়মে শতটাকায় ৭২৷৷০টাকা তালুকদারের প্রাপ্য অবশিষ্ট ২৭৷৷০ টাকা জমিদারের প্রাপ্য হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে তালুকদারগণের দেয় রাজস্ব "দশোত্তরা" বা "দশহিস্যা" নিয়মে কদাকস্মিন্ কালে ধার্য্য হয় নাই। ১২১৫ ত্রিপুরাব্দ হইতে ১২৮১ ত্রিপুরাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নুরনগর তালুকের বন্দোবস্তী বহুসংখ্যক ডৌল ও পাট্টা আমরা দর্শন করিয়াছি। তাহার সমুদয় গুলিরই অভ্যন্তরে—"তালুক মজকুরের সেওয়ায় দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও খয়রাত ও খামার ও খানেবাড়ী হুজুরের বাহালি মিনাহায় তালুকদারি দশহিস্যা ও পাটওয়ারিয়ান তহশীল খরচ সেওয়ায় খারিজান মঙ্গ আগতীয়ান" ইত্যাদি * কতকগুলি বাঁধা বোল লিখিত আছে।

* ডৌল হইতে যে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সকলগুলি শব্দ সমভাবে সকল ডৌলে ব্যবহৃত হয় নাই।

কিন্তু তাহার নিম্নভাগে অর্থাৎ তপছিলে জমা ধার্য্যের স্থলে (মথন ও নলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) গুজাস্তা জমার উপর টাকা প্রতি ৻৫,৻১০ কিম্বা ⁄০ আনা ৶০ আনা ইজাফা ধরা হইয়াছে। কোন স্থলে গুজাস্তা জমার উপর মোটে (বিল-মোক্তা) কিছু ইজাফা বা কমি ধরা হইয়াছে, এই নিয়মে বন্দোবস্ত করার রীতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে চলিয়া আসিতেছে। জরিপ জমাবন্ধী দ্বারা তালুক সমূহের স্থিত অবগত হইয়াও রাজসরকার এই নিয়মের অন্যথা করেন নাই। ১২৮১ ত্রিপুরাব্দে যদিচ ভৌল পাট্টার ফারম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং "দশহিস্যা" শব্দ কর্ত্তন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে "স্থিতের দশাংশের একাংশ" লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তপছিলে জমা হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়নাই, তাহা পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিতেছে। *

---

* ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ত্রিপুরার সবজজ আদালতের ১৮৭৭ ইং ৩৫ নং মহারাজা বাহাদুর বাদী ও আকীকন্নেছা বিবাদীনীর মামীয় জমাবৃদ্ধির মোকদ্দমায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৬ অগ্রহায়ণের বাদী মহারাজের প্রদত্ত একখণ্ড দরখাস্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"উপরোক্ত নম্বরের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী সহিত রফামতে তালুক মজকুরের সাবেক জমা ১০৫৭০৲ টাকার উপর ফি টাকাতে ৶০ আনা হিসাবে ইজাফা ১৯৬৸৶ আনা ও বাট্টা গং বাবত ২০।৶৬ পাই একুনে মং ১৩৩৭৷৶৬পাই জমার ১২৮৭ সন হইতে ১১ সনা মেয়াদে

১২৭৪ ত্রিপুরাব্দ হইতে রাতিব (দেবার্চ্চন খরচ), গুদারা (খেয়াঘাটের খরচ) নৌকাভাড়া (তহশীল কর্ম্মচারীগণের যাতায়াতের খরচ) ও বাট্টা * প্রভৃতি আবওয়াব গুলি জমার সামিল ভুক্ত করা রেজেষ্টরীকৃত ডৌল সমূহে প্রকাশ পাইতেছে।

অধুনা রাজসরকার তালুকদারের সর্ব্বপ্রকার লভ্য বিনষ্ট করত মোট স্থিতের শতকরা ২০৲ টাকা তালুকদারের প্রাপ্য, অবশিষ্ট ৮০৲ টাকা মহারাজের প্রাপ্য অবধারণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। প্রবল ও দুর্ব্বলের সংঘর্ষে দুর্ব্বলের বিনাশ অনিবার্য্য। নুরনগর ও তদন্তর্গত পরগণা সমূহের

আমার সরকারে ডৌলকবুলিয়ত দাখিল করাতে বন্দোবস্তী চিঠি দেওয়া হইয়াছে।"

* টাকা প্রস্তুত হয় গবর্ণমেণ্টের টাকশালে, সেই টাকায় "কমওজন বাট্টা" নুরনগরের তালুকদারগণ ত্রিপুরার মহারাজকে পরিশোধ করিয়া থাকেন। কসবার সভায় বক্তৃতা কালে আমরা যখন বেআইনী আবওয়াবের কথা উল্লেখ করি, তৎকালে মহারাজের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন প্রচারের পর হইতে এই সকল আবওয়াব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ইহা স্মরণ করা উচিত ছিল যে, বচিয়ারা নিবাসী দয়াময়ী প্রভৃতির নামীয় ১২৯৮ ত্রিপুরাব্দের (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের) ২৭ শে ভাদ্রের বর্ত্তমান মহারাজের প্রদত্ত পাট্টাতেও "রাতিব, গুদারা, নৌকাভাড়া ৸৶" এবং "কমওজন বাট্টা ৶ আনা" স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

তালুকের সংখ্যা সার্দ্ধ দ্বিসহস্রের অধিক হইবে। অনন্ত মোকদ্দমার স্রোতে পড়িয়া যে অধিকাংশ তালুক বিনষ্ট হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

আগততালুক:—নুরনগরের মধ্যে তালুকদারগণের অধীনে যে সমস্ত তালুক আছে, তাহাকে "আগত-তালুক' বলে। প্রকৃতি অনুসারে ইহাকে দরতালুক বলা যাইতে পারে। রাজকর পরিশোধ সম্বন্ধে তালুকদারগণ তাঁহাদের মারফতদার মাত্র। আগত-তালুক শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেকে অনেক অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তৎসমস্ত সম্পূর্ণ সমীচীন নহে। "আগত" অর্থ আসিয়াছে, সুতরাং আসিয়াছে যে তালুক তাহাই আগত-তালুক। যে সময় নিয়মিত রূপে রাজকর পরিশোধ করা নিতান্ত কষ্টকর ছিল এবং কর আদায় জন্য রাজকর্ম্মচারীগণ দুর্ব্বল তালুকদারের প্রতি শারীরিক উৎপীড়ন করিতে ক্রটি করিতেন না। তৎকালে দুর্ব্বল তালুকদারগণ স্ব স্ব তালুক, প্রতিবেশী বলবান তালুকদারের তালুকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপে আগত তালুক গঠন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।*

* কতকগুলি আগত তালুকের ইতিহাস, আগত তালুক শব্দের অর্থ এবং নিম্নলিখিত নিষ্পত্তিপত্র দ্বারা আমাদের মত পোষণ করিতেছে। আপিলেট ডিক্রির বিরুদ্ধে

উত্তরকালে কোন তালুকের অংশ কিম্বা খণ্ড ভূমি ক্রেতাগণও আগত-তালুকদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নুরনগর পরগণার সমস্ত তালুক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। তালুকদারগণের বংশ বৃদ্ধি ও বিক্রয় দ্বারা অধিকাংশ তালুকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।১—একমাত্র কায়েৎ রামধরের তালুক দ্বারা, দর্পনারায়ণ চৌধুরী, রঘুনাথ চৌধুরী, নন্দকুমার চৌধুরী, কাশীনাথ চৌধুরী, রামশরণ চৌধুরী, রাজচন্দ্র চৌধুরী, কালীচরণ চৌধুরী, শিবচরণ চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, রামরতন চৌধুরী, শ্যামরায় চৌধুরী প্রভৃতি অনেক তালুক সৃষ্ট হইয়াছে। ২—মাইজখাড় গ্রামে চৈতন্য বল্লভ দাস নামে জনৈক "জঙ্গলবুড়ি" তালুকদার ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তাঁহার উত্তরপুরুষ কণ্ঠমণি সেই তালুকে স্বীয় নাম জারি করেন। তদনন্তর সেই কণ্ঠমণি তালুক হইতে হরিমণি, শিবরাম সাহা, অন্নপূর্ণা, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি অনেক তালুক সৃষ্ট হইয়াছে। অধুনা মূল তালুকের চতুর্থাংশ মাত্র কণ্ঠমণি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ৩—বিদ্যাকুটের জয়নারায়ণ শর্ম্মা তালুক হইতে বিখ্যাত

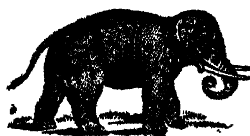
আপীল ৪৯০ নং ১৮৮০ ইং। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ। দীননাথ দাস গং রেঃ। হাইকোর্টের ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে এপ্রিলের নিষ্পত্তি।

মোহরী বংশের রামগোবিন্দ শর্ম্মা প্রভৃতি তালুক সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে।

দর তালুক ঃ— নিজ তালুকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তালুকদারদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে মহারাজ নিজ তালুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। এই সকল নিজ তালুক হইতে, ১২৮৮ ত্রিপুরাব্দ হইতে কতকগুলি দরতালুক দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত নজর গ্রহণে তালুক দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, ১২৮৮ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে নজর ডাক হইয়া রাশি রাশি টাকা আগরতলার রাজকোষে দাখিল হইয়াছিল। নজর দাখিল হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ বলিলেন, "আকর খননাদি প্রভৃতি অন্যান্য মূল স্বত্ব ব্যতীত কেবল মাত্র খেরাজি স্বত্ব দরতালুক উল্লেখে এবং তালুকের প্রকৃত স্থিত যাহাই হউক না কেন, শতকরা ২০টাকা দরতালুকদারের এবং ৮০ টাকা মহারাজের প্রাপ্য. এইরূপ ভাবে স্থিত মিল করিয়া, পাট্টা কবুলিয়ত লিখিত হইবে।" এই কথা শ্রবণে তালুক গ্রহীতাগণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন ; ব্রিটীশ সীমারেখার বহির্ভূত স্থানে টাকা অর্পণ করিয়াছেন, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপায় নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রনা ভোগ করিয়া, কেহ এক বৎসর, কেহ দেড় বৎসর, কেহ বা ততোধিককাল পরে রাজ কর্ম্মচারিগণের ইচ্ছানুরূপ কবুলিয়ত দাখিল করিয়া পাট্টা

প্রাপ্ত হইয়াছে। * অদ্যাপি কোন কোন ব্যক্তি ঐরূপ দরতালুক গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের টাকা ও তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই।

সম্পূর্ণ।



* আমরা কতকগুলি দরতালুকের পাট্টা দর্শন করিয়াছি আদর্শ স্বরূপ রামলোচন বর্দ্ধন তালুকের হিং ।০ আনার বাবত ঈশানচন্দ্র দাস নামীয় ১২৮৯ ত্রিঃ ১লা শ্রাবণের পাট্টার কথা উল্লেখ করিতে পারি। এই পাট্টা ১৮৭৯ ইং ২৪ সেপ্টেম্বর কসবা সবরেজেষ্টার কর্ত্তৃক রেজেষ্টরী হইয়াছে।

পরিশিষ্ট।

১ নং

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরগাত্রে সংযোজিত শিলালিপি।

(৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্য দেবো
যাগে যস্য হ্বরীশঃ ক্ষিতিতল মগমৎকর্ণতুল্যস্যদানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেম্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগণপরিগতং সেবিতায়ৈ সদেবৈঃ॥

ধন্যমাণিক্য দেব নামে সর্ব্বগুণযুক্ত নরপতি ছিলেন, তিনি দানে কর্ণ তুলা এবং তাঁহার যজ্ঞপ্রভাবে নাগপতি ক্ষীতিতলে গমন করিয়াছেন। তিনি ১৪২৩ শকাব্দে দেবগণ সেবিতা ত্রিলোকজননীকে গগণস্পর্শী এই মন্দির প্রদান করিলেন।

২ নং

কৈলারগড় দুর্গমধ্যস্থিত কালীরমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে সংযোজিত প্রস্তর লিপি।

(৮১, ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১— ... ...
২—নধীমতাঃ মানশূরেন ... কুপ্ত ... শিল শি
৩—কালিকা—পয়াতা ... কালিকা প্রতিমা রম্যাঃ
৪—দ্দাঃ শির ... ... কালিকাঃ আযা
৫—বৃদ্ধি ... ... কীর্ত্তে নগরেনরসং
৬—তশ ... ... থাঃ কালীকা প্রীত
৭—য় ... রম্যঃ সদান ...
৮—ধ ... ... ত বৈরিনাঃতর্থৈ ...
৯— ... ... ।ঃ শকা ...

১০— ... ... মাঘ ... ...

এই মন্দিরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্বের শিলালিপি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণপার্শ্বের শিলালিপির শেষাংশে কেবল মাত্র "স ১০৯৭" এই কয়েকটি অক্ষর দৃষ্ট হয়।

৩ নং

(১) কল্যাণ মাণিক্যের তাম্রশাসন।

বিষ্ণু

১— ৭ স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত কল্যাণ মাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ি রাজানামাদেশোয়ং

২— শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে ইনাত্ পরং রাজধানী· হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা

৩— নুরনগর মৌজে বাউরখাড় অজ্জঙ্গলাতে শত দ্রোণ ভূমি ৺প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যা-

৪— বাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আশির্ব্বাদ

৫— করিতে রহুক এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।



কল্যাণ মাণিক্যের তাম্র শাসন সমূহের শিরোভাগে একটী বিল্ব-পত্র, তাহার দল ক্রমে "শ্রী" "স" "ত্য" লিখিত রহিয়াছে। পার্শ্বে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

(২) মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন।

প্রথম পৃষ্ঠা — ৺বিষ্ণুপ্রীতে

১ — ৭ স্বস্তি — শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয়ী রাজানামাদেশো

২ — যংশ্রীকারকোনবর্গেবিরাজন্তে ইন্যংৎ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মে-

৩ — হেরকুল মৌজে শোলনল অজহাসিলাজমা ১৮ আঠার কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে

৪ — ব্রহ্মউত্তরদিলাম এহার পাঁচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা

৫ — সুখে ভোগকরোক ইতি সন ১০৭৭ তেং ১৯ কার্ত্তিক

৬ — শক ১৫৯৮ সন ১০৮৬ তেং ১৬ চৈত্র।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—

শ্রীসত্য শ্রীবিশ্বাস নারায়ণ ——

মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য ও মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের অনেকগুলি বাঙ্গালা তাম্রশাসন আমরা দর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে দুইখানা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

সনন্দ সমূহে ত্রিপুরেশ্বরদিগের "বিষমসমরবিজয়ী" এবং "মহামহোদয়ী" এই দুইটী উপাধি দৃষ্ট হয়। "মহামহোদয়ী" মহামহোদয় শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অর্থ মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন বা মহাউন্নত।

"রাজধানী হস্তিনাপুর," ইহা চন্দ্রবংশের পরিচায়ক। কিন্তু যযাতি কিম্বা দ্রুহ্যুর প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর অন্তে, পুরুর দ্বাবিংশতম উত্তরপুরুষ হস্তি কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর নির্ম্মিত

হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় প্রাচীন নরপতিগণ বর্ত্তমান ভারতসীমার বহির্ভূত স্থানের অধিবাসী ছিলেন। *

"সরকারউদয়পুর" শব্দ ত্রিপুররাজমুকুটের কলঙ্ক চিহ্ন। সম্প্রতি বর্ত্তমান মহারাজ ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"শ্রীকারকোনবর্গেবিরাজন্তে" ইহার অর্থ মন্ত্রীসভায়অধিষ্ঠিত। কারকোন শব্দের সাধারণ অর্থ লিপিব্যবসায়ী কর্ম্মচারী। মহারাষ্ট্রদেশে করকোনদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। †

কোন কোন তাম্রশাসনের ও কাগজের সনন্দের পৃষ্ঠে সাময়িক উজিরের নাম স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়।

সনন্দ সমূহে "বিষ্ণুপ্রীতে" ভূমিদানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত তাম্রশাসনে "ভগবন্তশ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য" ভূমিদানের উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা শাসনে "বিষ্ণুপ্রীতে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪নং (নূরনগরের) পরিশিষ্ট।

(৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১। খাসআপীল ২০৩২ নং ১৮৭৫ ইং। হাইকোর্টের ১৮৭৭ ইং ১৭ এপ্রিলের নিষ্পত্তি। তিলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গং আপীলাণ্ট, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রেস্পণ্ডেন্ট।

২। আপীলেট ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল ১৪৫০ নং ১৮৯১ ইং। হাইকোর্টের ১৮৯২ ইং ২৭ মের নিষ্পত্তি। হরিবল বর্দ্ধন বিবাদী আঃ। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রেঃ।

---

* *Dutt's Ancient India Vol. I. P. 181.*
সাহিত্য, ষষ্ঠ ভাগ, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

† *Duff's History of the Maharattas. p. 59.*

৩। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে লেটারপেটেণ্ট আপীল। মান্যবর চিপজষ্টিস ও জজ ওকেনেলী সাহেবের ১৮৯২ ইং ২১ ডিসেম্বর নিষ্পত্তি। বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, হরিবল বর্ম্মণ রেঃ।

৪। খাজানার আপীল ১৭০ নং ১৮৯০ ইং। ত্রিপুরার প্রথম সবজজের ১৮৯৩ ইং ২৫ এপ্রিলের নিষ্পত্তি। হরিবল বর্ম্মণ বিবাদী আঃ, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রেঃ।

৫। ৭ নং ১৮৭০ ইং খাজনা বৃদ্ধির মোকদ্দমা, ত্রিপুরার প্রথম সবজজের ১৮৭৫ ইং ২৯ মার্চ্চের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাদী, রাজকৃষ্ণ পোদ্দার গং বিবাদী।

৬। ৬২৭ নং ১৮৮২ ইং, কসবার মুনসেফের ১৮৮৪ ইং ১১ আগষ্টের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাদী, নবকিশোর দত্ত গং বিবাদী।

৭। ৩৮৫।৩৮৬।৩৮৭ নং ১৮৭৫ ইং কসবার মুনসেফের ১৮৭৬ইং ২৬ জুনের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাদী, রামশঙ্কর সেনাপতি গং বিবাদী।

৮। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল ৫৮৬ নং ১৮৭৬ ইং প্রঃ সবজজের ১৮৭৭ ইং ১৮ জানুয়ারীর নিষ্পত্তি এবং ৫৮৭ নং ১৮৭৬ ইং ঐ সবজজের ১৯ জানুয়ারি নিষ্পত্তি।

৯। আপিল ৭৯৪।৮২৭।৮০১ নং ১৮৯২ ইং এবং ৫১৬নং ১৮৯২ ইং এং সবজজের ১৮৯৩ ইং ১৪ আগষ্টের নিষ্পত্তি। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য আঃ, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য গং রেঃ।

১০। আপীলেট ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল ২২২৫।২৩০২ ২৩২৬ নং ১৮৯৩ ইং। হাইকোর্টের ১৮৯৩ ইং ২১ ডিসেম্বর

নিষ্পত্তি। শ্রীরচন্দ্র মাণিক্য বেঃ, বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য বেঃ।

তোলা প্রতি ইজারার ডৌলের আদর্শ। (৫৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

১। তাং শ্রীহরিশর্ম্মা হিং ।৶০ আনি, গৌরচন্দ্র ও গৌর মোহন শর্ম্মা (চৌধুরী) প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ২৩ জ্যৈষ্ঠের ডৌল।

২। মুদাফত তাং কৃষ্ণচন্দ্র দাস, রত্নমালার (জং পূর্ণচন্দ্র দাস) প্রদত্ত ১২৭৫ ত্রিং ১৫ ফাল্গুনের ডৌল।

৩। তাং কৃষ্ণমোহন শর্ম্মা। লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মার প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ১৫ চৈত্রের ডৌল।

৪। তাং রামশরণ শর্ম্মা। রামশঙ্কর শর্ম্মার প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ৩০ শে চৈত্রের ডৌল।

৫। তাং রামশরণ দত্ত। গৌরচন্দ্র দত্তের প্রদত্ত ১২৭৭ ত্রিং ৩০শে চৈত্রের ডৌল।

৬। তাং আকীকরো খাতুন। ১২৮৭ ত্রিং ২৪ শে ভাদ্রের উক্ত খাতুনের প্রদত্ত ডৌল। এইরূপ বহুসংখ্যক ডৌলের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নূরনগরের খেরাজ ও লাখেরাজ জমির এগজের প্রথা।

১। বুলার সাহেবের ১১৯৭ সনের ১ আশ্বিনের চিঠী। কৃষ্ণপুরের শ্রীযুক্ত জয়নাথ ভট্টাচার্য্য নিকট রক্ষিত হইয়াছে।